ভূমাপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

নিবেদন

ভূমাপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ অচিন্ত্যকুমারের শেষতম সাহিত্যকীর্তি। এই সঙ্গে তিনি আরও দু-একটি রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। মৃত্যুর অল্প কয়েকদিন আগে তিনি চিকিৎসককে বলেন, যে ব্রতের কাজে হাত দিয়েছেন, ত সমাপ্ত করার জন্য তাঁকে আরও কিছুকাল বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সমস্ত সৃষ্টিলীলার পিছনে যে রহস্যময় শক্তি কাজ করে চলেছেন, একমাত্র তিনিই জানেন ও বলতে পারেন, কেন এই সাহিত্য-তপস্বীকে ব্রত সমাপনের আগে তিনি নিজের কাছে টেনে নিলেন। অচিন্ত্যকুমারের ইচ্ছা ছিল, এই গ্রন্থের শেষে আরও কয়েকটি পরিচ্ছেদ যোগ করেন। তাঁর আকস্মিক মহাপ্রয়াণে সেগুলি লেখা সম্ভব হয় নি। আমরা এই শেষ অংশ কোন ভাবে আর কাকেও দিয়ে লেখাতে পারতাম। কিন্তু সে চেষ্টা করি নি, কারণ আমাদের মনে হয়েছে— এই জীবনীসাহিত্য রচনা অচিন্ত্যকুমার ব্রত হিসেবেই নিয়েছিলেন। আরব্ধ কর্ম হয়তো কর্তার অনুপস্থিতিতে শেষ করা সম্ভব কিন্তু ব্রতকারী উপস্থিত না থাকলে ব্রত উদ্‌যাপন তো অসম্ভব। আশা করি, অচিন্ত্য-কুমারের অসংখ্য অনুরাগী আমাদের সঙ্গে একমত হবেন। ইতি—

প্রকাশক

অচিন্ত্যকুমারের অন্যান্য জীবনীগ্রন্থ

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি

ভাগবতী তনু রবীন্দ্রনাথ

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

গৌরাঙ্গ পরিজন

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ

গরীয়সী গৌরী

কবি শ্রীরামকৃষ্ণ

ভক্ত বিবেকানন্দ

জ্যৈষ্ঠের ঝড়

প্রভৃতি

ভূমাপুরুষ
শ্রীঅরবিন্দ

॥ এক ॥

কারাগারের দরজা খুলে গেল।

অর্গলমোচন হল। হল কুণ্ডলমোচন।

কারাকক্ষের নির্জনে, রাত্রে অন্ধকারে যোগাসনে বসে ধ্যান করছিলেন অরবিন্দ। তাঁর অনুভব হল যেন কে এসেছেন ঘরের মধ্যে।

যোগ কী? এক কথায়, ভাগবত চেতনার অভিমুখে আতীব্র আস্পৃহাই যোগ। আসন কী? অনন্তের চিন্তায় অবিচল দৃঢ়তাই আসন। আর ধ্যান? ভগবানে একাগ্র তন্ময়তা, সর্বসমর্পণের প্রশান্তিই ধ্যান।

যোগের উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য, এক কথায়, ভগবানকে পাওয়া। ভগবানে লীন হয়ে যাওয়া নয়, ভগবানে পূর্ণ হয়ে থাকা। ভগবানকে পেয়ে জীবন থেকে অপসরণ নয়, ভগবানকে পেয়ে জীবনের রূপান্তরসাধন। জীবনের অর্থ পরিবেশের, সমগ্র পৃথিবীর। পৃথিবীকে বদলে দেওয়া। উর্ধ্বলোক থেকে ভগবানের রাজ্য—স্বর্গরাজ্য নামিয়ে নিয়ে আসা। পৃথিবীকে স্বর্গ করে তোলা। 'দিয়েছ আমার 'পরে ভার, তোমার স্বর্গটি রচিবার।'

কিন্তু ঘরের মধ্যে এল কে?

না, জেলখানার কোনো সেপাই-সান্ত্রী নয়, জেলর বা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নয়, নয় কোনো বা উচ্চপদের কর্মচারী—এ এক আরেক রকমের আবির্ভাব। এ এক আশ্চর্য উপস্থিতি। অলোকসাধারণ।

ন-ফুট লম্বা ও ছ-ফুট চওড়া এই কারাকক্ষ। কোনো জানলা নেই, সামনে মোটা লোহার গরাদ-ওয়ালা দরজা, তার বাইরে ছোট্ট একটুকু ঢাকা উঠোন, উঠোনটুকু পেরিয়েই আবার কাঠের দরজা। কাঠের দরজার উপরের দিকে দুটি ক্ষুদ্র ছিদ্র। ছিদ্র দুটি এমনিভাবে বসানো যাতে বন্ধ দরজার ওপার থেকে দুটি সন্ধিৎসু চোখে প্রহরী সহজে বুঝতে পারে ভিতরে কয়েদী কী করছে। কিন্তু উঠোনের কাঠের দরজা বন্ধ থাক বা না থাক, কোন মর্ত চোখের সাধ্য নেই বোঝে অরবিন্দ কী করছেন বা তাঁর কাছে কে উপস্থিত হয়েছে।

আসন বলতে মেঝেতে পাতা একখানি মোটা কম্বল। দ্বিতীয় আরেকখানি

অনুরূপ কম্বল আছে আচ্ছাদনের জন্য। বালিশ বলে কোনো উপকরণ নেই। দ্বিতীয় কম্বলখানি পরিপাটিভাবে পাট করে বালিশ বানিয়েছেন অরবিন্দ। যখন শোবার হবে তখন ওতে মাথা রেখে শোবেন। এখন স্থিরাসনে বসে নীরন্ধ্র ধ্যান করছেন। একাগ্র ধ্যানের জন্য উপবেশনই শ্রেষ্ঠ ভঙ্গি।

স্থিরসুখমাসনম্। যে ভাবে অনেকক্ষণ স্থির হয়ে সুখে বসে থাকা যায় তারই নাম আসন।

গ্রে-স্ট্রীটের বাড়িতে ভোর প্রায় পাঁচটায় যখন অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করা হয় তখনো তিনি মেঝেতে পাতা বিছানায়ই শুয়ে ছিলেন। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ক্রেগান জিজ্ঞেস করলেন: 'আপনি নাকি বি এ পাশ ?'

মৃদু হাসলেন অরবিন্দ। তাতে কী ?

'তাতে কী মানে ? এমনি একটা আসবাব-ছাড়া হ্যাডা ঘরে মেঝেয় শুতে আপনার মত শিক্ষিত লোকের লজ্জা করে না ?'

শান্ত স্বরে অরবিন্দ বললেন, 'আমি গরিব। তাই আমি গরিবের মত থাকি।'

সাহেব গর্জে উঠলেন: 'তবে কি আপনি ধনী হবার জন্য বিপ্লব করছেন ?"

ধনী হবার জন্য বিপ্লব!

যোগসাধনই বিপ্লবসাধন। আর ধনী হওয়া অর্থ চরম সম্পদ ঈশ্বরকে লাভ করা। সে-অর্জন শুধু নিজের জন্য নয়, অখণ্ড বিশ্বলোকের জন্য।

এ ক্রেগান কী করে বুঝবেন ? বুঝেছেন তিনি, যিনি এ দণ্ডে এসেছেন কারাকক্ষে।

যিনি এসেছেন তিনি অরবিন্দের অপরিচিত নন। বরোদাতে অরবিন্দ যখন হঠযোগ করতেন তখনো একদিন তিনি এসেছিলেন, অরবিন্দের পিছনে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিলেন তাঁর কর্মকাণ্ড ঠিক হচ্ছে কিনা।

হঠযোগ! হ মানে সূর্য, ঠ মানে চন্দ্র। হঠযোগ মানে চন্দ্র-সূর্যের একত্র সংযোগ। এক কথায়, কায়সাধন। বলপ্রয়োগ করে অর্থাৎ কঠিন কৃচ্ছ্রসাধন করে দেহকে সুস্থ, সমর্থ, লৌহদৃঢ় করে তোলা। দেহকে পরম চিৎপ্রকাশের ভূমিকা করে তোলা। নিয়ন্ত্রণ করে নিয়ে নিমন্ত্রণ করে আনা।

কিন্তু কে এলেন এই আগন্তুক ? একবার সেই বরোদায় আর এখন এই আলিপুরের কারাকক্ষে ?

তাকিয়ে দেখ। বিবেকানন্দ এসেছেন।

আঠারোশ তিরানব্বুই সালের গোড়াগুড়িতে বিলেত থেকে দেশে ফিরলেন অরবিন্দ আর ৮ই ফেব্রুয়ারি চাকরি নিলেন বরোদায়। ঐ সালের ৩১শে মে বিবেকানন্দ বেদান্ত প্রচার করতে আমেরিকায় পাড়ি দিলেন। ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই বিবেকানন্দ মহাপ্রয়াণ করেন আর সক্রিয় যোগে অরবিন্দ আকৃষ্ট হন ১৯০৪-এ। দু জনের মধ্যে চর্মচক্ষে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার ঘটেনি। আর ১৯০২ সালে নিবেদিতা যে বরোদায় এসে অরবিন্দের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন সে-পরিচিতির ক্ষেত্র আধ্যাত্মিক নয়, রাজনৈতিক। অরবিন্দ তো বিবেকানন্দকে আহ্বান করেননি, তবু কেন বিবেকানন্দ অরবিন্দের পাশে এসে দাঁড়ালেন?

দাঁড়ালেন অরবিন্দকে যোগে সাহায্য করতে। ঊর্ধ্বাভিমুখে আতীব্র অভীপ্সা জন্মালেই বুঝি ঊর্ধ্ব থেকে সাহায্য নেমে আসে।

কারাকক্ষের প্রাচীর যেমন সেই উন্মীলনের অভীপ্সাকে খর্ব করতে পারে না তেমনি পারে না দৈবানুকূল্যের অবতরণকে রোধ করতে।

নর্মদাতীরের স্বামী ব্রহ্মানন্দের এক ইঞ্জিনিয়র শিষ্য, দেওধরের কাছ থেকে প্রাণায়ামের ক-খ শিখেছিলেন অরবিন্দ, তারপর যোগী বিষ্ণুভাস্কর লেলে-র থেকেও পেয়েছিলেন কিছু অসাধারণ উপদেশ। ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে দেখাও করেছিলেন কার্ণালিতে। এঁরা তো সবাই মর্তকায়ায় উপস্থিত ছিলেন। বিবেকানন্দের উপস্থিতিই ধ্যানে, দিব্যাগ্নিচেতনায়। এক দিন নয়, টানা পনেরো দিন। হয়তো বা এক মাস।

তবু অরবিন্দের গুরু অন্তর্গুরু। তাঁর কোন আনুষ্ঠানিক দীক্ষাগুরু নেই, তাঁর তা প্রয়োজন ছিল না। তাঁর গুরুবরণ স্বয়ংবরণ। তিনি নিজেই নিজের উন্মোচক, নিজেই নিজের প্রকাশক। নিগূহিত চৈত্য-পুরুষের তিনিই চেতয়িত্য। 'কৃষ্ণ যদি করে কৃপা কোনো ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামীরূপে শিখায় আপনে।' যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ। অরবিন্দ ঈশ্বরের নির্বাচিত—তাই তাঁর ঈশ্বরে উত্তরণ, ঈশ্বরে অধিষ্ঠান, ঈশ্বরে বিকিরণ।

শ্রীঅরবিন্দ লিখছেন:

'অনেক দিন হৃদয়স্থ নারায়ণের সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য প্রবল চেষ্টা করিয়াছিলাম; উৎকট আশা পোষণ করিয়াছিলাম জগদ্ধাতা পুরুষোত্তমকে বন্ধুভাবে, প্রভুভাবে লাভ করি। কিন্তু সহস্র সাংসারিক বাসনার টান, নানা কর্মে আসক্তি, অজ্ঞানের প্রগাঢ় অন্ধকারে তাহা পারি নাই। শেষে পরম দয়ালু সর্বমঙ্গলময় শ্রীহরি সেই সকল শত্রুকে এক কোপে নিহত করিয়া তাহার সুবিধা করিলেন, যোগাশ্রম

দেখাইলেন, স্বয়ং গুরুরূপে, সখারূপে সেই ক্ষুদ্র সাধন-কুটিরে অবস্থান করিলেন। সেই আশ্রম ইংরেজের কারাগার। আমার জীবনে এই আশ্চর্য বৈপরীত্য বরাবর দেখিয়া আসিতেছি যে আমার হিতৈষী বন্ধুগণ আমার যতই না উপকার করুন, অনিষ্টকারীগণ—শত্রু কাহাকে বলিব, শত্রু আমার আর নাই—শত্রুই অধিক উপকার করিয়াছেন। তাঁহারা অনিষ্ট করিতে গেলেন, ইষ্টই হইল। বৃটিশ গবর্নমেণ্টের কোপদৃষ্টির ফল, আমি ভগবানকে পাইলাম।'

বৃটিশ সরকারের কোপদৃষ্টি পড়ল কেন ?

পড়ল যেহেতু অরবিন্দ দেশ জুড়ে ক্ষাত্রতেজ জাগাতে চাইছেন, সশস্ত্র বিদ্রোহে দেশকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে। বিচ্ছিন্ন হত্যা বা সন্ত্রাস নয়, ব্যাপক বিপ্লব। সেই উদ্দেশেই গ্রামে-গ্রামে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করলেন অরবিন্দ। দেশময় প্রস্তুতির বিস্তৃতি।

আর প্রকাশ্যে লিখতে লাগলেন ইংরেজি দৈনিক বন্দেমাতরম-এ।

তখনকার কংগ্রেস শুধু আবেদনে-নিবেদনেই দিনগত পাপক্ষয় করছিল, বন্দে-মাতরমেই স্বাধীনতার আদর্শ উচ্চনাদে প্রথম প্রচারিত হল। কোনো ছায়াঘেরা ঔপনিবেশিক শান্তি নয়, এ একেবারে সর্ববন্ধনমুক্ত সর্বকল্যাণবর্ষণ আকাশের উদারতা। অরবিন্দ বললেন, স্বাধীনতার কোনো বিকল্প নেই। যত ভদ্র সুশাসন হোক, স্বাধীনতা স্বাধীনতা।

আর কী মন্ত্র! বন্দেমাতরম। মাকে বন্দনা করি। মার চরণে প্রণত হই। লুণ্ঠিত হই অকুণ্ঠে।

অমন মন্ত্র না হলে বোধ হয় দেশ উদ্বোধিত হয় না। শ্রদ্ধায় পরিশুদ্ধ হয় না। পবিত্রীকরণের সাবিত্রী মন্ত্রই মা। অমল মন্ত্র—অনল মন্ত্র।

সেই মন্ত্রের প্রথম উদ্গাতা বঙ্কিমচন্দ্র আর প্রথম হোতা অরবিন্দ ঘোষ।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে লিখছেন অরবিন্দ :

'কল্পলোকের মাধুর্য বিতরণ করে, চিন্তারাজ্যে জাগরণ এনে দিয়ে আজ দেশ-বাসীকে তাদের দেশমাতার মহিমময়ী মূর্তি দেখিয়ে হৃদয়ে তাদের প্রেম ও আবেগের বন্যা বইয়ে দিয়ে জাতিকে তিনি প্রকৃত এক জাতি হিসাবে গড়ে তোলবার জন্য জীবনযাপন করেছিলেন।'

দেশমাতার মহিমময়ী মূর্তি! দেশভক্তি বিশ্বশক্তিরই প্রকাশকলা। আর বিশ্বশক্তিই মা। জগন্মাতাই দেশমাতা।

আনন্দমঠে সেই অন্তঃশূন্য অন্ধতমোময় অরণ্যে মনুষ্যকণ্ঠ ধ্বনিত হল : আমার

মনস্কাম কি সিদ্ধ হবে না?

উত্তর হল : তোমার পণ কী?

পণ আমার জীবনসর্বস্ব।

জীবন তুচ্ছ, সকলেই তা ত্যাগ করতে পারে।

আর কী আছে? আর কী দেব?

তখন উত্তর হল : ভক্তি।

'বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি।' ক্ষাত্রতেজের সঙ্গে মেশাও মাতৃভক্তি—ভাগবতী আস্পৃহা। দেখবে মা তোমাকে আবৃত করে আছেন, তখন আর মৃত্যু কোথায়? তখন আদ্যোপান্ত দিব্যজীবন।

'বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং রিপুদলবারিণীং মাতরম্।'

অরবিন্দও চাইলেন সঙ্ঘশক্তি, পূর্ণ সিদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবার দিব্যায়ত দুর্বার দৃঢ়তা। কিন্তু মানুষ কই?

'এই মা যা হইবেন। দশ ভুজ দশ দিকে প্রসারিত—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। দিগভুজা—নানাপ্রহরণধারিণী শত্রুবিমর্দিনী—বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী—বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ— সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বলিলেন, 'এস আমরা মাকে প্রণাম করি।'

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মার এ মূর্তি কবে দেখিতে পাইব?'

ব্রহ্মচারী বলিলেন, 'যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে সেই দিন উনি প্রসন্ন হইবেন।'

কবে সকলে ডাকবে মাকে? কবে নীচে থেকে আবাহন করবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা আকর্ষণ করে নামিয়ে আনবে ভাগবতী করুণা? মায়ের করুণাই অঘটনঘটনী পরিপূরণী শক্তি।

বরোদাতে প্রেতলোকের সঙ্গে সংযোগস্থাপন করবার উদ্দেশ্যে চক্রবৈঠক করা হত। স্বতশ্চালিত কলমেই লেখা হত প্রেতালাপ।

শেষবার শ্রীরামকৃষ্ণ এলেন। অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন, কত প্রশ্ন করা হল, উত্তর দিলেন না। শেষে যাবার মুহূর্তে বললেন, 'মন্দির গড়ো।'

পলিটিক্যাল সন্ন্যাসীদের জন্য একটা মন্দির গড়ার প্ল্যান করছিলেন অরবিন্দ, তার নাম রেখেছেন 'ভবানী-মন্দির'। মনে হল রামকৃষ্ণ বুঝি সেই মন্দিরের

ইঙ্গিত করলেন।

শক্তির উদ্বোধন ছাড়া মুক্তি কোথায়? অনন্তব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশিতা যে অদ্বিতীয়া মহাশক্তি সেই তো জননী ভবানী, আমরা তো তাঁরই আশ্রিত, নতানুগত—গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী। তাঁর মন্দির কি বাইরে, ইঁটকাঠে?

'পরে মনে হল তা নয়।' বলছেন অরবিন্দ, 'আমাদের অন্তরে মন্দির তৈরির কথা বলছেন।'

'এটাই আমাকে যোগের দিকে শেষ প্রেরণা দেয়।' আরো বলছেন অরবিন্দ, 'আমি ভাবলাম মহাপুরুষেরা নিশ্চয়ই মরীচিকার পিছনে ছোটেননি। যদি সত্যি এমন কোন শক্তি থাকে তবে তাকে পাব না কেন এবং পেলে দেশের কাজে লাগাব না কেন?'

শুধু দেশের কাজে নয়, পৃথিবীর কাজে। পৃথিবীর বদল হবে রাজনীতি দিয়ে নয়, অর্থনীতি দিয়ে নয়, বদল হবে অধ্যাত্মশক্তিতে।

সমস্ত অতীতকে স্বীকার করেছেন অরবিন্দ, কিন্তু ভবিষ্যৎ যে মহত্তর তা কে অস্বীকার করবে? সনাতনই যে বারে বারে নবতন। শাশ্বতই যে সতত প্রকাশশীল। যে নিরতিশয় কোথায় তার সমাপ্তির রেখা টানবে? শুধুই এগিয়ে চলা। রামকৃষ্ণের গল্পের সেই কাঠুরের মত।

কাঠুরে, তুই দূর বনে যা এই বেলা
কেঠো বনে কাল কাটালি মিটল না তোর জঠরজ্বালা
শ্রীরামকৃষ্ণ দিলেন বলে
মেলে ধন দূর বনে গেলে
রে কাঠুরে, এই বেলা যা দূরে চলে
মিলবে চন্দনের চ্যালা।
আরো যদি যাস এগিয়ে
রূপোর খনি দেখবি গিয়ে
তারও পারে সোনা হীরে
মণি মাণিক রত্ন মেলা॥

পথের শেষ নেই, প্রয়াসের শেষ নেই, তপস্যার শেষ নেই। যত তপস্যা করব ততই ব্রহ্ম উচ্ছ্বসিত হবে। তপসা চীয়তে ব্রহ্ম। শুধু তো সংসারটুকুকে স্বর্গ করা নয়, সমগ্র পৃথিবীকে স্বর্গ করা। তাই শুধু বিস্তার আর বিস্তার—বিস্তার ছাড়া আমাদের নিস্তার নেই। সমষ্টিরূপিণী মহাশক্তি মা-ই আমাদের

সেই নিস্তারদাত্রী। 'ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারদাত্রী, নমস্তে জগত্তারিণি, ত্রাহি দুর্গে।'

এ সেই ডাক্তার কে. ডি. ঘোষের ছেলে অরবিন্দ এ্যাকরয়েড ঘোষ নয়? সাত বছর বয়সে যে বিলেতে পড়তে যায়, চোদ্দ বছর পরে দেশে ফেরে—আই. সি. এস. পাশ করেও চাকরির পাশ কাটায়, ট্রাইপস ফার্স্ট পার্ট পাশ করেও সামান্য বি.এ. ডিগ্রির জন্য চেষ্টা করে না! এ ছেলের সম্পর্কেই না বাপ বুক ফুলিয়ে বলে বেড়াত—বড় হয়ে আরো একটা কিছু হবে দেখো।

দেখ কোথা থেকে শুরু করে কোন পথ দিয়ে চলে কোন পদে উঠে কী হয়েছেন! দেখ আরো কী হবেন!

॥ দুই ॥

'আমার বাবা ঘোর নাস্তিক ছিলেন।' বলছেন শ্রীঅরবিন্দ।

কিন্তু কে জানে কেন, ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ তাঁর তৃতীয় ছেলের নাম রাখলেন অরবিন্দ। প্রথম ছেলের নাম বিনয়ভূষণ, দ্বিতীয়ের নাম মনোমোহন, তৃতীয়ের নামও অমনি সরল সাদামাঠা রাখাই স্বাভাবিক ছিল।

কিন্তু অরবিন্দ! এ নাম অভিনব তো বটেই, একেবারে অভাবনীয়। অরবিন্দের আগে এই নাম আর কেউ শোনেনি বাংলা দেশে।

কৃষ্ণধনকে এই নামে কে প্রেরিত করল? সে কোন অদৃশ্য শক্তি?

'অরবিন্দ'-র অর্থ কী? অর্থ শতদল পদ্ম। যে পদ্ম সূর্যের দিকে মুখ করে শত দিকে শত পল্লবে প্রসারিত হয়েছে।

আরো দুটো অর্থ আছে। এক রক্তকমল; আর নীলোৎপল।

রক্ত বা লাল হচ্ছে বিপ্লবের রঙ। আবার লাল হচ্ছে দিব্য প্রেমের প্রতীক। আর নীল হচ্ছে উর্ধ্বমনের রঙ। নীলোৎপল হচ্ছে উর্ধ্বমনের উন্মীলন।

অরবিন্দ অন্বর্থনামা।

কৃষ্ণধন তো আপাদমস্তক সাহেব—কৃষ্ণধন ঘোষ না বলে কে. ডি. ঘোষ বলেই লোকে চেনে তাঁকে এক ডাকে—তার উপরে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, তবু কোন নিগূঢ় চেতনার সূত্রে তাঁর মনে জাগল এই নামের কল্পনা! সাহেব বলে বাংলা নামের সঙ্গে জুড়লেন একটি ইংরেজি নাম—অরবিন্দ এ্যাকরয়েড। নামকরণের সময় মিস এ্যানেট এ্যাকরয়েড নামে একটি ইংরেজ মহিলা দৈবাৎ

উপস্থিত ছিল, তার নামটাই কৃষ্ণধনের ভারি পছন্দ হয়ে গেল। একটা ইংরেজি নামের স্পর্শ পেয়ে ছেলে যদি নামজাদা হয়!

সাত বছর পর চতুর্থ পুত্র বারীন্দ্রকুমারের জন্ম হলে কৃষ্ণধন তার নাম রাখলেন এমানুয়েল ঘোষ।

এমানুয়েল কথার অর্থ, 'ভগবান আমাদের সঙ্গে আছেন।'

কৃষ্ণধনকে এই নামই বা কে রাখতে বললে?

কোন্নগরের ঘোষেদের বাড়ির ছেলে কৃষ্ণধন অনেক দুঃখে-কষ্টে মানুষ হয়েছেন। মাত্র তের বছর বয়সে, ১৮৫৮ সালে এণ্ট্রান্স পাশ করে ঢোকেন মেডিকেল কলেজে। কলেজে পড়তে-পড়তে চতুর্থ বৎসরে ঋষি রাজনারায়ণ বসুর মেয়ে স্বর্ণলতাকে বিয়ে করেন। কৃষ্ণধনের বয়স তখন উনিশ, স্বর্ণলতার বারো। বিয়ে হিন্দুমতে নয়, ব্রাহ্মমতে।

ডাক্তার হয়ে যথারীতি বেরিয়ে আসেন কৃষ্ণধন, কিন্তু দিশি ডিগ্রিতেই তৃপ্ত থাকতে চান না। উচ্চতর শিক্ষার জন্যে ১৮৬৯ সালে বিলেত যান। তখন তাঁর দুটি ছেলে, বিনয় আর মনোমোহন জন্মে গেছে—যাদের আদরের ডাক-নাম বেনো আর মনো। তাদের শুধু মায়ের জিম্মায় রেখে যেতে কৃষ্ণধনের মন ওঠেনি, বহাল করেছেন একটি বিলিতি নার্স, নাম মিস প্যাজেট। ছেলেদের দেখো আর যা পারো শিখিও ইংরিজি কথা।

যাবার আগে রাজনারায়ণ জামাইকে সাবধান করে দিলেন, দেখো প্রতীচ্য সভ্যতার চাকচিক্যে যেন আত্মবিস্মৃত হয়ো না। ছেড়ো না তোমার জাতীয় বৈশিষ্ট্য।

কে শোনে কার কথা। দু বছর বাদে এ্যাবারডিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-ডি ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরলেন কৃষ্ণধন। পুরোদস্তুর সাহেব, প্রজ্জ্বলন্ত ব্যক্তিত্ব, সিভিল সার্জনের চাকরি পেলেন। চললেন ভাগলপুর।

তার আগে প্রায়শ্চিত্ত করো—কোন্নগরের গোঁড়া সমাজ চেপে ধরল কৃষ্ণধনকে। কালাপানি পেরিয়েছ, অনাচার খণ্ডন করে নাও। কৃষ্ণধন এ অত্যাচারের কাছে নতিস্বীকার করলেন না। স্থির করলেন কোন্নগরের সংস্রব বর্জন করবেন।

সমাজপতি এক ব্রাহ্মণের কাছে পৈতৃক বাড়ি বেচে দিলেন জলের দরে। ন্যায্য দর দেব, অমন সস্তায় ছেড়ে দিও না—এক আত্মীয় এগিয়ে এলেন।

ব্রাহ্মণকে কথা দিয়েছি, কথার খেলাপ করতে পারব না, আত্মীয়কে ফিরিয়ে দিলেন কৃষ্ণধন। মনে-মনে বললেন, সত্যই সব চেয়ে বড় আত্মীয়।

কর্মস্থলে যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই কৃষ্ণধন প্রিয়ত্ব অর্জন করেছেন। জনপ্রিয় হওয়া সোজা, প্রিয়জন হওয়াই কঠিন। যে চালাক সে কায়দা করে অনায়াসে জনপ্রিয় হতে পারে কিন্তু প্রিয়জন হতে হলে তাকে সত্যিই সত্যানুরাগী হতে হয়, হতে হয় পরোপকারী। খালি চিকিৎসক হলেই হয় না, হতে হয় লোকসেবক।

দুঃস্থ গরিবদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করেন কৃষ্ণধন, নিজের পকেট থেকে ওষুধ-পথ্য কিনে দেন। কেউ তাঁর দরজা থেকে খালি হাতে ফিরে যায় না। হেন প্রার্থী নেই যে উপকৃত না হয়। এমন লোককে দীনবন্ধু বলবে না তো কাকে বলবে? আর যিনি দীনবন্ধু তিনিই তো সর্বাপেক্ষা প্রিয়জন।

রংপুরে কৃষ্ণধনকে সবাই বলে 'রংপুরের রাজা' আর স্বর্ণলতাকে বলে, 'রংপুরের গোলাপ'।

সেখানকার ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট গ্লেজিয়ার কৃষ্ণধনের বিশেষ বন্ধু। কৃষ্ণধন শুধু বিশ্বস্ত বন্ধু নন, বিচক্ষণ মন্ত্রণাদাতা। তাঁর সমর্থন ছাড়া কোনো কাজে হাত দিতে ভরসা পায় না গ্লেজিয়ার। মনে হয় লোকরঞ্জন কৃষ্ণধনই রাজা আর গ্লেজিয়ার তাঁর সচিব।

রংপুরে চলাচলের সুবিধের জন্য দীর্ঘ এক খাল কাটা হল—তার নাম হল কে-ডি-ক্যানেল।

এই গ্লেজিয়ারেরই আত্মীয় রেভারেণ্ড উইলিয়ম ড্রুয়েট, যার হাতে, ম্যাঞ্চেস্টারে, কৃষ্ণধন সাত বছরের বালক অরবিন্দ ও তার দুই কিশোর দাদা ও ছোট বোন সরোজিনীর শিক্ষার ভার সঁপে দিলেন আর বিশেষ করে বলে দিলেন, ওরা যেন কোনো ভারতীয়ের সঙ্গে না মেশে বা কোনো ভারতীয় প্রভাবের আওতায় না পড়ে।

গ্লেজিয়ারের পরে যে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট এল, চারদিকে তাকিয়ে সে ভরসা পেল না সে কোথায়! সারা শহরের সর্বময় কর্তা কে. ডি. ঘোষ। কেউ ম্যাজিস্ট্রেটকে আমল দেয় না, বলে, ডাক্তারসাবকে খবর দাও। এ অবস্থা খোদ সাহেবের সহ্য হল না, উপরে নালিশ পাঠাল। ফলে কৃষ্ণধন বদলি হয়ে গেলেন খুলনায়।

শ্রীঅরবিন্দ বলছেন: 'বাবা এলেন খুলনায়। এই কদর্য ব্যবহারে তিনি এত

মর্মাহত হন যে সাহেবদের উপর তাঁর ভক্তি উবে যায় এবং ভিতরে ভিতরে তিনি স্বদেশী-ভাবাপন্ন হন।'

'কর্মযোগিন'-এ লিখেছেন: 'বুদ্ধিতে তীক্ষ্ণ, হৃদয়ে কোমল, আবেগে উদ্বেল, বদান্যতায় উচ্ছৃঙ্খল, নিজের অভাবে-কষ্টে উদাসীন, পরের দুঃখে অভিভূত—এই ছিল কৃষ্ণধন ঘোষের চরিত্র।'

এও বুঝি সেই অদৃশ্য শক্তির বিধান, কৃষ্ণধন তাঁর ছেলেদের, বিশেষ করে অরবিন্দকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় পারদর্শী করে তুলবেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দুই দিগন্ত উন্মুক্ত হলেই বুঝি বিশ্বনাগরিক হয়ে বিশ্বাত্মাকে যথার্থ উপলব্ধি করা যায়। তবেই বুঝি সে এক বিরাট ঐক্যবোধে উত্তীর্ণ হতে পারে, দেখতে পারে সর্বব্যাপীকে সর্বানুভূ সর্বভূতগুহাশয়কে।

'আপনার জামাইয়ের মত এমন সুন্দর মুখ আর দেখিনি।' এক খৃষ্টান পাদ্রী বললেন রাজনারায়ণকে।

যার অন্তর করুণায় দ্রব, যে পরোপকারে উদ্যত, যে সর্বক্ষণ সৎচিন্তার আশ্রয়ে, যে দুঃখমোচনে আগ্রহী, তার মুখে দিব্য আভা পড়বে তা আর বিচিত্র কী।

রাজনারায়ণ বসু সে যুগের এক মহাপ্রাণ ঋষি। ডিরোজিও ও ডেভিড হেয়ারের ছাত্র, ইংরেজিতে কৃতবিদ্য হয়েও ভারতীয় সংস্কৃতির একজন বলদৃপ্ত প্রবক্তা। সমাজ-সংস্কারে তৎপর, কিন্তু তাই বলে সমাজকে উৎখাত করে দিতে বা সাহেবিয়ানায় ডুবিয়ে দিতে প্রস্তুত নন। বরং সমাজে যে সব প্রথা সুন্দর ও মহৎ তাদের রক্ষা করবার জন্যে প্রাণপণ করেছেন। মেদিনীপুর জেলা স্কুলের হেড মাস্টার রাজনারায়ণ, এক সভা স্থাপন করলেন যার নাম জাতীয়-গৌরব-সঞ্চারিণী সভা। নামেই বোঝা যায় সভার আদর্শ কী। সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার সার্বিক চর্চাই ছিল সে সভার শ্রেষ্ঠ গৌরব। সেই সভা থেকে হিন্দুমেলার প্রবর্তন। আর এই হিন্দুমেলা থেকেই কংগ্রেসের আবির্ভাব। সুতরাং বলা যেতে পারে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ভগীরথ রাজনারায়ণ।

আন্দোলনের মধ্যে ছিল গুপ্তসমিতির প্রতিষ্ঠা। বিপ্লবের কথাও ভেবেছেন রাজনারায়ণ এবং এও একদা লিখেছেন: মরিবার আগে আমার দেশের একটা শত্রুকেও যদি নিজের হাতে নিপাত করিয়া যাইতে পারি, তবে জন্মটা সার্থক হইল মনে করিব।

সমস্ত কিছুর উৎস নিখাদ দেশপ্রেম। দেশপ্রেম ঈশ্বরপ্রেমেরই প্রতিচ্ছায়া।

মাতামহের কাছ থেকে দেশপ্রেমের উদ্দীপনা পেয়েছেন অরবিন্দ। রাজনারায়ণ যখন দেওঘরে তখন কতবার তাঁর কাছে এসেছেন বরোদা থেকে।

সর্বোপরি আধ্যাত্মিকতাই ছিল রাজনারায়ণের খাদ্য-পানীয়, নিশ্বাস-প্রশ্বাস। অখণ্ড দৃষ্টির উদার আলোকে তিনি দেখতেন জগৎকে—বেদান্ত কি ইসলাম কি ইউরোপীয় দর্শন, সমস্ত বাতায়ন খুলেই দেখতেন, এক পরিকীর্ণ হচ্ছে বহুতে। বিভক্তের মত দেখাচ্ছে কিন্তু আদ্যোপান্ত এক অন্তহীনতা।

রাজনারায়ণ সম্পর্কে কী লিখছেন রবীন্দ্রনাথ?

'অপরাহ্নে বিষম ঝড়। সেই ঝড়ে আমরা গঙ্গার ঘাটে দাঁড়াইয়া চীৎকার শব্দে গান জুড়িয়া দিলাম—আজি উন্মাদ পবনে। রাজনারায়ণবাবুর কণ্ঠে সাতটা সুর যে বেশ বিশুদ্ধভাবে খেলিত তাহা নহে কিন্তু তিনিও গলা ছাড়িয়া দিলেন, এবং সূত্রের চেয়ে ভাষ্য যেমন অনেক বেশি হয় তেমনি তাঁহার উৎসাহের তুমুল হাতনাড়া তাঁহার ক্ষীণ কণ্ঠকে বহুদূরে ছাড়াইয়া গেল; তালের ঝোঁকে মাথা নাড়িতে লাগিলেন এবং তাঁহার পাকা দাড়ির মধ্যে ঝড়ের হাওয়া মাতামাতি করিতে লাগিল।...

ছেলেবেলায় রাজনারায়ণবাবুর সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় ছিল তখন সকল দিক হইতে তাঁহাকে বুঝিবার শক্তি আমাদের ছিল না। তাঁহার মধ্যে নানা বৈপরীত্যের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তখনই তাঁহার চুলদাড়ি প্রায় সম্পূর্ণ পাকিয়াছে কিন্তু আমাদের দলের মধ্যে বয়সে সকলের চেয়ে যে ব্যক্তি ছোট তাহার সঙ্গেও তাঁহার বয়সের কোন অনৈক্য ছিল না। তাঁহার বাহিরের প্রবীণতা শুভ্র মোড়কটির মত হইয়া তাঁহার অন্তরের নবীনতাকে চিরদিন তাজা করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। এমন-কি প্রচুর পাণ্ডিত্যেও তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই, তিনি একেবারেই সহজ মানুষটির মতই ছিলেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত অজস্র হাস্যোচ্ছ্বাস কোনো বাধাই মানিল না—না বয়সের গাম্ভীর্য, না অস্বাস্থ্য, না সংসারের দুঃখকষ্ট, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন, কিছুতেই তাঁহার হাসির বেগকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। একদিকে তিনি আপনার জীবন ও সংসারটিকে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন, আর এক দিকে দেশের উন্নতিসাধন করিবার জন্য তিনি সর্বদাই কত রকম সাধ্য ও অসাধ্য প্ল্যান করিতেন তাহার আর অন্ত নাই। রিচার্ডসনের তিনি প্রিয় ছাত্র, ইংরেজি বিদ্যাতেই বাল্যকাল হইতে তিনি মানুষ কিন্তু তবু অনভ্যাসের সমস্ত বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে পূর্ণ উৎসাহ ও শ্রদ্ধার বেগে তিনি প্রবেশ

করিয়াছিলেন। এদিকে তিনি মাটির মানুষ কিন্তু তেজে একেবারে পরিপূর্ণ ছিলেন। দেশের প্রতি তাঁহার যে প্রবল অনুরাগ সে তাঁহার সেই তেজের জিনিস। দেশের সমস্ত খর্বতা দীনতা অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন। তাঁহার দুই চক্ষু জ্বলিতে থাকিত, তাঁহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত, উৎসাহের সঙ্গে হাত নাড়িয়া আমাদের সঙ্গে মিলিয়া তিনি গান ধরিতেন—গলায় সুর লাগুক আর না লাগুক তিনি খেয়ালই করিতেন না—

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।

এই ভগবদ্‌ভক্ত চিরবালকটির তেজঃপ্রদীপ্ত হাস্যমধুর জীবন, রোগে শোকে অপরিম্লান তাঁহার পবিত্র নবীনতা, আমাদের দেশের স্মৃতিভাণ্ডারে সমাদরের সহিত রক্ষা করিবার সামগ্রী তাহাতে সন্দেহ নাই।'

মাতামহের সমস্ত গুণেরই অধিকারী অরবিন্দ। তপস্যায় যতই তিনি অয়স্কঠিন হন, আনন্দস্বরূপ অরবিন্দ হাস্যরসিক। পরিহাসপ্রিয়তা তাঁর স্বচ্ছচিত্ততার একটি মনোরম বৈশিষ্ট্য। স্বয়ং ঈশ্বরই দারুণ রসিক। 'রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।'

বড় মামা যোগেন্দ্রনাথ বসু বালক অরবিন্দের মুখের সামনে আয়না ধরে বললেন, 'ভ্যাথ বানর ভ্যাখ।'

প্রত্যুৎপন্নমতি বালক সেই আয়না বড় মামার মুখের সামনে এনে বললে, 'বড় মামা বড বানর।'

মামা-ভাগ্নে দুজনেই হেসে উঠল।

'একবার কী হয়েছে,' বলছেন অরবিন্দ, 'দাদামশায়ের সঙ্গে আমরা নাতি-নাতনীরা বেড়াতে বেরিয়েছি, কতদূর চলে এসে দেখি দাদামশাই নেই। কোথায় গেলেন তিনি? ব্যস্ত হয়ে পিছু ফিরে খুঁজতে গিয়ে দেখি দাদামশাই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঘুমুচ্ছেন।' বলছেন আর হাসছেন অরবিন্দ।

'কী বিশ্রী পৃথিবীই সৃষ্টি করেছেন ভগবান!' আরেক দিনের কথা বলছেন অরবিন্দ: 'আমার দিদিমা নালিশ করলেন দাদামশায়ের কাছে, যদি একবার ভগবানের দেখা পাই, তাঁকে বুঝিয়ে দিই তাঁর সম্বন্ধে আমার কী ধারণা! দাদামশাই বললেন, তা ঠিক। কিন্তু ভগবান এমনি ব্যবস্থা করেছেন যে যতক্ষণ তোমার এই মনোভাব থাকবে ততক্ষণ তোমাকে তিনি তাঁর কাছে ঘেঁষতেই দেবেন না।' অরবিন্দের আবার হাসি।

তবু ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান-এর লেখক নেভিনসন বলেন, অরবিন্দ কখনো হাসে না।

'তাঁর সাথে আমার দুবার দেখা হয়।' বলছেন শ্রীঅরবিন্দ, 'একবার বাংলায় সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে—তখন আমার গুরুতর অসুখ—আর একবার সুরাটে যখন আমি ন্যাশানালিস্ট কনফারেন্সের সভাপতি। সভাপতি বলে সেবারেও হাসতে পারিনি। সুতরাং তিনি লিখলেন, The man who never laughs—যে লোক কখনো হাসে না।' বলেই শ্রীঅরবিন্দ হেসে উঠলেন।

'ত্রিশ বছরেরও কম বয়সের এক তরুণ,' লিখছেন নেভিনসন, 'কৃশ প্রস্ফুট মুখ, আর কী তীক্ষ্ণ কালো চোখে তাকিয়ে আছে! সে মুখে এমন এক গাম্ভীর্য যা কখনো বিচলিত হবার নয়। কোনো সমালোচনায় কাতর নয়, কোনো দুর্বিপাকে কুণ্ঠিত নয়, গাঢ় ও গভীর—এমন মৌনী পুরুষ আমি দেখিনি। আমার মনে হল যারা স্বপ্ন দেখে, তারা এই সব উপাদান দিয়েই তৈরি হয়, কিন্তু এ এমন এক স্বপ্নদ্রষ্টা যে পথ বা উপায় সম্বন্ধে উদাসীন থেকে স্বপ্নকে শুধু সত্যে পরিণত করে।'

বাংলার লাট স্যার এডওয়ার্ড বেকার-ও অরবিন্দের চোখের প্রশংসা করলেন। আলিপুরে বন্দী অবস্থায় অরবিন্দকে দেখে জজ চারু দত্তকে বললেন, 'অরবিন্দ ঘোষের চোখ দেখেছেন?'

চারু দত্ত বললেন, 'দেখেছি। কী বলতে চান?'

বেকার বললেন, 'ও দুটো পাগলের চোখ।'

কাহিনীটি বিবৃত করে শ্রীঅরবিন্দ নিজেই হাসলেন। বললেন, 'চারু দত্ত বেকারকে অনেক বোঝাতে চাইল আমি পাগল নই, আমি কর্মযোগী।'

দীনেন্দ্রকুমার রায় লিখছেন: 'একদিন কথায় কথায় আমি অরবিন্দকে বলিয়াছিলাম, আপনাকে তো মাসে মাসে আপনার মাকে ও ভগিনীকে টাকা পাঠাইতে দেখি, আপনার দুই দাদাও তো অনেক টাকা উপার্জন করেন, তাঁহারা উঁহাদের জন্য খরচপত্র পাঠান না? অরবিন্দ বলিয়াছিলেন, তাঁহার বড় দাদা খেয়ালী লোক, তাঁহার হাতে পয়সা থাকে না। একা মানুষ, তথাপি তিনি খরচে কুলাইয়া উঠিতে পারেন না। আর মেজদা নূতন বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহার ধারণা বিবাহটা ব্যয়সাধ্য বিলাসিতা—অরবিন্দ expensive luxury শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। মা পাগল, সময়ে সময়ে তাঁহাকে ঘরে পুরিয়া রাখিতে হইত, কিন্তু মায়ের প্রতি অরবিন্দের অসাধারণ ভক্তির পরিচয়ে আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। এক এক সময় তিনি হাসিয়া বলিতেন, আমি পাগল মায়ের

পাগলা ছেলে।'

স্ত্রী মৃণালিনীকে চিঠি লিখছেন অরবিন্দ :

'পাগলকে বিবাহ করিয়াছ সে তোমার পূর্বজন্মার্জিত কর্মদোষের ফল। নিজের ভাগ্যের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করা ভাল, সে কি রকম বন্দোবস্ত হইবে? পাঁচ জনের মতের আশ্রয় লইয়া তুমিও কি ওকে পাগল বলিয়া উড়াইয়া দিবে? পাগল তো পাগলামির পথে ছুটিবেই ছুটিবে, তুমি ওকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, তোমার চেয়ে ওর স্বভাবই বলবান। তবে তুমি কি কোণে বসিয়া কাঁদিবে মাত্র, না তার সঙ্গেই ছুটিবে, পাগলের উপযুক্ত পাগলী হইবার চেষ্টা করিবে, যেমন অন্ধরাজার মহিষী চক্ষুদ্বয়ে বস্ত্র বাঁধিয়া নিজেই অন্ধ সাজিলেন।'

চারু দত্ত বোঝাতে চাইলেন অরবিন্দ কর্মযোগী।

'কর্মযোগিন'-পত্রিকায় এই মর্মে লিখছেন অরবিন্দ :

'যোগ মানে ভগবানের সঙ্গে সংযোগ, জ্ঞানের বা কর্মের মধ্যে দিয়ে। মানুষের ভিতরে ও বাইরে যিনি সর্বজ্ঞাতা সর্বশক্তিমানরূপে বিরাজ করছেন যোগী সেই অন্তরবাসীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক পাতান। অনন্তের সঙ্গে এক সুরে মিলে গিয়ে যোগী ভগবানের আধারমাত্র হয়ে যান যাতে ভগবানের শক্তিধারা যোগীর মাধ্যমে জগতে স্নিগ্ধ কৃপা-রূপে বা সক্রিয় অবদানরূপে প্রবাহিত হতে পারে।'

আবার লিখছেন :

'কুরুক্ষেত্রের ধ্বংসলীলার মধ্যে অর্জুনের রথ চালাচ্ছেন স্বয়ং ভগবান, সারথি হয়ে। এই হল কর্মযোগের রূপক চিত্র। এখানে দেহ হল রথ, ইন্দ্রিয় হল ঘোড়া আর সেই রথকে জগতের রক্তাক্ত ও কর্দমাক্ত ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে সাথিরূপে সারথিরূপে চালিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মানুষের আত্মাকে বৈকুণ্ঠের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন।'

রাজনারায়ণ দেহ রাখলেন ১৮৯৯ সালে। তাঁর তিরোধানে অরবিন্দ ইংরেজিতে কবিতা লিখলেন যার মর্মানুবাদ এই রকম :

মৃত্যুতে সমাপ্ত নও, আলো থেকে আমাদের থেকে
বিচ্ছিন্ন বিযুক্ত নও, নও তুমি দূর পলাতক
অন্ধকারে, হে দুর্বার দৃপ্ত প্রাণ, সেই স্বর্গধামে
যেথায় বসতি করে সনাতন পুঞ্জীভূত সুখ
বৈরাগী স্তব্ধতা, সেখানে যাওনি তুমি। সর্বব্যাপী
সেই ধ্যানী যার তুমি ছিলে জানি ক্ষুদ্র অংশ, আর

পার্থিব প্রকাশ, সেই তিনি পূর্ণযোগ-জ্যোতির্ময়
ফিরায়ে নিলেন দান। তবু সেই আলোকের স্রোতে
একাকার হয়ে গিয়ে ছাড়োনি তোমার স্বকীয়তা
আপন ঝলক। এখনো সমর্থ তুমি, আছে তব
পুরাতন সানন্দ দ্যোতনা, হোক না অদৃশ্যমান
রৌদ্রালোকে, তবুও তা অন্ধকারে নির্ভুল নিশ্চিত॥

অরবিন্দের বয়স তখন সাতাশ। তাঁর জন্ম ১৮৭২ সালের ১৫ই অগাস্ট, রামমোহন রায়ের জন্মের শত বৎসর পূর্তিতে।

আর এই ১৫ই অগাস্ট-ই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দিন। সে স্বাধীনতার অগ্রনায়ক, প্রধান পুরোধা শ্রীঅরবিন্দ।

॥ তিন ॥

ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ কৃষ্ণধনের বন্ধু। মনোমোহনের স্ত্রীর নামও স্বর্ণলতা। দুই স্বর্ণলতায় তাই সৌহৃদ্য। সখীভাবে পরস্পর তারা 'গোলাপ' পাতিয়েছে।

থিয়েটার রোডে মনোমোহনের বাড়ি। সেই বাড়িতেই ভূমিষ্ঠ হল অরবিন্দ। ভূমিষ্ঠ হল রাত প্রায় পাঁচটায়। অর্থাৎ ব্রাহ্ম মুহূর্তে। সূর্যোদয়ের পূর্ববর্তী দণ্ড দুই কালই ব্রাহ্ম মুহূর্ত।

এই আবির্ভাব তাই প্রত্যক্ষ অরুণোদয়ের সূচনা।

শৈশবের পাঁচ বছর কাটল খুলনায়, বাবার কর্মস্থলে। কিন্তু বাবার খবরদারিতে বাংলা বলতে শিখল না। দাদাদের সঙ্গে যা কিছু কথা, তাও ইংরেজিতে, আর বাবুর্চি-বেয়ারাদের সঙ্গে দু-চারটে ভাঙা-ভাঙা হিন্দুস্থানি। সে কালের সাহেবাস্থিত বাঙালিদের মত কৃষ্ণধন বিশ্বাস করতেন, বাঙালিয়ানা ঢুকেছে কী, ছেলেগুলো উচ্ছন্নে গিয়েছে!

ঐ পাঁচ বছর বয়সেই অরবিন্দকে দার্জিলিঙের লরেটো কনভেন্ট স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল। শুধু অরবিন্দকে নয়, তার দুই দাদা বিনয় আর মনোমোহনকেও। বন্ধুপ্রীতির আনন্দেই বোধ হয় দ্বিতীয় ছেলের নাম কৃষ্ণধন মনোমোহন রেখেছিলেন। কৃষ্ণধনের আশা তাঁর দ্বিতীয় ছেলেও স্বনামধন্য

ব্যারিস্টার হবে।

কিন্তু অরবিন্দের সম্পর্কে তাঁর আশা অনেক বেশি। অরবিন্দ তার নিপুণ পরিচালন-শক্তিতে দেশকে গৌরবান্বিত করবে।

ঐ আশার মধ্যে কি শুধু ক্ষুদ্র আই-সি-এস হবারই স্বপ্ন ?

স্কুলের ভিতরে-বাইরে সঙ্গী-সাথী সব সাহেব-সুবোর ছেলে, শিক্ষার বাহন একচ্ছত্র ইংরেজি, সাধ্য নেই কোনো ফাঁকে কোনো স্বাদেশিকতা ঢুকে পড়ে। চোখের উপর দেবতাত্মা হিমালয় জেগে থাকলে কী হবে, চার পাশে শুধু বিলিতি আবহাওয়া, বিলিতি আদব-কায়দা। সাধ্য নেই শিবালয় হিমালয়কে তুমি ভারতীয় মন নিয়ে তন্ময় হয়ে দেখতে শেখ।

মনের কথা মনে, কিন্তু চোখ দিয়ে প্রত্যক্ষ দেখাকে ঠেকায় কে ? অরবিন্দের যে কবির চোখ। কবির অনুভূতি।

বাল্যের এই দার্জিলিঙ কি অরবিন্দের কবিসত্তার সঙ্গে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায়নি ? ধ্যানমগ্ন হিমালয় কি তাঁর অনুভবের অগোচরে থেকেছে ? তুঙ্গতম চূড়া গৌরীশঙ্কর কি পাঠায়নি কোনো ঊর্ধ্বের ইশারা ?

দার্জিলিঙে দু বছর ছিলেন অরবিন্দ এবং সেখানে একদিন একটা স্বপ্ন দেখলেন। অন্ধকারের স্বপ্ন।

'দেখলাম,' বলছেন অরবিন্দ, 'একটা প্রকাণ্ড অন্ধকার আমার দিকে ছুটে আসছে, আমাকে বেষ্টন করে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। শুধু আমাকে নয়, সমগ্র বিশ্বচরাচরকে। তারপর যতদিন থেকেছি ইংলণ্ডে, এক বিরাট 'তমস' সর্বক্ষণ আমাকে আশ্রয় করে রয়েছে। আমার বিশ্বাস স্বপ্নের সেই অন্ধকারের সঙ্গে এই 'তমসের' কোনো যোগ আছে। যখন ইংলণ্ড ছেড়ে ভারতবর্ষে ফিরে আসি তখনই সে 'তমস' তিরোহিত হয়।'

তামস স্বভাব, তামস জ্ঞান, তামস কর্ম।

তামস স্বভাবে অপ্রকাশ, অনুদ্যম, অনবধানতা। প্রমাদ, অজ্ঞান, বিস্মৃতি। বুদ্ধির বিপর্যয়, মিথ্যায় অভিনিবেশ। প্রকৃত তত্ত্ব না বুঝে অযৌক্তিক তুচ্ছ বিষয়েই যার আসক্তি তারই তামস জ্ঞান। পরিণামে ফল কী হবে, নিজের সামর্থ্য কতটুকু, প্রাণীহিংসা বা কোনো ক্ষয়-ক্ষতি হবে কিনা বিবেচনা না করে যে মোহে পড়ে কর্ম করে তারই তামস কর্ম।

ঊর্ধ্বের আহ্বানে সেই তামস অস্তিত্ব থেকে উত্তীর্ণ হও জ্যোতির্ময় ভাগবত সত্তায়।

অরবিন্দ শুধু পুঞ্জিত অন্ধকারই দেখলেন না, 'তমসে'র পরপারে কী আছে, কে আছে, তাকেও দেখলেন, তাকেও জানলেন। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। গুণাতীত মায়াতীত স্ব-পর-প্রকাশক সেই পরমবস্তু পুরুষোত্তম পরমাত্মাকে চিনলেন।

কী বলছে ঈশোপনিষদ?

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।...
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥

যারা অবিদ্যার উপাসক তারাই অন্ধ অজ্ঞানরূপ তমঃ মধ্যে প্রবেশ করে। ব্রহ্মবিদরা বলেছেন, বিদ্যারও ফল আছে, অবিদ্যারও ফল আছে, সে দু ফল স্বতন্ত্র। যে বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয় জ্ঞানই আয়ত্ত করতে পেরেছে সে-ই অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করে বিদ্যা দ্বারা অমৃতময় পুরুষোত্তমের আনন্দ ভোগ করে।

শ্রীঅরবিন্দ বলছেন: 'ভগবানের প্রকৃতি বিদ্যাবিদ্যাময়ী। আমরা যদি কেবল বিদ্যার মার্গ অনুসরণ করি বিদ্যাময় ব্রহ্ম লাভ করিব, যদি কেবল অবিদ্যার মার্গ অনুসরণ করি অবিদ্যাময় ব্রহ্ম লাভ করিব। বিদ্যা ও অবিদ্যা দুইটিকেই যিনি আয়ত্ত করিতে পারেন তিনিই সম্পূর্ণভাবে বাসুদেবকে লাভ করেন—তিনি বিদ্যা ও অবিদ্যার অতীত।'

তপোভূমি ভারতবর্ষের দিকে মুখ ফেরাতেই যেন বিষয়টা স্পষ্ট হল।

অরবিন্দের যখন সাত বছর বয়স তখন তাকে কৃষ্ণধন বিলেতে নিয়ে চললেন। শুধু অরবিন্দকে নয়, সমগ্র পরিবারকে নিয়ে। পরিবার বলতে বড দুই ছেলে মেয়ে সরোজিনী আর স্ত্রী স্বর্ণলতা।

কৃষ্ণধন তাঁর বন্ধু রংপুরের ম্যাজিস্ট্রেট গ্লেজিয়ারের ভাই ড্রুয়েটের তত্ত্বাবধানে, ম্যাঞ্চেস্টারে রাখলেন ছেলেদের। আবার বলে দিলেন, ছেলেদের কড়া নজরে রেখো, তারা যেন কোনো ভারতীয়ের সঙ্গে না মেশে, ভারতীয় প্রভাবে না পড়ে, যেন তারা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় ভূষিত-মার্জিত হয়ে মনের মতন মানুষ হয়।

কড়া নজরই রাখবে ড্রুয়েট। ভারতবর্ষ ও তার অধিবাসী, ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির নামাভাসও ছেলেদের কাছে পৌছুতে দেবে না।

নিশ্চিন্ত হয়ে দেশে ফিরলেন কৃষ্ণধন।

এদিকে স্বর্ণলতার কোলে জন্ম নিল বারীন। তাঁর উন্মাদরোগের লক্ষণ দেখা দিল। সরোজিনী ও বারীনকে নিয়ে তিনি দেশে ফিরলেন। কৃষ্ণধন তাঁদের

বাসা করে দিলেন খুলনায় নয়, দেওঘরের কাছে রোহিণীতে।

ম্যাঞ্চেস্টার গ্রামার স্কুলে বিনয় আর মনোমোহন ভর্তি হল আর সাত বছরের অরবিন্দ ছোট বলে বাড়িতেই থেকে গেল। ড্রুয়েট দম্পতির হাতেই রইল তার শিক্ষার ভার। স্বামী ল্যাটিনে পণ্ডিত, সে ল্যাটিনে ও ইংরেজিতে অরবিন্দের ভিত পাকা করে দিল—আর স্ত্রী শেখাতে লাগল ফ্রেঞ্চ, অঙ্ক আর ইতিহাস। স্কুলে-পড়া রুটিনের বন্ধন নেই, অরবিন্দ বাড়িতে বসে মনের সুখে ইংরেজি কবিতা পড়তে লাগল। কে তাকে টেনে আনল কবিতায়, তা কে বলবে? নিজের বুদ্ধিতে যতটুকু বোঝে সে পড়তে লাগল বাইবেল আর শেক্সপীয়র, শেলি আর কীটস আর সবচেয়ে বড় কথা, সে একদিন নিজেই একটা কবিতা লিখে ফেলল। এক থেকে একাধিক—ফক্স ফ্যামিলি ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হতে লাগল। অরবিন্দ কবি হয়ে উঠল।

বিষ্ণুভাস্কর লেলেকে অরবিন্দ বললে, আমি যোগ করতে চাই।

কেন? জিজ্ঞেস করলে লেলে।

সন্ন্যাস বা নির্বাণের জন্যে নয়, কাজ করবার জন্যে।

খুব ভালো কথা।

কিন্তু কিছু হচ্ছে না যে।

হবে। লেলে আশ্বাস দিয়ে বললে, তুমি কবি, তুমিই তো যোগী হবে। যোগ কবিদের পক্ষেই সহজলভ্য।

খেলাধুলোয় অরবিন্দের বিশেষ আকর্ষণ ছিল না। ড্রুয়েটদের বাগানে এক-আধ দিন ক্রিকেট খেললেও খেলতে পারেন, সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। ইংলণ্ডে ক্রিকেট-ম্যাচ দেখেছেন, সেটা শুধু দেখা-ই। আর পরে যে বরোদা ক্লাবের অ-খেলোয়াড় সভ্য হয়েছিলেন সেটাও নিতান্ত সভ্যতার খাতিরে। শরীর কৃশ ও দুর্বল ছিল বলে বরোদায় থাকতে মাদ্রাজী কুস্তিগীরদের থেকে কিছু ডন-বৈঠক শিখেছিলেন কিন্তু তাও কিছুদিন পরে অপ্রয়োজনীয় ভেবে ছেড়ে দিলেন। ব্যায়ামের সঙ্গে যোগের কোনো সম্পর্ক নেই। ব্যায়ামী যোগী হতেও পারে, না-ও হতে পারে, কিন্তু যে-ক্রান্তদর্শী কবি, আপাতপ্রতীয়মানকে অতিক্রম করে যে ত্যাখে, উপলব্ধি করে, সে যোগী না হয়ে যায় না।

ভারতীয় সংস্কৃতির থেকে তো ছেলেদের বিচ্ছিন্ন করবে কিন্তু তাদের ধর্ম হবে কী? কৃষ্ণধনকে জিগগেস করেছিল ড্রুয়েট।

ধর্ম? কৃষ্ণধন বললেন, তা ছেলেরা বড় হয়ে নিজেরাই ঠিক করবে।

কিন্তু ড্রুয়েটের বৃদ্ধা মার খুব ইচ্ছে অরবিন্দ খৃষ্টান হয়। ম্যাঞ্চেস্টারে ারবিন্দদের আসার দু-তিন বছর পরেই ড্রুয়েট সস্ত্রীক অস্ট্রেলিয়ায় চলে যায়, ারবিন্দের ভার পড়ে ড্রুয়েট-জননীর উপর। নাকি আসল ভারের ভারী য়ং বাসুদেব ?

বৃদ্ধা ড্রুয়েট-জননী একদিন অরবিন্দকে কাম্বারল্যাণ্ডে এক পাদ্রীদের আড্ডায় য়ে গেলেন। প্রার্থনার শেষে ধর্মান্তরগ্রহণের অনুষ্ঠান। এক পাদ্রী অরবিন্দকে ক্ষ্য করে কী কতগুলি প্রশ্ন করলেন, দশ বছরের বালক অরবিন্দ অবাক হয়ে চয়ে রইল, কোনো উত্তর দিল না। সবাই তখন মহোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল : He is saved, he is saved—পরিত্রাণ পেয়েছে, পরিত্রাণ পেয়েছে! শ্বরের উদ্দেশে সবাই তখন সমস্বরে স্তবাঞ্জলি বর্ষণ করল। কী ব্যাপার, অরবিন্দ একবর্ণও বুঝতে পারল না। পাদ্রী তখন তার কাছে এসে বললে, প্রার্থনা করো। ঘুমুতে যাবার আগে শিশুরা যেমন মুখস্থ প্রার্থনা আওড়ায়, অরবিন্দও তেমনি কায়দামাফিক প্রার্থনা করল।

একে নামের মধ্যে এ্যাকরয়েড, তার উপরে এই পরিত্রাহি ঘটনা—রাষ্ট্র হয়ে গেল অরবিন্দ খৃষ্টান হয়ে গেছে।

অস্ট্রেলিয়া যাবার পথে ড্রুয়েট কলকাতায় কৃষ্ণধনের সঙ্গে দেখা করল। আর কিছুর জন্যে নয়, বকেয়া পাওনা টাকা আদায় করবার জন্যে। ছেলেদের খরচ বাবদ বছরে ৩৬০ পাউণ্ড করে কৃষ্ণধনের দেবার কথা, কিন্তু কৃষ্ণধন হিসেবমত সব টাকা যথাকালে পাঠাতে পারতেন না। স্ত্রীকে দূরে আলাদা বাড়িতে রেখে উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে তাঁর অনেক টাকা বেরিয়ে যেত—তা ছাড়া নিজের পদমর্যাদা অনুযায়ী ঠাট বজায় রাখতেও খরচ ছিল। ফলে ছেলেদের দিন কষ্টে কাটত—তারা মুখ ফুটে কিছু বলত না। বলবেই বা কাকে ? তারা জানত তাদের মা অসুস্থ, বাবা বিড়ম্বিত।

বৃদ্ধা ড্রুয়েট তিন ভাইকে নিয়ে সেণ্ট স্টিফেন্স এভিনিয়ুতে এসে বাসা নিলেন আর মনোমোহনও অরবিন্দকে সেণ্ট পলস স্কুলে ঢুকিয়ে দিলেন।

স্কুলের হেডমাস্টার ডক্টর ওয়াকার অরবিন্দকে পরীক্ষা করে চমকে গেলেন—যে ল্যাটিনে আর ইংরেজিতে বেশ মজবুত, শুধু যা গ্রীকেই কাঁচা—তা তিনি নিজে এই বনেদ তৈরি করে দেবেন। আর ছেলেটির কী সুন্দর স্বভাব, কী নির্মল দীপ্তি চোখে-মুখে!

আশ্চর্য ব্যাপার, অরবিন্দ গ্রীকেও পারদর্শী হয়ে উঠল, আর দ্রুত প্রমোশন

পেতে-পেতে ক্রমান্বিত উঠতে লাগল উঁচু ক্লাসে।

এদিকে ঘটল এক বিপর্যয়।

ধর্মপ্রাণা বৃদ্ধা ড্রুয়েট প্রার্থনার সময় বাইবেল পড়েন আর আশা করে ওরা তিন ভাইও এতে যোগ দিক। বিনয় আর অরবিন্দের কোনো আপত্তি নেই—মাঝে মাঝে বিনয় তো নিজেই পাঠ-পূজা চালায়, কিন্তু মনোমোহন একদিন বেঁকে বসল। এমন একটা সে উক্তি করল যার অর্থ দাঁড়ায় যে সে ঈশ্বরে বিশ্বাসী নয়—ঈশ্বর মানলেই যত লাঞ্ছনা, না মানলেই বরং শান্তি। কথা শুনে বৃদ্ধা দারুণ খেপে গেল। বললে, এমন নাস্তিকের সঙ্গে এক বাড়িতে বাস করা অসম্ভব। বাড়ি নির্ঘাত ভেঙে পড়বে।

বৃদ্ধা বাড়ি ছেড়ে চলে গেল।

অরবিন্দ বলছেন, 'যেন বাঁচলাম! ওঁর ছেলে এ সব ধর্মাধর্ম ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাত না, কিন্তু সে এখন কোথায়? সে তো অস্ট্রেলিয়ায়। সত্যি কথা বলতে কী, আমি ভীষণ ভীতু ছিলাম। আমাকে দেখে কেউ কল্পনাও করতে পারত না যে আমি একদিন বিপ্লবী হব বা ফাঁসির দড়ির মুখোমুখি হব। মানুষ হিসেবে আমার আরম্ভটা কেমন ত্রুটিপূর্ণ, কত ক্লেশে-কষ্টে কত ঠেকতে ঠেকতে না শেষে দিব্যচেতনার উপলব্ধিতে এসে দাঁড়িয়েছি।'

তিন ভাইও ও-বাড়ি ছাড়ল, উঠল এসে ১২৮ ক্রমওয়েল রোডে, সাউথ কেনসিংটন লিবারেল ক্লাবের দোতলায়। ক্লাবের সেক্রেটারি জেমস কটনের সহায়ক হিসেবে বিনয় চাকুরি নিল সপ্তাহে পাঁচ শিলিং মাইনেয়। স্যর হেনরি কটন আই-সি-এস-এর ভাই জেমস কটন। কৃষ্ণধনের পরিচিত হেনরি, তারই দৌলতে এই পাঁচ শিলিং। তিন ভাইয়ের তখন এই সম্বল।

কী দারুণ দারিদ্র্যে দিন কেটেছে ভায়েদের! এই শীতে কারু একটা ওভারকোট নেই। ঘরে নেই কোনো তাপের ব্যবস্থা—আর যাই হোক, সে ঘরকে কেউ শোবার ঘর বলে না। ঘরের লাগোয়া পিছনে রেল-লাইন, থেকে থেকেই ট্রেনের শব্দ। আর খাওয়া কী! সকালে চা রুটি আর এক টুকরো হ্যাম, বিকেলে শুধু সসেজ আর চা। কল্পনা করা যায় না।

এত কষ্ট সইল না মনোমোহনের। সে এক বোর্ডিং হাউসে চলে গেল। কী করে যে সেখানে সে খাবার যোগাড় করবে তা সে-ই জানে।

সেই ক্লাব-ঘরে সেই বিশীর্ণ অবস্থায় দু বছর ছিল অরবিন্দ। পুরো এক বছর ঐ নিষ্পাপ বালক একদিনের জন্যেও লাঞ্চ ও ডিনার খায়নি।

কলেজের মাইনে বাকি পড়লে প্রিন্সিপ্যাল অরবিন্দকে ডেকে পাঠালেন।

মাইনে দাওনি কেন?

বাবা পাঠাননি।

প্রিন্সিপ্যাল কৃষ্ণধনকে চিঠি লিখলেন। উত্তরে ঠিক গুনে মাইনের টাকা টাই পাঠালেন কৃষ্ণধন। সঙ্গে এক বক্তৃতা জুড়লেন, অরবিন্দ যেন মিতব্যয়ী না হয়।

মনে দুঃখ পেল অরবিন্দ। পাঁচ শিলিঙে যখন অমানুষিক ক্লেশে দিন কাটছে খন কিনা এই অমিতব্যয়িতার অভিযোগ!

ছেলেবেলা থেকেই অরবিন্দের কায়সাধন, কৃচ্ছ্রসাধন। বিপদ ও বাধার রুদ্ধে প্রতিরোধ। দারিদ্র্যের সঙ্গে সরল সহাবস্থান। যারা বলে রুপোর মচ নিয়ে জন্মেছিল অরবিন্দ, তারা দেখল সে চামচ কখন কাঠের হয়ে গিয়েছে। ধু যুদ্ধ আর যুদ্ধ, পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধ—পণ্ডিচেরিতে যখন দোতলার ঘরে নর্জনবাস করছেন তখনো তাঁর যুদ্ধ, ভিতরে-বাইরে সে যুদ্ধ আধ্যাত্মিক। সে বিরতিহীন।

কিন্তু এদিকে স্কুলে-কলেজে লেখাপড়ার খবর কী?

সেণ্ট পলসে পাঁচ বছরে ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রাচীন ও আধুনিক দুই ক্ষত্রেই অনেক কীর্তির মুকুট আহরণ করল অরবিন্দ। সাহিত্যে বাটারওয়ার্থ প্রাইজ পেল, ইতিহাসে পেল বেডফোর্ড প্রাইজ। ল্যাটিন আর গ্রীকে তো টেই, ফ্রেঞ্চেও পারদর্শী হয়ে উঠল। ইটালিয়ান জার্মান ও স্প্যানিশ ভাষাতেও ান চলনসই। আর ইংরেজি তো শোনায় যেন মাতৃভাষা।

স্কুলের লিটারারি সোসাইটিতে ছাত্রদের মধ্যে তর্কযুদ্ধ হয়। তাতে দু-দুবার যাগ দিয়ে অরবিন্দ অসামান্য কৃতিত্ব দেখায়। একবারের বিষয়, রাজনৈতিক তবাদে সুইফট-এর আত্মখণ্ডন, দ্বিতীয়বারের বিষয়—মিলটন। সবচেয়ে ড় কথা, স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অরবিন্দ ক্লাসিকস বা প্রাচীন াহিত্যে বার্ষিক আশি পাউণ্ডের একটা বৃত্তি লাভ করল। সে বৃত্তির শর্তে াকে এখন পড়তে যেতে হবে কেমব্রিজে, কিংস কলেজে।

বৃত্তির টাকায় দুঃস্থতার কিছু আসান হল। একা অরবিন্দের নয়, তিন াইয়ের। অরবিন্দের সবচেয়ে বড় আরাম ছিল ক্লাব-বাড়ির রিডিং রুম। সখানে বসে কবিতা পড়া, পড়তে-পড়তে নিজেরই দু-একটা লিখে ফেলা— ধাতৃষ্ণা-ভোলানো এমন আনন্দ আর কোথায়? অরবিন্দের সব চেয়ে বেশি

ভালো লাগত শেলির Revolt of Islam—রক্তপাতহীন বিদ্রোহে অত্যাচারী শয়তানকে সিংহাসনচ্যুত করে এক মানব-সাম্যের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা! স খুঁটিয়ে বুঝতে পারতেন না, কিন্তু হৃদয়ের তন্ত্রীতে অলক্ষ্যে স্পন্দন জাগত তিনিও একদিন অমনি বিদ্রোহ করবেন ও ঘটাবেন পৃথিবীর রূপান্তর। ক লরেন্স বিনিয়ন মনোমোহনের বন্ধু, সে একদিন অরবিন্দের কবিতা দেখে ফেলল, বললে, চমৎকার তো। তুমি লেখ, তোমার হবে।

আরো এক দুঃসাহসিক কাণ্ড করল অরবিন্দ। বাবার কথা ভেবে আই-সি এস পরীক্ষার সে প্রার্থী হল। একজন শিক্ষক রাখলে সুরাহা হত কিন্তু সে সঙ্গতি কই? একমাত্র ভরসা তার ল্যাটিন ও গ্রীক-এ বুৎপত্তি। দেখি পরীক্ষা কী হয়!

কিংস কলেজে ঢুকে বাবাকে চিঠি লিখল অরবিন্দ:

গতকাল রাত্রে আমাদের কলেজের একজন অধ্যাপক তাঁর ঘরে আমাকে কফি খেতে ডেকেছিলেন। সেখানে ও-বি ওরফে অস্কার ব্রাউনিঙের সঙ্গে দেখা ইনিই কিংস কলেজের মুকুটমণি। তিনি আমার খুব প্রশংসা করছিলেন—পৃথিবী যাবতীয় বিষয়, নৃত্য থেকে শুরু করে পাণ্ডিত্য পর্যন্ত আলোচনা করছিলেন আমা সঙ্গে। 'জানো, তুমি একটা খুব উঁচু পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়েছ,' আমাকে বললে ও-বি, 'আমি প্রাচীন সাহিত্যে এ পর্যন্ত তেরোটা পরীক্ষার খাতা দেখেছি, কি তোমার মত এত চমৎকার খাতা আর দেখিনি। আর তোমার রচনাটা ছি অনবদ্য।' রচনার বিষয় ছিল শেকস্পীয়রের সঙ্গে মিলটনের তুলনা। আমি এতে আমার প্রাচ্য মনের প্রবণতায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বর্ণাঢ্য রূপকল্পনা ঢে দিয়েছিলাম, ভাষাকে সাজিয়ে দিয়েছিলাম বিচিত্র বাক-চাতুরীর অলঙ্কারে আ আমার আবেগ যেমনি অগাধ তেমনি আন্তরিক হয়ে উঠেছিল। আমার মনে হয়েছিল এর চেয়ে ভালো রচনা আমি আর লিখিনি। স্কুলে ক্লাসের পরীক্ষা হলে এ রচনা এশিয়াবাসীর সুলভ প্রগল্ভতা বলে নিন্দিত হত। আমি কোথা থাকি জিজ্ঞেস করলেন ও-বি। আমি ঘরের কথা জানালে তিনি বললেন, ' হতচ্ছাড়া গর্তে তুমি থাকো!' হস্টেলের পরিচালককে বললেন, 'ছাত্রদের প্রতি আমরা কী নিষ্ঠুর! মহামতিরা আমাদের কাছে আসে আর আমরা তাদের সব বাক্সের মধ্যে বন্দী করে রাখি, যাতে ওদের গৌরবকে রাখতে পারি দাবিয়ে

কৃষ্ণধনের জন্যে আরো ভালো খবর আছে।

অরবিন্দ আই-সি-এস পরীক্ষায় একাদশ স্থান অধিকার করে সসম্মানে উত্তী

হয়েছে। শ্যালক যোগেন বসুকে চিঠি লিখছেন কৃষ্ণধন :

'আমার তিন পুত্র কীর্তিতে অতিকায় হবে। আমি হয়তো দেখব না কিন্তু তুমি দেখে যাবে এবং দেখে গর্ববোধ করবে তোমার তিন ভাগ্নে দেশের শোভা হয়ে তোমার নামকেও উজ্জ্বল করেছে। বেনো কাজে-কর্মে তার বাপের মতন হবে, স্বার্থত্যাগী ও পরোপকারী কিন্তু তার কর্মের পরিধি ছোট থাকবে। মনো তার বাপের আবেগ ও অনুভূতির স্বত্ব পাবে আর পাবে বিশ্বব্যাপী আত্মার বিরাট অভীপ্সা, যা কিনা সমস্ত কুটিলতা ও সংকীর্ণতার অস্বীকার। আর তার মধ্যে আসবে তার মাতামহের কবিত্ব। আর অরো, নিজের কৃতিত্বে সে কেমব্রিজে কিংস কলেজে ঢুকেছে, আমি আশা করি তার প্রদীপ্ত পরিচালনায় সে স্বদেশকে মহিমোজ্জ্বল করে তুলবে। আমি হয়তো সম্পূর্ণ দেখে যেতে পারব না, কিন্তু তুমি যদি বেঁচে থাকো, আমার চিঠির কথা মিলিয়ে নিয়ো।'

এখন অরবিন্দ কবে দেশে ফেরে! কবে তার সঙ্গে দেখা হয়!

৷ চার ৷

শ্রমনিষ্ঠা ও ধারণক্ষমতা।

কেমব্রিজের প্রবীণ শিক্ষক প্রথেরো তরুণ অরবিন্দের মধ্যে দুই মহৎগুণ আবিষ্কার করলেন—'industry and capacity' এবং দুই গুণই অনন্যসাধারণ। জেমস কটনকে লিখছেন প্রথেরো : আই-সি-এস পাশ করার দু বছরের মধ্যেই অরবিন্দ ক্লাসিক্যাল ট্রাইপস পরীক্ষার ফার্স্ট পার্ট পাশ করে ফেলল। অর্থের অভাবে স্কলারশিপ ছাড়তে পারে না, তাই সসম্মানে শর্ত পূরণ করে দিল। আই-সি-এস-এর জন্যে তার আরো কিছু কৃত্য বাকি ছিল, সেগুলো যথাবিধি পালন করার পরেও এই ট্রাইপস-এ সফল হওয়া চারটিখানি কথা নয়। বোঝা যাচ্ছিল ছেলেটি যেমন পরিশ্রমী তেমনি মেধাবান।

ছেলেটির প্রধান বিত্ত তার চরিত্র। এই দু বছর তার পক্ষে কী কঠিন দুঃসময় ছিল, দিন কেটেছে গভীর উদ্বেগে ও উৎকণ্ঠায়, কিন্তু তার সাহস ও অধ্যবসায় কিছুতেই স্তিমিত হয়নি।

একাগ্র হয়ে নিজের ব্রতসাধনে নিবিচল থেকেছে অরবিন্দ। আর এই একচিত্ততাই কি যোগ নয়?

যোগস্তত্রৈকচিত্ততা।

'আমি ওর বাবার কাছে কয়েকবার লিখেছি ওর অনটনের কথা কিন্তু প্রায়ই তা নিষ্ফল হয়েছে। একবার তো দোকানের দেনায় অরবিন্দ প্রায় কোর্টে তলব হচ্ছিল, আমি অনেক করে তার বাবাকে লিখে টাকা আনিয়ে হাঙ্গামা মেটাই। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি এ-দেনা অরবিন্দের কোনো অমিতব্যয়িতার ফল নয়। নিতান্তই ন্যায়সঙ্গত খরচ।'

অরবিন্দ বললেন, 'টাকা কোথায় যে অমিতব্যয়ী হব!'

একমাত্র প্রেমই অমিতব্যয়ী—আনন্দই অমিতব্যয়ী। যত খরচ হচ্ছে ততই আবার জমে উঠছে। যত জমে উঠছে ততই আবার ছড়িয়ে পড়ছে।

বাবা ঠিকমত টাকা পাঠাচ্ছেন না বটে কিন্তু ইংরেজি খবরের কাগজ 'বেঙ্গলি' পাঠাচ্ছেন। পাঠাচ্ছেন স্থানবিশেষ পেন্সিলে দাগ দিয়ে। যেখানে ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজের দুর্ব্যবহারের সংবাদ ছাপা হয়েছে সেইখানেই ঐ চিহ্ন। দেখ, পড়ো, পরশাসনে ভারতবর্ষের কী লাঞ্ছনা! কৃষ্ণধন নিজে যতই সাহেব হোন ইংরেজ শাসকের ঔদ্ধত্য বুঝি ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছিল। রংপুরের ঐ বদলির ব্যাপার থেকেই এই উত্তেজনা। কাগজ পাঠিয়ে ছেলেদের যেন তিনি বলছেন, তোমরাও এই পরাধীনতার যন্ত্রণাটা অনুভব করো।

অরবিন্দ অনুভব করছিলেন, দেশময় বন্ধনমুক্তির যে বিপ্লব শুরু হবে তাতে যোগ দিতে তাঁরও ডাক আসবে উপর থেকে—প্রলয়ঙ্করের ডাক—আর তিনি তাতে নায়কের ভূমিকা নেবেন। আসলে বন্ধনমুক্তি তো শুধু ভারতবর্ষের নয়, সমগ্র পৃথিবীর—আর তখন তো তাঁর ভূমিকা মহানায়কের।

পৃথিবীর মুক্তির জন্যেই তো ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রয়োজন।

লিখছেন অরবিন্দ: 'ভারতবাসী জগতের গুরুস্থান অধিকার করিয়া নূতন যুগ পরিবর্তন করিতে উঠিতেছেন। তাঁহার সাহায্যে বঞ্চিত হইলে পাশ্চাত্যগণ উন্নতি-চেষ্টায় সিদ্ধকাম হইতে পারিবেন না। যেমন আন্তরিক জীবন-বিকাশের সর্বপ্রধান উপায়স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান ও যোগাভ্যাসে ভারত ভিন্ন অন্য কোনো দেশ উৎকর্ষলাভ করে নাই তেমনই মনুষ্যজাতির প্রয়োজনীয় চিত্তশুদ্ধি ইন্দ্রিয়সংযম ব্রহ্মতেজ তপঃক্ষমতা ও নিষ্কাম কর্মযোগশিক্ষা ভারতেরই সম্পত্তি।...

প্রকৃতপক্ষে য়ুরোপ ভোক্তৃভূমি, ভারত দাতৃভূমি। দেব ও অসুর বলিয়া গীতায় দুই শ্রেণীর জীব বর্ণিত আছে। ভারতবাসী স্বভাবতঃ দেবপ্রকৃতি, পাশ্চাত্যগণ স্বভাবতঃ অসুরপ্রকৃতি। কিন্তু এই ঘোর কলিতে পড়িয়া তমোভাবের প্রাধান্যবশতঃ আর্য-শিক্ষার অবলোপে, দেশের অবনতিতে, আমরা নিকৃষ্ট আসুরিক

বৃত্তি সঞ্চয় করিতেছি আর পাশ্চাত্ত্যগণ অন্যদিকে জাতীয় উন্নতি ও মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশের গুণে দেবভাব অর্জন করিতেছেন। ইহা সত্ত্বেও তাহাদের দেবভাবে কতকটা অসুরত্ব ও আমাদের আসুরিক ভাবের মধ্যেও দেবভাব অস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান।...'

জেলের কথা বলতে গিয়ে লিখছেন অরবিন্দ: 'যদি কোনও স্থানে ভারতবাসীর চরিত্র ঘৃণার চক্ষে দেখিতে হয়, যদি কোনও অবস্থায় তাহার নিকৃষ্ট অধম ও জঘন্য ভাবের পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়, তবে আলিপুর জেলই সেই স্থান, আলিপুরে কারাবাসই সেই নিকৃষ্ট হীন অবস্থা। আমি এই স্থানে এই অবস্থায় বারো মাস কাটাইলাম। এই বারো মাস অনুভবের ফলে, ভারতবাসীর শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণা, মনুষ্যচরিত্রের উপর দ্বিগুণ ভক্তি এবং স্বদেশের ও মনুষ্যজাতির ভবিষ্যৎ উন্নতি ও কল্যাণের দশগুণ আশা লইয়া কর্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিয়াছি।'

জেল সম্পর্কে আরো লিখছেন: 'অবশ্যই জেলে চোর-ডাকাত সাধু-সন্ন্যাসী হয় না। ইংরাজের জেল চরিত্র শুধরাইবার স্থান নহে, বরং সাধারণ কয়েদীর পক্ষে চরিত্রহানি ও মনুষ্যত্ব নাশের উপায়মাত্র। তাহারা যে চোর ডাকাত খুনী ছিল, সেই চোর ডাকাত খুনীই থাকে, জেলে চুরি করে, শক্ত নিয়মের মধ্যেও নেশা করে, জুয়াচুরি করে। তাহা হইলে কি হইবে, ভারতবাসীর মনুষ্যত্ব গিয়াও যায় না।'

ভারতবাসীর বৃহৎ ভবিষ্যতে অরবিন্দের বলিষ্ঠ বিশ্বাস। ভারতবাসীই উত্থিত হয়ে সমস্ত জগৎবাসী মানুষকে দেবমানবত্ব বা মানবদেবত্বের শিক্ষা দেবে।

কী আরো বলছেন অরবিন্দ?

বলছেন: 'বাহ্য সুখ-দুঃখকে তাচ্ছিল্য করিয়া আন্তরিক স্বাধীনতা অর্জন করা ভারতবাসীরই সাধ্য, নিষ্কাম কর্মে ভারতবাসীই সমর্থ, অহঙ্কার-বর্জন ও কর্মে নির্লিপ্ততা তাঁহারই শিক্ষা ও সভ্যতার চরম উদ্দেশ্য বলিয়া জাতীয় চরিত্রে বীজরূপে নিহিত।...ভ্রাতৃভাব, আত্মজ্ঞান, ভগবৎপ্রেম যেমন সহজে ভারতবাসীর মনকে অধিকার করিয়া কার্যে প্রকাশ পায়, আর কোনও জাতির তেমন সহজে হওয়া সম্ভব নয়। চাই তমোবর্জন, রজোদমন, সত্ত্বপ্রকাশ। ভারতবর্ষের জন্য ভগবানের গূঢ় অভিসন্ধিতে তাহাই প্রস্তুত হইতেছে।'

কেমব্রিজে 'ইণ্ডিয়ান মজলিশ' নামে ভারতীয়দের যে একটা তর্ক-সভা ছিল অরবিন্দ কিছুকাল সেই সভার সম্পাদক ছিলেন। সেই সভায় রাজনৈতিক বক্তৃতা দিতেন অরবিন্দ—তেজস্কর বক্তৃতা। ভারতীয় রাজনীতিতে তখন বাজছিল

একটা ঢিমে আওয়াজের সুর, অরবিন্দ তাঁর বক্তৃতায় বিপ্লবের ডঙ্কা বাজালেন। মজলিশ ছাড়া Lotus and Dagger—'কমল ও কৃপাণ' নামে একটা গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছিল লণ্ডনে। অরবিন্দ সেই গুপ্ত সমিতিরও সভ্য হলেন। সমিতির সভ্যদের শপথ নিতে হত—দেশের মুক্তির জন্যে প্রত্যেককেই বিশেষ কোনো একটা কাজ করতে হবে। অরবিন্দের কী কাজ? বক্তৃতা? কাব্যরচনা? না কি অনাদ্যন্ত আদিগন্ত সত্যের তপস্যা?

শুধু রাজনৈতিক মুক্তি পেলেই কি তৃপ্তি হবে? পর্যাপ্তি হবে?

ভগবানকে দেখতে হবে না? পেতে হবে না? ভগবান হয়ে উঠতে হবে না? ভগবান মানুষ হয়েছেন আর মানুষই কি ভগবান না হয়ে ছাড়বে?

দেশে দাদামশাই রাজনারায়ণ বসুও একটা গুপ্ত সমিতি চালাতেন—রবীন্দ্রনাথ তার সভ্য ছিলেন।

লিখছেন রবীন্দ্রনাথ: 'জ্যোতিদাদা এক গুপ্ত সভা স্থাপন করেছেন—ঠনঠনের একটা পোড়োবাড়িতে এই সভা বসত। ঋগ্বেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান—রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত—সেখানে আমরা ভারত-উদ্ধারের দীক্ষা পেলাম।'

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সে ছিল শুধু 'উত্তেজনার আগুন পোহানো'। অরবিন্দের বেলায় তাঁর নিজেরই আগুন হয়ে ওঠা। উর্ধ্বে গমন করে বলেই তো অগ্নি।

আই-সি-এস-এর শিক্ষানবিশি পর্বে তিনটে বিভাগীয় পরীক্ষা পাশ করতে হয়। তাও স্বচ্ছন্দে পাশ করল অরবিন্দ। এবার স্বাস্থ্যপরীক্ষা ও ঘোড়া-চড়ার দক্ষতা-প্রমাণ। স্বাস্থ্যপরীক্ষায় ঠেকল না, এবার দেখাও কেমন ঘোড়ায় চড়তে শিখেছ। দিন ঠিক হল ১৮৯২-এর ৮ই অগাস্ট। পরীক্ষক হাজির, অরবিন্দ গেল না, মেডিকেল সার্টিফিকেট পাঠাল। পনেরোই অগাস্ট অরবিন্দের কাছে চিঠি গেল কবে পরীক্ষায় আসতে পারবে। চিঠির উত্তর নেই। তিন-তিনটে তাগাদা পাঠাবার পর অরবিন্দ জানাল ২৫ কি ২৬ অক্টোবর হলে ভালো হয়। তাই সই, ২৬শে অক্টোবরই এস। ২৬শেও অরবিন্দ অনুপস্থিত। কী ব্যাপার? উত্তর নিয়ে আসবার জন্যে অরবিন্দের কাছে সরাসরি লোক গেল। লোক খবর নিয়ে এল, ২৬ তারিখই যে পরীক্ষার দিন বলে নির্ধারিত হয়েছে সে-চিঠি সে পায়নি। আবার দিন ঠিক হল—এবার ১৫ই নভেম্বর। কোথায় অরবিন্দ? তার বাড়ি

গিয়ে দেখে এস তো। অরবিন্দ বাড়ি নেই।

স্পষ্ট বোঝা গেল অরবিন্দ ঘোড়া-চড়ার পরীক্ষা দিতে রাজী নয়।

কেন? কী ব্যাপার? সে চায় না আই-সি-এস হতে। সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের হাতিয়ার হতে।

কিন্তু বাবার কত দিনের স্বপ্ন, সমস্ত পরিবারের পক্ষে কত বড় মর্যাদা। চাকরিতে সরাসরি ইস্তফা দিলে সমস্ত পরিবার ক্ষিপ্ত হত, অরবিন্দকে বাধ্য করত বশ্যতায়। প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ এড়াবার জন্যে এইই সুন্দর পাশ কাটানো—ঘোড়া-চড়ায় পারদর্শী নই বলে কর্তারাই বাতিল করলে। যেন বললে, যাও, যে ঘোড়া গাড়ি টানে সেই গাড়ির সওয়ার হও গে।

বরোদায় অরবিন্দের বাংলার মাস্টার দীনেন্দ্রকুমার রায় লিখছেন: 'অরবিন্দের ভিক্টোরিয়া গাড়ী ছিল। ঘোড়াটা খুব বড়, কিন্তু চলনে গাধার দাদা! চাবুকেও তাহার গতিবৃদ্ধি হইত না। গাড়ীখানি যে কত কালের—তাহা কেহ বলিতে পারিত না। অরবিন্দের সকলই বিচিত্র! যেমন পোশাক পরিচ্ছদ, তেমনই গাড়ী, তেমনই বাড়ী।'

তেমনি ঘোড়া!

পরে লিখছেন অরবিন্দ: আমার অসাফল্যের জন্যে বাবাও আংশিক দায়ী। ঘোড়াচড়া শিখতে মাস্টার লাগে আর তার খরচও প্রচণ্ড। বাবা তেমন টাকা পাঠাতেন কই? আর মাস্টার যাকে জুটিয়েছিলাম সেও উদাসীন। ঘোড়াটা আমার কাছে রেখে, যা টাকা দিতাম তাই নিয়ে চলে যেত। তা ছাড়া, বলতে কি, আমারও আগ্রহ ছিল না—

অক্টোবরে অরবিন্দ কেমব্রিজ ছেড়ে লণ্ডনে বার্লিংটন রোডে দাদাদের সঙ্গে গিয়ে জুটল। পনেরোই নভেম্বর উলউইচে পরীক্ষা দেবার কথা আর যথাসময়ে সে কিনা লণ্ডনের রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সন্ধ্যার পর খবর নিয়ে বাড়ি ফিরে মুখে সূক্ষ্ম একটি ব্যঙ্গের হাসি এঁকে বিনয়কে বললে, 'আমি ফেল করেছি।'

বিনয় তো আই-সি-এস-এই ফেল করেছে, সে আর কী বলবে! বললে, 'আয় তাস খেলি।'

কিন্তু মনোমোহন যখন শুনল, যেন কী ভীষণ সর্বনাশ হয়েছে এমনি গগন-বিদারণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল।

যার সর্বনাশ তার কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। তার মুখে শুধু অবজ্ঞার হাসি।

সহজে পরিত্রাণ নেই অরবিন্দের। একে তো দাদাদের পীড়াপীড়ি, তায়

জেমস কটন এসে ধরল, সেক্রেটারি অব স্টেট লর্ড কিম্বারলির কাছে অবিলম্বে আবেদন-পত্র পাঠাও। তোমার জন্যে হেনরি কটন আরা শহরে প্রথম পোস্টিং ঠিক করে রেখেছে—ঘুঁটি কাঁচিয়ে দিলে চলবে না।

অগত্যা অভিভাবকদের উপরোধে ২১শে নভেম্বর অরবিন্দ লর্ড কিম্বারলির কাছে আবেদন-পত্র পাঠাল। বক্তব্য দারিদ্র্য, বাবার অক্ষমতা, পরামর্শদাতা বা সাহায্যকারী ইংরেজ বন্ধুর অভাব।

আণ্ডার-সেক্রেটারি রাসেল দরখাস্ত সুপারিশ করল। লিখল, আমার মতে প্রার্থী একজন অসাধারণ ছাত্র, তার যোগ্যতা প্রশ্নাতীত। আমার বিশ্বাস এক-মাত্র দারিদ্র্যই তার সাফল্যের পরিপন্থী।

কিন্তু লর্ড কিম্বারলি অন্যরকম সিদ্ধান্ত করলেন। তিনি জানতেন 'কমল ও কৃপাণ' চক্রের কথা, শুনেছেন মজলিশে অরবিন্দের রাজনৈতিক বক্তৃতার কথা—সে বক্তৃতা মৃদু-মন্থর নয়, তেজস্তপ্ত।

'আমি দুঃখিত, রাসেলের সঙ্গে আমি একমত হতে পাচ্ছি না।' লর্ড কিম্বারলি মন্তব্য করলেন: 'সিভিল সার্ভিসে মিস্টার ঘোষের অন্তর্ভুক্তি বাঞ্ছনীয় নয়।'

ঘোড়া-চড়ার পরীক্ষায় হাজির না হওয়ায় গভর্ণমেণ্টের মুখ বেঁচেছে—তারা অরবিন্দকে প্রত্যাখ্যান করার নিটোল সুযোগ পেল। নইলে সাধারণ ক্ষেত্রে রাইডিং-টেস্টে একবার ফেল করলেও দেশে গিয়ে আবার পরীক্ষা দেবার সুযোগ দেওয়া হয়। অরবিন্দকে প্রত্যাখ্যান করার আসল কারণ 'কমল ও কৃপাণ', মজলিশের ধারালো বক্তৃতা।

প্রত্যাখ্যানের চূড়ান্ত আদেশ বেরুল ৭ই ডিসেম্বর।

শুনলে বাবা না-জানি কত ভেঙে পড়বেন! অরবিন্দের মনের কোণে এখন এই ভাবনাই উঁকি দিচ্ছে।

প্রথেরো লিখছেন কটনকে: শুধু ঘোড়সওয়ার হতে পারল না, কিংবা ঠিক দিনে পরীক্ষায় উপস্থিত হতে পারল না বলে এমন এক শক্তিধরকে গভর্ণমেণ্ট হারাল এ এক সরকারী অদূরদর্শিতার দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কিছু নয়।

পরে শ্রীঅরবিন্দ বলছেন: যদি সত্যি আই-সি-এস-এর চাকরি পেতাম, ওরা আমাকে আমার কুড়েমি ও বকেয়া কাজের জন্যে ডিসমিস করে দিত।

এখন কী করা!

এখন প্রত্যাবর্তন। এখন দেশের ছেলের দেশে ফিরে যাওয়া।

ক্লাসিক্যাল ট্রাইপস-এর সেকেণ্ড পার্ট পাশ করতে হলে আরো দু বছর থাকা দরকার। সে অসম্ভব। যে ফার্স্ট পার্টের কোর্স তিন বছরের তা তো অরবিন্দ দু বছরেই সমাধা করেছে। স্বাভাবিকভাবে ডিগ্রি পেতে হলে আরো এক বছর অপেক্ষা করতে হয়। তাও সাধ্যাতীত। শুধু একটা দরখাস্ত করলেই ডিগ্রি পাওয়া যায় কিন্তু সেইটুকুতেও অরবিন্দের গা নেই। কী হবে ডিগ্রী দিয়ে? অরবিন্দ তো বিশুদ্ধ বিদ্যাচর্চার বৃত্তিতে আবদ্ধ থাকছে না।

দেশে তবে খালি হাতেই ফিরে যেতে হবে?

না, আই-সি-এস-এর শিক্ষানবিশি ভাতা দেড়শো পাউণ্ড অরবিন্দকে যাহোক দিয়েছে গভর্ণমেণ্ট। কিন্তু ভাতা দিয়ে কী হবে—চাকরি কই!

কী করে কখন যে ঘটনার চাকা ঘোরে কেউ বলতে পারে না।

বরোদার গাইকোয়াড় তখন লণ্ডনে আছেন, জেমস কটন তাঁর সঙ্গে অরবিন্দের আলাপ করিয়ে দিল। অরবিন্দকে খুব ভালো লাগল গাইকোয়াড়ের, এক কথায় তিনি তাঁর স্টেট সার্ভিসে তাকে চাকরি দিলেন, মাইনে দুশো টাকা।

বাজার-দর বা ব্যবসাবুদ্ধির কোনো ধারণা নেই—অরবিন্দ দুশোতেই সন্তুষ্ট।

গাইকোয়াড় বলে বেড়াতে লাগলেন, দুশো টাকায় একটা সিভিলিয়ান গেঁথেছি।

কার্থেজ জাহাজে ১৮৯২-এর ডিসেম্বরের শেষাশেষি স্বদেশের অভিমুখে যাত্রা করল অরবিন্দ।

নামের এ্যাকরয়েড ত্যাগ করে বিশুদ্ধ অরবিন্দ হয়ে গেল। পুরো নাম দাঁড়াল অরবিন্দ ঘোষ। যিনি মুদ্রিত একটি কমলকলিকার শতদল পদ্মে মহা-জাগৃতির বার্তা ঘোষণা করছেন তিনিই অরবিন্দ ঘোষ। জেগে ওঠো, খুলে দাও, উদ্‌ঘাটিত করো—কুহক-কুহেলিকার আবরণে নিজের থেকে নিজের শাশ্বত পরিচয় গোপন করে রেখো না। ভাগবতী করুণার প্রসাদ ধরবার জন্যে দেহ-মন-প্রাণের পবিত্র পাত্র ঊর্ধ্বে তুলে ধরো। নির্বিষয় রিক্ততাই পবিত্রতা।

কৃষ্ণধনের কাছে খবর পৌঁছল—অরবিন্দ শেষ পর্যন্ত আই-সি-এস হতে পারে নি, বরোদায় চাকরি নিয়েছে। সন্দেহ কী, হতাশায় ম্লান হয়ে গেলেন কৃষ্ণধন। কিন্তু এ নিয়ে দুঃখ করে কোনো লাভ নেই। ছেলে এখন শুভেলাভে দেশে ফিরে আসুক এই প্রার্থনা।

একটানা চৌদ্দ বছর বিলেতে থেকে দেশে ফিরছে অরবিন্দ। কিন্তু ইংলণ্ডের

প্রতি তার এতটুকু টান নেই, যা টান শুধু ইংরেজি কবিতার প্রতি, তাই ইংলণ্ড ছেড়ে যেতে তার একটুও কষ্ট হচ্ছে না। বিলেতে এতদিনেও তার কোনো বন্ধু হয়নি, কোথাও নেই কোনো স্নেহাসক্তি। দ্বিতীয় দেশ বলতে যদি কোনো আকর্ষণ থেকে থাকে সে হচ্ছে ফ্রান্স—যে দেশে সে যায়নি, যে দেশ সে দেখেওনি কোনোদিন। তার কাছে এখন অগ্রগণ্য তার নিজের দেশ—প্রথম দেশ। সেখানে তার কত কাজ—সমস্ত কাজ। নতুন কাজ, আসল কাজে ফিরে যাবার জন্যেই তার এখন ব্যাকুলতা। মা তাকে ডাকছেন।

'পদ্মের নন্দন হতে সরস্বতী ডেকেছে আমারে
ডেকেছে সে চিরন্তন তুষারের-উর্ধ্বের ধবলে,
যেথা গঙ্গা সুদক্ষিণা প্রবাহিতা সিন্ধু-অভিসারে
যার দুই তীর ভরি পারিজাত সুগন্ধ উথলে ॥'

শ্রীঅরবিন্দের দুর্গাস্তোত্র স্মরণ করো :

'মাতঃ দুর্গে! স্বার্থে ভয়ে ক্ষুদ্রাশয়তায় ম্রিয়মাণ ভারত। আমাদের মহৎ কর, মহৎপ্রয়াসী কর, উদারচেতা কর, সত্যসঙ্কল্প কর। আর অল্পাশী, নিশ্চেষ্ট, অলস ভয়ভীত যেন না হই ॥

'মাতঃ দুর্গে! যোগশক্তি বিস্তার কর। তোমার প্রিয় আর্য সন্তান আমাদের মধ্যে লুপ্ত শিক্ষা, চরিত্র, মেধাশক্তি, ভক্তিশ্রদ্ধা, তপস্যা ব্রহ্মচর্য, সত্যজ্ঞান বিকাশ করিয়া জগৎকে বিতরণ কর। মানবসহায়ে দুর্গতিনাশিনি জগদম্বে, প্রকাশ হও ॥'

লণ্ডন থেকে জাহাজ ছেড়েছে, ব্যাঙ্কার গ্রিণ্ডলে কোম্পানি কৃষ্ণধনকে খবর দিল, কবে পৌছুবে তারও একটা সম্ভাব্য তারিখ দিল। কিন্তু কোথায় জাহাজ, কোথায় কী! নিদারুণ খবর এল সেই জাহাজ পর্তুগালের উপকূলে সমুদ্রে ডুবে গিয়েছে। কৃষ্ণধন সিদ্ধান্ত করলেন, তা হলে তাঁর অরো আর বেঁচে নেই। সেই দুর্দান্ত আঘাত তিনি সইতে পারলেন না। মুখে অরবিন্দের নাম করতে করতে হার্ট-ফেল করে মারা গেলেন।

সব কী রকম ভুল হয়ে গেল!

জাহাজডুবির খবরটা ভুল নয়, ভুল জাহাজের নামে। অরবিন্দ আসছিল পরের জাহাজে, কার্থেজে, সে নামটা ঠিক মত দেয়নি গ্রিণ্ডলে। কার্থেজও ঝড়ে পড়েছিল, কিন্তু সামলে নিয়েছে। বম্বে পৌছুতে তার অসুবিধে হয়নি।

পিতা-পুত্রে দেখা হল না।

ব্রজেন্দ্রনাথ দে, আই-সি-এস ১৯৫৪-এর ক্যালকাটা রিভিয়্যুতে একটু অন্যরকম লিখেছেন :

খুলনার সি-এম-ও ডাক্তার ঘোষের শেষ পর্যন্ত ধারণা ছিল ছেলে আই-সি-এস হয়েছে। এক মাসের ছুটি নিয়ে বম্বে গেলেন ছেলেকে সগৌরবে বাড়ি নিয়ে আসতে। কিন্তু বম্বেতে পৌঁছে জাহাজের কোনো হদিস পেলেন না। ভগ্নমনোরথে ফিরে এলেন। কদিন পর এক সন্ধ্যায় তাঁর ব্যাঙ্কের এজেন্টের কাছ থেকে তার এল, যে-জাহাজে অরবিন্দের ফেরবার কথা সে-জাহাজে যাত্রীর তালিকায় অরবিন্দের নাম নেই।

'সেই রাত্রে আমার বাড়িতে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ডাক্তার ঘোষের নিমন্ত্রণ ছিল। ডিনার তৈরি, পুলিশ সাহেব এসেছেন কিন্তু ডাক্তার ঘোষের দেখা নেই। তাঁর বাংলো আমার বাড়ির খুব কাছে, আসতে দেরি হবার কথা নয়। আর্দালিকে খবর নিতে পাঠালাম, ডিনারের কথা ভুলে গেলেন নাকি? আর্দালি ফিরে এসে বললে, ডাক্তারসাহেবের খুব অসুখ। আমি তখুনি ছুটে গেলাম, শুনলাম টেলিগ্রামের কথা, দেখলাম ডাক্তার ঘোষ অজ্ঞান হয়ে আছেন। শহরের অন্যান্য ডাক্তাররা এসে গিয়েছে, যথাসাধ্য করছে সকলে। আমারও যেটুকু করণীয়, করলাম। কিন্তু সব নিষ্ফল হল। দুদিন অজ্ঞান থেকে ডাক্তার ঘোষ মারা গেলেন।'

ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে অরবিন্দের জাহাজ ভিড়ল বম্বের এ্যাপোলো বন্দরে। ভারতবর্ষের মাটি স্পর্শ করা মাত্রই অকস্মাৎ অরবিন্দ অনুভব করল, একটি বিরাট শান্তি তাকে পরিবৃত করে আছে।

অনুসন্ধানের অপেক্ষা না রেখেই এসে গেল অহেতুক অনুভূতি।

কী এই শান্তি? এই কি মহান স্থিরতা ও নীরবতার মধ্যে প্রবেশ করবার আহ্বান? এই কি ধ্যানের ভূমিকা? সমাধির পূর্বাভাস? এই কি রূপান্তরের পটান্তর?

এমনি অভিজ্ঞতা এই প্রথম। শুধু ভারতবর্ষের গুণে, ভারতবর্ষের টানে, ভারতবর্ষের স্পর্শে।

শ্রীঅরবিন্দ পরে ব্যাখ্যা করছেন : 'ভারতে পদার্পণ করার পর থেকেই আমার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হচ্ছিল। এই আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা পার্থিবতার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়—যেন বিরাট অনন্ত সমস্ত জড়জগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, সমস্ত দেহে ও বস্তুতে, সর্বভূতে, এক মহান উপস্থিতি সমান সচেতন—তারই অনুভবে

অনুস্যূত হয়ে উঠলাম। মর্ত ও অতিমর্ত—অস্তিত্বের দুই প্রান্তের মধ্যে কোনো স্পষ্ট বিচ্ছেদ নেই। অতিমর্তলোকে প্রবেশ করছি অথচ মর্তের উপরে, মর্তের মধ্যেকার সমস্ত কিছুর উপরে, তার প্রভাব থেকে যাচ্ছে।'

অক্ষুণ্ণ সংযোগ। অচ্ছিন্ন প্রভাব।

তাই প্রস্থান বা পলায়ন নয়, নবীভূত ভূমিকায় মঞ্চাবতরণ। মর্তধামে ভাগবত চেতনায় নবজন্মলাভ।

এ এক নতুন অমরাবতী—মর্তের অমরাবতী। মাটির ভাণ্ডেই অমৃতের ভাণ্ডার।

॥ পাঁচ ॥

বম্বে পৌঁছে অরবিন্দ বাঙলা-মুখো না হয়ে সোজা চলে গেল বরোদায়, কর্মস্থলে। বাঙলায় কোথায় যাবে, কার কাছে? খবর পেয়েছে, বাবা নেই আর মা তো দীর্ঘদিন অসুস্থ।

কর্তব্যের ডাকই প্রবলতর। আটুই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩, বরোদা স্টেট সার্ভিসে যোগ দিল অরবিন্দ।

কাজটা কী? জমি-জরিপ দপ্তরের দেখাশোনা। বিভাগীয় কাজকর্মে ওয়াকিবহাল হওয়া। সেখান থেকে কিছুদিন পর স্ট্যাম্প ও রাজস্ব বিভাগে স্থানান্তর। সেখান থেকে সেক্রেটারিয়েটে, মহাকরণে। দেখা যাক কর্মচারীটির আন্তরিকতা আছে কিনা।

মাইনে দুশো টাকা।

গাইকোয়াডের সঙ্গে প্রথম সংযোগের কথা বলতে গিয়ে অরবিন্দ বলছেন, মাঝে মাঝে জীবনের সমস্যাগুলির কি করে যে আপনা-আপনি সমাধান হয়ে যায় ভাবতে অবাক লাগে। লণ্ডনে এক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া হল কত টাকা মাইনে চাওয়া সঙ্গত হবে। সে বলেছিল দুশো, তাতে যদি গাইকোয়াড রাজী না হয়, তবে অন্ততঃ একশো তিরিশ টাকা। অঙ্কটা সে পাউণ্ডে হিসেব করেছিল। অরবিন্দদের মাসিক খরচ তখন পাঁচ পাউণ্ড, তাই দশ পাউণ্ড বেশ সচ্ছল অঙ্ক—আর এক পাউণ্ডের দাম তেরো টাকা।

গাইকোয়াড তো ভীষণ খুশি, দুশো টাকায় তিনি একটা মস্ত দাঁও মেরেছেন।

কিন্তু কেমব্রিজের দর্জি অরবিন্দের নামে মহারাজার কাছে নালিশ করে পাঠাল, অরবিন্দ স্যুটের দাম বাকি রেখেছে। দর্জিটা জবরদস্ত ছিল, ডবল দাম আদায় করেও রেহাই দিচ্ছে না। কত বাকি? ও বলছে, চার পাউণ্ড পাঁচ শিলিং। কিন্তু, অরবিন্দ বললে, এটা না দিলে কোনো অন্যায় হবে না।

মহারাজা বললেন, 'পাওনা টাকা মিটিয়ে দেওয়াই ভালো।'

অরবিন্দ দর্জির টাকা পাঠিয়ে দিল।

এখন তোমার নিজের কাজে পারদর্শিতা দেখাও।

জমি-জরিপ কি মানব-জমির পরিমাপ? স্ট্যাম্প কি ভগবদ্ভক্তি? রাজস্ব কি ভগবানে আত্মসমর্পণ? 'যা সীজারের প্রাপ্য তা সীজারকে দাও আর যা ঈশ্বরের প্রাপ্য তা দাও ঈশ্বরকে।' মহাকরণ কি ঊর্ধ্বচেতনার স্তর? আর আন্তরিকতা কী? সত্তার সমস্ত প্রবৃত্তি ভগবানের দিকে ফেরানোর অর্থই কি আন্তরিকতা নয়?

অরবিন্দ থাকে দণ্ডিয়াবাজারের কাছে সরকারি কোয়ার্টার্সে। লেফটেনেণ্ট মাধবরাও যাদব অরবিন্দের বন্ধু, সেই সূত্রে মাধবরাওয়ের দাদা ম্যাজিস্ট্রেট খাসেরাও যাদব অরবিন্দকে অনুজের মত স্নেহ করেন। তাই খাসেরাও যতদিন বরোদায় থাকেন অরবিন্দকে তাঁর বাড়িতে এনে রাখেন, যখন না থাকেন তখন মাধবরাওয়ের অনুরোধে তার আস্তানায় গিয়ে ওঠে।

মহারাজা অরবিন্দের উপর খুশি কিন্তু অরবিন্দ তার কাজে বিশেষ তৃপ্তি পাচ্ছে না। হঠাৎ কী হল, তাকে বরোদা কলেজ থেকে ডাকল ফ্রেঞ্চ পড়াতে। অরবিন্দ আনন্দে সাড়া দিল। অতিরিক্ত মাইনে কিছু না পাক, আসে-যায় না —কিছু আনন্দ তো বিকিরণ করা যাবে।

আস্বাদন আর বিতরণ—এই তো কবির লক্ষণ। যোগীর লক্ষণ। ভক্তের লক্ষণ।

মহারাজা জানেন ইংরেজিতে অরবিন্দের বিস্তীর্ণ দখল, তাই মাঝে-মাঝে তিনি তাকে প্রাতরাশে ডেকে পাঠান আর সেই সুযোগে তাকে দিয়ে জরুরি চিঠির খসড়া করিয়ে নেন। শুধু চিঠি নয়, কখনো-কখনো বা রাজ্য-সংক্রান্ত হুকুমনামা, দলিল-দস্তাবেজ, নোটিশ-ইস্তাহার। গভর্ণমেণ্টের পত্রোত্তর।

লর্ড কার্জন বরোদায় আসবে, মহারাজা তখন প্যারিসে, গভর্ণমেণ্ট নিদেশ পাঠালো কার্জনকে অভিনন্দন করতে মহারাজা স্বয়ং যেন বরোদায় উপস্থিত থাকেন। মহারাজা সে-অনুরোধে কর্ণপাতও করলেন না। কেন যথাসময়ে

মহারাজা হাজির হননি, কেন কার্জনকে এ ভাবে অপমানিত করা হল, মহারাজার কাছে গভর্ণমেণ্ট কৈফিয়ত দাবি করল। মহারাজার হয়ে সে পত্রের উত্তর অরবিন্দ লিখে দিল। গভর্ণমেণ্ট যদি আবার গর্জন করে, মহারাজার হয়ে অরবিন্দ তখুনি আবার তার প্রতিধ্বনি পাঠায়।

কখনো-কখনো অরবিন্দকে মহারাজার জন্যে বক্তৃতা লিখে দিতে হয়। একবার কী একটা সামাজিক অনুষ্ঠানে মহারাজাকে বক্তৃতা দিতে হবে, অরবিন্দ ভাষণ তৈরি করে এনেছে। মহারাজা বললেন, 'পড়ুন'।

অরবিন্দ পড়লে।

মহারাজা বিব্রত মুখে বললে, 'অরবিন্দবাবু, ভাষাটা একটু নরম করা যায় না? এ একেবারেই আমার বলে মনে হচ্ছে না।'

অরবিন্দ হাসল। বললে, 'নরম করলেও কি আপনার বলে মনে হবে? নরম হোক গরম হোক লোকে ঠিকই বুঝবে মহারাজা আর-কাউকে দিয়ে লিখিয়ে এনেছেন। তাতে কিছু যায় আসে না। শুধু দেখুন, ভাবটা আপনার কিনা। ভাবটা আপনার হলেই হল।'

এত সব বাড়তি কাজ করিয়ে নিচ্ছেন মহারাজা, এমনকি তাঁর ছেলেমেয়েদের পড়া দেখিয়ে নিচ্ছেন, অথচ তাঁর কাছ থেকে কোনো অনুগ্রহের নাম-লেশও আদায় করছে না অরবিন্দ।

কুচবিহারের মহারাণী গাইকোয়াড়ের মেয়ে। তিনি বলছেন, আমি তখন কত ছোট যখন অরবিন্দ আমাদের পড়াতে আসতেন। কিন্তু তিনি তাঁর নিজের পড়ায়, নিজের ভাবে এত নিবিষ্ট যে আমাদের দিকে তত মনোযোগ দিতে পারতেন না।

বরোদায় এসে অরবিন্দের আসল কাজ হল বই পড়া। বই আর বই,পড়া আর পড়া। আরো বই, আরো পড়া। বম্বে থেকে বই আসে ডাক-প্যাকেটে নয়, রেলওয়ে পার্শেলে। গাদা-গাদা বই, মোটা-মোটা পার্শেল। ইংরেজি আর ফরাসি, জার্মান আর রাশিয়ান, ল্যাটিন আর গ্রীক—অন্তহীন বই আর ক্লান্তিহীন পড়া। সাহিত্য—বিশেষ করে কবিতার প্রতিই অরবিন্দের বেশি টান—চসার থেকে সুইনবার্ণ—তারপরে ইতিহাস আর রাজনীতি। তারপর নিজের চেষ্টায় শিখল সংস্কৃত। আর সংস্কৃতের মাধ্যমে পড়ল রামায়ণ মহাভারত বেদ উপনিষদ কালিদাস ভবভূতি। শিখল মারাঠি, শিখল গুজরাতি। শুধু বাঙলাটাই বুঝি আশানুরূপ রপ্ত হয়নি এখনো। রপ্ত হয়নি মানে বুঝতে কোনো অসুবিধে নেই—হ্যাঁ, বঙ্কিম

ও মধুসূদনও অনায়াসে বুঝতে পারে, কিন্তু নিখুঁত করে বলতে পারে না, অন্ততঃ বক্তৃতা দেবার মত করে বলতে পারে না।

কেমব্রিজে থাকতে অরবিন্দ নিজের চেষ্টাতেই বাঙলা শিখতে মনোযোগী হয়েছিল। কলেজে বাঙলার অধ্যাপক ভারত-ফেরত অবসরপ্রাপ্ত আই-সি-এস রবার্ট মেসন টাওয়ার্স। তাঁর বিদ্যা বোধোদয় পর্যন্ত, বাঙালি সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁর পরিচিত শুধু এক বিদ্যাসাগর। একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের বই থেকে খানিকটা অংশ তাঁকে পড়ে শোনাল অরবিন্দ, ব্যাখ্যাটা কী জানতে চাইল। জায়গাটা গভীর মনোযোগে পড়লেন টাওয়ার্স, শেষে বইটা অরবিন্দের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে গম্ভীর মুখে বললেন, 'এ বাঙলা নয়।'

পুজোর ছুটিতে দেওঘরে এসেছে অরবিন্দ—সঙ্গে দু-তিনটে প্রকাণ্ড ট্রাঙ্ক। তার মাসতুতো বোন, স্কুলের ছাত্রী বাসন্তী লিখছে : 'ভারী-ভারী ট্রাঙ্ক দেখে আমাদের কী ঔৎসুক্য, কত না জানি দামি পোশাক বোঝাই করে এনেছে অরো-দাদা, কত না জানি শখের জিনিস, কত না জানি প্রসাধন। কিন্তু খোলা হলে দেখলাম, ও হরি, এ যে কেবল বই আর বই, বইয়ের পাহাড়। পাহাড়ের নিচে কটি শুধু সাধারণ জামা-কাপড়। তার মানে পুজোর ছুটিটায় অরো-দাদা বই পড়েই কাটাবেন।'

'না, বই পড়তে ভালোবাসলে কী হবে, হাসতে ও হাসাতে বা আমাদের সঙ্গে মজা করতে অরো-দাদা কম যান না।' আরো লিখছে বাসন্তী : 'বড় মামাকে নিয়েই আমাদের বেশি আনন্দ। বড মামাকে অরো-দাদা বলেন, ইশবগুলের পয়গম্বর। কেননা পেটের যে কোনো গোলমাল হলেই বড মামার ওষুধ হচ্ছে ইশবগুল।'

কিন্তু শুধু পড়া-ই, লেখা নয়?

কবিতা তো লিখছেই, এবার অন্য লেখার ডাক পড়ল। ডাক দিল অরবিন্দের কেমব্রিজের বন্ধু কেশবরাও দেশপাণ্ডে। দেশপাণ্ডে বম্বেতে ব্যারিস্টারি করে আর 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকার ইংরেজি বিভাগের সম্পাদনা চালায়। অরবিন্দের রাজনীতি কী, 'ভারতীয় মজলিশ'-এর সভ্য হয়েই তার জানা আছে আর আইরিশ বিদ্রোহী পার্নেলের উপর লেখা কবিতাই তো অরবিন্দের জ্বলন্ত দেশপ্রেমের উচ্চারণ।

দেশপাণ্ডে বললে, 'ইন্দুপ্রকাশে লেখ। কংগ্রেসের ভিক্ষাবৃত্তি আর সহ্য হয় না।'

অরবিন্দ রাজি হল।

লেখার শিরোনাম ঠিক হল: 'পুরোনোর স্থলে নতুন প্রদীপ'। কংগ্রেস তো সেই একই আছে, শুধু তার মধ্যে এখন নতুন দীপ্তির সঞ্চার হচ্ছে, তাই বলা যায়, পুরানো পিলসুজে নতুন প্রদীপ।

অরবিন্দের নাম উল্লেখ না করে তাকে এইভাবে 'ইন্দুপ্রকাশে' পরিচিত করলে দেশপাণ্ডে: 'এবার থেকে কিছু নতুন কথা, নতুন চিন্তা পরিবেশিত হবে আপনাদের কাছে—বর্তমান রাজনীতিবিদদের চলতি বুলির থেকে আলাদা। আমরা বুঝি নিয়েছি আমাদের রাজনৈতিক প্রচেষ্টা দুর্বল, তাই আমাদের উন্নতিও অকিঞ্চিৎ। ভণ্ডামিই আমাদের আন্দোলনের দুর্নিবার্য পাপ। আমাদের দৃষ্টি অসরল। স্পষ্ট কথা সোজাসুজি বলবারই দিন এখন। ঘুর-পথে ভুল পথে ছুটে আমাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় হয়ে যাবে এ আর নীরবে সহ্য করা যায় না। কোন পথে চলতে হবে তারই উপর জাতির বাঁচন-মরণ নির্ভর করছে। তাই আমরা এমন এক অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ভদ্রলোককে এনেছি যিনি বিরাট সাহিত্যিক প্রতিভার অধিকারী, যিনি সংস্কৃতিতে উদারপন্থী ও যাঁর লিখননৈপুণ্য অনন্যসাধারণ তিনি নিজের অসুবিধে ঘটিয়েও, সম্ভাব্য কদালোচনা অগ্রাহ্য করে, দ্বিধাহীন করে তাঁর নিজস্ব অনুকরণীয় ভঙ্গিতে তাঁর মতামত ব্যক্ত করবেন। আশা করি আপনারা তীক্ষ্ণ মনোযোগে তাঁর লেখা পড়বেন, সন্দেহ নেই সে লেখা আপনাদেরকে নতুন চিন্তায় জাগ্রত করবে ও আপনাদের দেশপ্রেমকে উদ্দীপ্ত করে তুলবে।'

অরবিন্দের প্রথম দুটো প্রবন্ধেই প্রবল ঝড় উঠল। তিনি লিখলেন 'আমি কংগ্রেস সম্পর্কে এই কথা বলতে চাই যে তার উদ্দেশ্য ভুল, উদ্দেশ্যসাধনে পথ ও পদ্ধতি ভুল—তার আন্তরিকতা নেই, নেই সর্বসমর্পণের সঙ্কল্প। তা নেতৃত্ব করার ভার যাদের উপর ন্যস্ত, তারা নেতৃত্ব পদের অযোগ্য। নীয়মা আমরা যেমন অন্ধ, আমাদের নেতারাও তেমনি অন্ধ, অন্তত একচক্ষু।'

আবার লিখলেন: 'আমাদের আসল শত্রু বাইরের কোনো শক্তি নয় আমাদেরই নিজেদের দুর্বিষহ দুর্বলতা, ভীরুতা, স্বার্থপরতা—আমাদের কাপট্য আমাদের অন্ধ ভাবাবেগ। ব্রিটিশ প্রভুত্বের চাকচিক্যে আমাদের চোখ যদি না ধাঁধিয়ে যেত, আমরা সহজেই বুঝতে পারতাম যে আমাদের ক্রোধের যোগ্য পাত্র হবার মতও মর্যাদা ঐ মানুষগুলোর নেই। আমরা যদি আত্মসম্মান জ্ঞানসম্পন্ন জাতি হই তবে ওদের কাছ থেকে ন্যায়বিচারের প্রত্যাশা না রেখে

আমাদের নিজেদের মনুষ্যত্বকেই উদ্বোধিত করা উচিত, যে-মনুষ্যত্বে আমরা সমস্ত মূক ও যন্ত্রণাবিদ্ধ ভারতবাসীর সঙ্গে সমত্বানুভব করতে পারব।

সাধারণ মানুষের সার্বিক জাগরণ ছাড়া স্বাধীনতা অসম্ভব। আরামতুষ্ট মধ্যবিত্ত নেতারা কী করে জনগণের যন্ত্রণাকে ভাষা দেবে? ব্রিটিশ শাসনের আশীর্বাদের কথা আর বোলো না মুখ ফুটে, বোলো না অমোঘ নিয়তি আমাদেরকে পরম দয়ালু প্রভুর স্নেহক্রোড়ে আশ্রয় দিয়েছে। নিষ্ক্রিয়তাকে, কাপুরুষতাকে সৌশীল্য বা সৌজন্যের পরিচয় বলে মূল্য দিও না। সত্য সোজাসুজি বলতে কেন পেছপা হচ্ছ? রূঢ়, উদ্ধত ও ক্ষুদ্রাত্মা কতগুলি ইংরেজ কর্মচারী যেন এক বিরাট দাসজাতিবেষ্টিত প্রভুর শিবিরে অব্যাহত শান্তিতে বাস করছে। বলছি না বিদেশীকে ঘৃণা করো, সে সঙ্গে এও বলছি না তার সামনে নতজানু হও; শুধু এই বলছি নিজের অন্তর থেকে শক্তি সংগ্রহ করে নিজেরই অন্তরে মুক্তি-অন্বেষণের ইঙ্গিত নাও। দেশের সমস্ত শক্তি তার জনগণের হাতে, জনগণের জন্যে—এমনিতরো একটা সংগঠনই বিদেশী শাসকদের নিবৃত্ত করে আনতে পারে স্বাধীনতা।'

পরে আবার লিখলেন বাংলায়, তাঁর 'ধর্ম' পত্রিকায়:

'বিদেশীর শাসন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি বাহ্যিক স্বাধীনতা, প্রজাতন্ত্র আন্তরিক স্বাধীনতার চরম বিকাশ। যতদিন পরের শাসন বা রাজত্ব থাকে ততদিন কোনো জাতিকে স্বরাজপ্রাপ্ত স্বাধীন জাতি বলে না। যতদিন প্রজাতন্ত্র সংস্থাপন না হয়, ততদিন জাতির অন্তর্গত প্রজাকে স্বাধীন মনুষ্য বলে না। আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাই, বিদেশীর আদেশ ও বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি, স্বগৃহে প্রজার সম্পূর্ণ আধিপত্য, ইহাই আমাদের রাজনীতির লক্ষ্য।'

মহারাষ্ট্রের নেতা রানাডে 'ইন্দুপ্রকাশে'র মালিককে ভয় দেখালেন, যেন এমনিধারা লেখা না বেরোয়, বেরোলে রাজদ্রোহের দায়ে তার নির্ঘাত জেল হয়ে যাবে।

সেই কথা দেশপাণ্ডে জানাল অরবিন্দকে। বললে, 'একটু মোলায়েম করে লেখ।'

অরবিন্দ তখন রাজনীতির দর্শন নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। এ যেন সত্য কথা ছেড়ে দিয়ে তত্ত্ব নিয়ে নাড়াচাড়া করা। এ যেন রক্ত ও আগুনের কথা ছেড়ে দিয়ে দূর আকাশের মেঘের খোঁজ নেওয়া। প্রভঞ্জনের বদলে হাতপাখায় হাওয়া খাওয়া।

তার চেয়ে চুপ করে থাকা ভালো। অন্তত: এখন তো কিছুকাল স্তব্ধ থাকি।

তার পরে কী?

লিখলেন অরবিন্দ: 'স্বদেশপ্রেমের ভিত্তি মাতৃপুজা। যেদিন বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম' গান বাহেন্দ্রিয় অতিক্রম করিয়া প্রাণে আঘাত করিল, সেই দিন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে স্বদেশপ্রেম জাগিল, মাতৃমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। স্বদেশ মাতা, স্বদেশ ভগবান, এই বেদান্তশিক্ষার অন্তর্গত মহতী শিক্ষা জাতির অভ্যুত্থানের বীজস্বরূপ। যেমন জীব ভগবানের অংশ, তাহার শক্তি ভগবানের শক্তির অংশ, তেমনই এই সপ্তকোটি বঙ্গবাসী, এই ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর সমষ্টি সর্বব্যাপী বাসু- দেবের অংশ, এই ত্রিশকোটির আশ্রয়, শক্তিস্বরূপিণী, বহুভুজান্বিতা, বহুবলধারিণী ভারত-জননী ভগবানের একটি শক্তি, মাতা, দেবী, জগজ্জননী কালীর দেহবিশেষ এই মাতৃপ্রেম মাতৃমূর্তি জাতির মনে-প্রাণে জাগরিত ও প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এই কয় বর্ষের উত্তেজনা, উদ্যম, কোলাহল, অপমান, লাঞ্ছনা, নির্যাতন ভগবানের বিধানে বিহিত ছিল। সেই কার্য সম্পন্ন হইয়াছে। তাহার পরে কি?'

অফিসের কাজেও অরবিন্দের অরুচি ধরেছে। একবার মহারাজা বললেন, ইউরোপে যাবতীয় ট্রেন-চলাচলের টাইম-টেবল মিলিয়ে একটা তুলনামূলক রিপোর্ট খাড়া করুন।

আরেকবার বললেন, আমাকে গ্রামার শেখান। প্রত্যেকটি বাক্যরচনার কৌশল ও প্রাসঙ্গিক নিয়মকানুনগুলো বিশদ করুন।

এবার তবে একবার দেওঘরে যাওয়া যাক। দেখে আসি সকলকে।

দেশে ফেরার প্রায় এক বছর পর অরবিন্দ চলল মামার বাড়ি। সেখানে মা আছেন, ছোট ভাই-বোনেরা আছে, দাদামশায় আছেন।

'আমি অরো।' মাকে প্রণাম করে দাঁড়াল অরবিন্দ।

'অরো?' স্বর্ণময়ী মানতে রাজী নন: 'না, এ আমার অরো নয়। সে কত ছোট্টটি ছিল, এ যে দেখছি মস্ত বড়।'

স্বর্ণময়ীকে বোঝানো হল অরো লেখাপড়া শিখতে বিলেত গিয়েছিল, এখন লেখাপড়া সাঙ্গ করে দেশে ফিরেছে—বয়সে বড় হবে না?'

স্বর্ণময়ী চঞ্চল হলেন: 'কই দেখি, আমার অরোর আঙুলে একটা কাটা দাগ ছিল, কই দেখি—'

অরবিন্দ আঙুলে সেই দাগ দেখাল।

তখন স্বর্ণময়ী চিনলেন।

সরোজিনী লিখছে: চুল বিলিতি কায়দায় লম্বা করে ছাঁটা, মুখখানি করুণ, সেজদাকে কেমন লাজুক-লাজুক দেখতে।

বরোদা কলেজে অরবিন্দ যখন পড়াতে এলেন তখন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এ. বি. ক্লার্ক। অরবিন্দ কলেজ ছেড়ে যাবার পর তাঁর জায়গায় এলেন সি. আর. রেড্ডি। ক্লার্ক রেড্ডিকে বললে, 'তুমি তাহলে অরবিন্দ ঘোষকে দেখেছ? লক্ষ্য করেছ তার চোখ দুটো? সেখানে যেন আধ্যাত্মিক রহস্যের আগুন জ্বলছে। তার শিখা যেন ওপারের ঊর্ধ্ব জগৎকে বিদ্ধ করছে। জোয়ান অব আর্ক যেমন দিব্যস্বর শুনত অরবিন্দও বুঝি তেমনি দিব্যদর্শন করছেন।'

'ক্লার্ক ছিলেন ঘোর জড়বাদী।' বলছেন রেড্ডি, 'আমি ভেবেই পাই না কী করে ঐ সংসারপরায়ণ অথচ আনন্দময় ক্লার্ক অরবিন্দ সম্পর্কে সত্যের আভাস পেয়েছিলেন যদিও তখনো তা বাইরে পরিস্ফুট হয়নি। তবে ঘনকৃষ্ণ মেঘের বুক থেকে ক্ষণকালীন বিদ্যুতের রেখা কি সহসা ঝলসে ওঠে না?'

দেওঘর থেকে ফিরছে অরবিন্দ, বম্বেতে রাণাডের সঙ্গে দেখা।

সেই বুদ্ধিমান প্রতিশ্রুতিমান অগ্নিবর্ষী লেখকটির সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ খুঁজছিলেন রানাডে। এবার সামনাসামনি পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন: 'কংগ্রেসকে আক্রমণ করে বৃথা কেন শক্তির অপচয় করছ? কোনো গঠনমূলক বিষয় নিয়ে লিখতে পারো না?'

'যথা?'

'ধরো জেল-সংস্কার।'

জেলে গিয়ে রাণাডের কথা মনে পড়ল অরবিন্দের। লিখলেন: 'স্বয়ং জেলে এসে জেল সংস্কার করছি।'

জেলে একটি থালা ও একটি বাটি দেওয়া হল অরবিন্দকে। ঘষে-মেজে এমনি চকচকে করে দেওয়া হত যে মনে হত এই বুঝি নির্দোষ-উজ্জ্বল ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের নির্ভুল উপমা। লিখছেন অরবিন্দ:

'তখন রাজভক্তির নির্মল আনন্দ অনুভব করিতাম। দোষের মধ্যে থালাও তাহা বুঝিয়া আনন্দে এত উৎফুল্ল হইত যে, একটু জোরে আঙুল দিলেই তাহা আরবী-স্থানের ঘূর্ণ্যমান দরবেশের ন্যায় মণ্ডলাকারে নৃত্য করিতে থাকিত, তখন এক হাতে আহার করা, এক হাতে থালা ধরিয়া থাকা ভিন্ন উপায় ছিল না। নচেৎ ঘূরপাক খাইতে-খাইতে জেলে অতুলনীয় মুষ্টান্ন লইয়া তাহা পলাইয়া যাইবার

উপক্রম করিত। থালা হইতে বাটিটিই আরও প্রিয় ও উপকারী জিনিস ছিল। ইহা জড়পদার্থের মধ্যে যেন ব্রিটিশ সিভিলিয়ান। সিভিলিয়ানের যেমন সর্বকার্যে স্বভাবজাত নৈপুণ্য ও যোগ্যতা আছে, জজ, শাসনকর্তা, পুলিস, শুল্ক-বিভাগের কর্তা, মিউনিসিপ্যালিটির অধ্যক্ষ, শিক্ষক, ধর্মোপদেষ্টা, যাহা বল, তাহাই বলিবা মাত্র হইতে পারে,—যেমন তাঁহার পক্ষে তদন্তকারী, অভিযোগ-কর্তা, পুলিস-বিচারক,এমন কি সময়-সময় বাদীর পক্ষের কৌনসিলীরও এক শরীরে একই সময়ে প্রীতি-সম্মিলন হওয়া সুখসাধ্য, আমার আদরের বাটিরও তদ্রূপ। বাটির জাত নাই, বিচার নাই, কারাগৃহে যাইয়া সেই বাটিতে জল নিয়া শৌচক্রিয়া করিলাম, সেই বাটিতেই মুখ ধুইলাম, স্নান করিলাম, অল্পক্ষণ পরে আহার করিতে হইল' সেই বাটিতেই ডাল বা তরকারি দেওয়া হইল, সেই বাটিতে জলপান করিলাম এবং আচমন করিলাম। এমন সর্বকার্যক্ষম মূল্যবান বস্তু ইংরাজের জেলেই পাওয়া সম্ভব। বাটি আমার এই সকল সাংসারিক উপকার করিয়া যোগসাধনের উপায়-স্বরূপও হইয়া দাঁড়াইল। ঘৃণা পরিত্যাগের এমন সহায় ও উপদেষ্টা কোথায় পাইব ?'

দেওঘর থেকে ফিরে এসে বরোদায় অরবিন্দের মন বসছে না। দেওঘর যেন দেব-ঘর আর বরোদা আর বরদা নয়। দেওঘর থেকে ফিরে এসে বরোদাকে এখন শতগুণ বরোদা মনে হচ্ছে।

ছোট বোন সরোজিনীকে ইংরেজিতে চিঠি লিখছে অরবিন্দ :

'যদি পারতাম কালকেই আবার দেওঘর রওনা হতাম। কিন্তু আমার চাকরি, আমার আর্থিক সংস্থান তার প্রতিকূল। তোমাদের কাছে যাওয়াই আমার ভুল হয়েছিল কেননা এখন ফিরে এসে বরোদা আমার কাছে অসহ্য লাগছে। জুডাস ইস্কারিয়ট সম্বন্ধে একটা প্রাচীন গল্প প্রচলিত আছে, সেটা এখন আমার সম্বন্ধে খুব খাটে। বিশ্বাসঘাতকতা করে যীশুখৃস্টকে ধরিয়ে দিয়ে অনুতাপে জুডাস গলায় দড়ি দেয়। তাকে নরকে যেতে হয় এবং সেই প্রতিষ্ঠানের সব চেয়ে উত্তপ্ত উনুনে তাকে সম্বর্ধিত করা হয়। এখানে তাকে অনন্ত কাল দগ্ধ হতে হবে, কিন্তু সে একটা ভালো কাজ করেছিল বলে তার সম্পর্কে আদেশ হল,ঈশ্বরের বিশেষ করুণায় সে প্রত্যেক ক্রিসমাসে উত্তর মেরুর বরফে এক ঘণ্টার জন্যে নিজেকে ঠাণ্ডা করতে পারবে। আমার বিবেচনায় এটা করুণা নয়, সূক্ষ্ম নিষ্ঠুরতা। বরফে এক ঘণ্টা শীতল হবার পর আবার নরকে ফিরে গেলে সে নরক কি দশগুণ বেশি নরক বলে মনে হবে না ? আমি জানি না কী দারুণ পাপে আমি বরোদায় নিক্ষিপ্ত হয়েছি।

ামার ব্যাপারটা একেবারে অনুরূপ। দেওঘরে সুখভ্রমণের পর বরোদা আমার কাছে শতগুণ বরোদা বলে মনে হচ্ছে।

ইংলণ্ড ছাড়ার তিন চার দিন আগে হয়তো বেনো তোমাকে চিঠি দেবে। যদি তাই দেয়, নিজেকে ভাগ্যবতী মনে কোরো। মনে হয় তার প্রথম সংবাদ পাবে টেলিগ্রামে, কলকাতা থেকে। আমাকে যে সে কিছুই লেখেনি তা বলাই বাহুল্য। আমি আশাও করি না, বরং তার চিঠি পেতে আমার ভয় হয়। সেটা এমন কিছু একটা সাংঘাতিক হবে যে আমাকে মেঝের উপর পড়ে দু-তিন ঘণ্টা গড়াগড়ি খেয়ে নিশ্বাসের জন্যে ছট্ফট করতে হবে। ভগবানের আবার অনেক ভয়ঙ্কর অনুগ্রহ আছে যা কদাচ লোভ করতে নেই। এখন বেনো আর মনোর মধ্যে প্রায় রোজই হয়তো দেখা হবে, মনে হয় তোমার চিঠিটা মনোর হাতে পৌঁছে দিতে বেনোর সামর্থ্যে অকুলান হবে না। উত্তর দিতে মনোকেও বেশ খানিক সময় দিও—জানো তো সে বেনোরই ভাই।

বারি-র ইংরেজি কম্পোজিশন বইটার নাম কী? সঙ্কলক কে? আমার অমনিতরো এক বইয়ের দরকার, বাংলা ও গুজরাতিতে আমার কাজে লাগবে। তুমি লিখেছ, এখানে সবাই ভালো আছে, পরেই আবার লিখেছ, বারি-র জ্বর হয়েছে। বারি কি সবার মধ্যে পড়ে না? সে যে মনুষ্য-নামধেয়দের তালিকার মধ্যে পড়ে না সেটা ঠিকই, কিন্তু একেবারেই তার কোনো অস্তিত্ব নেই সেটা ঠিক নয়। আমি গত ১৫ই অগাস্ট ২২ নম্বর মাইলস্টোন পার হয়েছি এবং ভয়ঙ্কররূপে বৃদ্ধ হতে আরম্ভ করেছি।

তোমার চিঠি দেখে বুঝছি তুমি ইংরেজিতে বেশ উন্নতি করেছ। আশা করি আরো ভালো করে শিখবে যাতে আমি অসঙ্কোচে আমারই মতন করে লিখতে পারি তোমাকে। এখন সে ভাবে লিখতে অসুবিধে হচ্ছে, কে জানে তুমি ঠিক বুঝতে পারবে কিনা। ভালোবাসা নাও। ইতি তোমার স্নেহময় দাদা অরো।'

অরবিন্দের প্রথম বাঙলা চিঠি বাসন্তীকে, কিন্তু সে চিঠি বাসন্তী হারিয়ে ফেলেছে।

দেশপাণ্ডেই খবর দিল বরোদায় কে একজন যুবক সন্ন্যাসী এসেছে, হাতে-পায়ে লম্বা-লম্বা নোখ, গাছতলায় থাকে। চলো দেখে আসি।

অরবিন্দ দেখতে গেল।

দেশপাণ্ডে সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করল, 'কোন নীতি অনুসারে কাজ করব?

মানে, কোন নৈতিক বিধান বা মানদণ্ড অনুসারে ?'

সন্ন্যাসী বললে, 'সে রকম কোনো মানদণ্ড নেই। চোরের পক্ষে চুরি করাই ধর্ম, বলতে পারো সেইটেই তার পক্ষে ন্যায্য বিধান।'

শুনে দেশপাণ্ডে তো দারুণ খাপ্পা।

অরবিন্দ বললে, 'তুমি চটছ কেন ? ও একটা মত বই তো নয়।'

সক্রিয় যোগের কথা দেশপাণ্ডেই প্রথম বললে অরবিন্দকে। সে তখন নানা প্রকার আসন ও হঠযোগ করছে, তার শখ হল অরবিন্দকে দলে টানে। বলতে কি তখন ঈশ্বর সম্বন্ধেও অরবিন্দের কোনো কৌতূহল নেই, আর যোগের চলতি অর্থ তো সংসারত্যাগ। এ সব অরবিন্দের পোষাবে না, কেননা দেশকে তার স্বাধীন করতে হবে। পরে মনে হল যে শক্তি মানুষকে সন্ন্যাসী বানিয়ে সংসার ছাড়ায় সে শক্তি কি মানুষকে সংসারে রেখেই তাকে দিয়ে অসাধ্য সাধন করাতে পারে না ? সে শক্তি যদি যোগশক্তি হয় তা হলে তাকে পরাধীন দেশকে স্বাধীন করার কাজে লাগানো যাবে না কেন ?

'আপনার দেশকে মুক্ত করার ইচ্ছাটাই ভগবান তাহলে কাজে লাগালেন ?' ভক্ত-শিষ্য প্রশ্ন করলেন শ্রীঅরবিন্দকে।

শ্রীঅরবিন্দ বললেন, 'সে সময় কে যেন পিছন থেকে অনবরত বলে-বলে মনকে বোঝাল, দেশই প্রথম, মানুষ দ্বিতীয়, আর সব কোথাও কিছু নেই। বলতে পারো,' হাসলেন শ্রীঅরবিন্দ : 'অধ্যাত্মজীবনে আমার প্রবেশ সদর দরজা দিয়ে নয়, খিড়কির দরজা দিয়ে।'

॥ ছয় ॥

দেশপাণ্ডের সঙ্গেই অরবিন্দ গেল ব্রহ্মানন্দের আশ্রমে, নর্মদার তীরে, চান্দোদে। গঙ্গামঠে।

অদ্ভুত যোগী। যে কেউ ওকে প্রণাম করুক, চোখ বুজে থাকেন। অরবিন্দ যখন প্রণাম করল, ব্রহ্মানন্দ চোখ মেলে তাকালেন। বুঝি অনুভব করলেন এমন একজন এসেছেন যাঁকে তাঁরই দেখা উচিত। কিংবা যিনি এসেছেন তিনি চেনা মানুষ, আপনার জন।

যোগীবরের কী সুন্দর চোখ। অরবিন্দ বলছেন, একটা শক্তি যেন আমাকে ক্ষণকালের জন্যে অভিভূত করলে।

নর্মদার তীরে অনেক কালীমন্দির। বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে অরবিন্দ ঢুকল এক মন্দিরে। কোনোদিন মূর্তিপূজায় বিশ্বাস নেই, দেব-দেবী অলস কল্পনা মাত্র, তবু কৌতূহলবশে দেখতে গেল। কালীমূর্তির দিকে তাকাতেই মনে হল বিশ্ব-জননী জীবন্ত চোখে তাকিয়ে আছেন। এ যেন প্রতিমা নয়, এ চৈতন্যময়ী উপস্থিত।

'পবিত্র নদীতীরে কালীমন্দিরের সামনে তুমি দাঁড়ালে,' লিখছেন অরবিন্দ: 'কিন্তু দেখলে কী? মনোহর স্থাপত্যকীর্তি না ভাস্কর্যকলা? মুহূর্তের মধ্যে অঘটন ঘটে গেল। কোথায় মূর্তি? তার বদলে তুমি দেখলে একটি পরিপূর্ণ মুখ, নিষ্পলক নয়নে তোমার দিকে চেয়ে আছে। চকিতে তোমার অন্তর্দৃষ্টি খুলে গেল, দেখলে একটি আবির্ভাব, একটি চৈতন্যময়তা। চিনলে বিশ্বজননীকে।

ইংরেজিতে কবিতা লিখলেন অরবিন্দ:

দেবী প্রস্তর-জীবিতা

দেবতানগরে কোন ক্ষুদ্র এক মন্দিরে বসতি
প্রতিমা-শরীর থেকে তাকাল সে পরম-ঈশ্বরী
মোর দিকে, মৃত্যুহীন উজ্জীবন্ত দিব্য উপস্থিতি
বসে আছে আদিহীন অনন্তেরে নিয়ে অঙ্কোপরি।

বিপুল বিশ্বের মাতা, ইচ্ছা তার সমান বিপুল
প্রসুপ্তি-নিমগ্না ছিল মৃত্তিকার অতল গহ্বরে,
শক্তিতে আসীন তবু ভাষাহীন রহস্যসঙ্কুল
নিস্তব্ধ সে মরুভূতে, নিস্তব্ধ সে আকাশে-সাগরে।

যদিও নির্বাক তবু মনোময়ী হয়েছে এখন
গহনগেহিনী তবু চঞ্চলিত চেতনা-আধার
গূঢ়গুপ্ত রহিবে সে আমাদের আত্মা যতক্ষণ
না জেগেছে, না দেখেছে, না বুঝেছে রহস্য অপার।

যে সৌন্দর্য-রহস্যেরে ঢেকে রাখে প্রস্তরে বা ত্বকে
তাই আজ একীভূত মন্দিরের মূর্তিতে-পূজকে॥

মহারাজা খবর পাঠালেন, আমার সঙ্গে কাশ্মীরে চলুন।

কাশ্মীর! অরবিন্দ একডাকে রাজী হল।

'এ যাত্রা আপনাকে আমার সেক্রেটারি করে নিচ্ছি।'

সে একবারই শুধু। সে যাত্রায় মহারাজার সঙ্গে বারে-বারেই অরবিন্দের মতদ্বৈধ ঘটতে লাগল। তাই সেক্রেটারি করার সাধ ঘুচল মহারাজার।

মহারাজার অধীনে কাজ করছে অথচ তাঁর খবরদারি মানবে না এ কেমনতরো? একদিন সকালবেলা দু-দুবার অরবিন্দকে ডেকেছেন মহারাজা, কিন্তু অরবিন্দ গরহাজির, মহারাজা নিজেই গেলেন অরবিন্দের ঘরে। দেখলেন অরবিন্দ ঘুমিয়ে আছে। আশ্চর্য, কিছু বললেন না মহারাজা, নিঃশব্দে ফিরে গেলেন।

আরেকবার হুকুমজারি করলেন, রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিনেও কর্মচারীদের আফিস করতে হবে। অরবিন্দ বললে, যত খুশি জরিমানা করুন, আমি যাচ্ছি না।

কিন্তু সেক্রেটারিত্ব যাক, কাশ্মীর থাকবে অক্ষয় হয়ে। থাকবে তকৃত-ই-সুলেমন বা সোলেমানের সিংহাসন নামক পাহাড়ের উপর শঙ্করাচার্যের মন্দির।

পাহাড়ের সিঁড়ি ভেঙে চূড়ায় এসে উঠল অরবিন্দ। দাঁড়াল এসে মন্দির-দুয়ারে।

লিখছেন অরবিন্দ: 'পাহাড়ের উপরে এসে দাড়ালে ধীরে ধীরে অন্তরে অনুভব করো একটি বিশাল বিস্তার একটি অখণ্ড পরিব্যাপিতা, বিশ্বপ্রকৃতিতে নামহীন এক বিরাটের উপস্থিতি—তারপর সহসা উপলব্ধি হয় একটি স্পর্শ, একটি জ্যোতির্বন্যা যাতে মানসিক আধ্যাত্মিকে হারিয়ে যায়, মুহূর্তে তুমি অনন্ত দ্বারা আক্রান্ত হও।'

অরবিন্দ আবার ইংরেজিতে সনেট লিখল:

অদ্বৈত

প্রপঞ্চমায়ার পরে রুক্ষ গিরি রয়েছে দাঁড়ায়ে
'সোলেমান সিংহাসন', যেথা দেখি একান্ত নিবিড়ে
সময় তাকিয়ে আছে অনন্তের দিকে। ধীর পায়ে
উঠে গেনু সে পাহাড়ে, ক্ষুদ্র সেই শঙ্কর-মন্দিরে।

দেখি মোর চতুর্দিকে বিরাজিছে নীঃন্ধ্র স্তব্ধতা,
সব মিলে একরূপ অপরূপ নামচিহ্নহারা,
বিশ্বময় এক সত্য এক শুভ্র অজাত নগ্নতা
শৃঙ্গহীন তলহীন নেই কোথা কূলের কিনারা।

যে স্তব্ধতা অস্তিত্বের একমাত্র যথার্থ উচ্চার
আদি যার অজানিত অন্ত যার অখণ্ড নীরব,
যাহা কিছু ক্ষণদৃষ্ট ক্ষণশ্রুত তার পরিহার
বিরাজে পর্বতচূড়ে অনির্বাচ্য শাশ্বতের স্তব।

প্রকৃতির রহস্যের এ নিলয় স্তব্ধ মনোরম
একটি নিঃসঙ্গ শান্তি দিল এনে ধ্রুব উপশম॥

বরোদা কলেজের ইংরেজির প্রফেসর লিটলডেল ছুটি নিলে অরবিন্দের ডাক পড়ল ইংরেজি পড়াতে। ফ্রেঞ্চের উপর আবার ইংরেজি। মাইনে? মাইনে সেই দু-শো। একক ইংরেজির পাকা প্রফেসার হতে পারো, তখন মাইনে বাড়বে।

কিন্তু যাই মাইনে হোক, অর্থের প্রতি অরবিন্দের এতটুকু মমতা নেই। দীনেন্দ্রকুমার রায় লিখছেন: একা মানুষ, বিলাসিতার সহিত তাঁর পরিচয় ছিল না, একটি পয়সার অপব্যয় ছিল না—তথাপি মাসের শেষে তাঁহার হাতে এক পয়সাও থাকিত না। অনেক সময় তাঁহাকে বন্ধুগণের নিকট ধার করিতে দেখিয়াছি। তিনি বেতন পাইলে সর্বাগ্রে তাঁহার মাতা ও ভগিনীকে খরচের টাকা পাঠাইতেন। তাঁহার ভগিনী তখন বাঁকীপুরে অঘোর-পরিবারে থাকিয়া লেখাপড়া করিতেন। কখন-কখন অসময়েও তাঁহাদের কাছে অরবিন্দকে মনি-অর্ডার করিতে দেখিয়াছি।'

দীনেন্দ্রকুমারের বাড়িতে টাকা পাঠানো দরকার। কিন্তু অরবিন্দের হাতে এ সময় যথেষ্ট টাকা আছে কিনা কে জানে, দীনেন্দ্রকুমার চাইতে গড়িমসি করছেন। হঠাৎ দেখলে অরবিন্দ নিজেই মাকে বা বোনকে টাকা পাঠাবে বলে মনি-অর্ডারের ফর্ম পূরণ করছে। সাহসে ভর করে দীনেন্দ্রকুমার বললেন, আমাকে আমার মাইনের টাকাটা যদি দেন তো আমিও আমার বাড়ি পাঠাই।

অরবিন্দ হেসে তার হাত-ব্যাগ ঝাড়ল। যে কটা টাকা ছিল সমস্তই দীনেন্দ্রকুমারকে দিয়ে দিল। বললে, 'আর তো নেই, এ কটা টাকাই সম্প্রতি পাঠিয়ে দিন।'

'সে কী?' দীনেন্দ্রকুমার অত্যন্ত কুণ্ঠিত হল—'আপনি মনি-অর্ডার লিখছেন, ও টাকা আপনিই পাঠান।'

'না না, আমার চেয়ে আপনার দরকার বেশি। আপনি নিন, আমি পরে পাঠাব।' মনি-অর্ডারের ফর্ম আদ্ধেক লেখা হয়ে পড়ে রইল। অরবিন্দ মহাভারত খুলে কবিতা লিখতে বসল।

দীনেন্দ্রকুমার লিখছেন: পরের অভাবকে নিজের অভাব অপেক্ষা গুরুতর মনে করেন—এরূপ মহাপ্রাণ সদাশয় ব্যক্তির কথা ইতিহাসে ও উপন্যাসে পাঠ করিয়াছি—কিন্তু এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে আর কোথাও এরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।'

কিছুকাল পরে একক ইংরেজি প্রফেসরের পদ খালি হল। ইংরেজ অধ্যক্ষ টেইট মহারাজাকে বললেন, ইংরেজিতে অরবিন্দ ঘোষের পারদর্শিতা প্রশ্নাতীত, অরবিন্দকেই ও-পদে নিযুক্ত করুন।' এ অরবিন্দের আবেদনের উপর অধ্যক্ষের সুপারিশ নয়, এ অধ্যক্ষেরই সক্রিয় অনুরোধ। গুণানুরাগী মহারাজ দ্বিধা করলেন না। অরবিন্দকেই বহাল করলেন।

মাইনে? মাইনে তিনশো ষাট টাকা।

এততেও টাকার কোন স্পৃহা নেই।

হাত-ব্যাগে করে তিন মাসের মাইনে একসঙ্গে এনেছে অরবিন্দ। একটা মজবুত বাক্স নেই যে চাবিবন্ধ করে রাখা যায়। হাত-ব্যাগেও রাখছে না। টেবিলের উপর একটা ট্রে রেখে তাতে ব্যাগ উজাড় করে সব টাকা ঢেলে দিয়েছে।

'এ ভাবে টাকা রেখেছেন?' ছাত্র পাটকার জিজ্ঞেস করলে।

'তাহলেই বোঝ সৎ ও সাধু লোকের সঙ্গেই আমরা বাস করছি।' হাসলেন অরবিন্দ।

'আপনি কি হিসেব রাখেন যে বলবেন আশেপাশের লোক সব সাধু?'

'ভগবান আমার হিসেব রাখছেন।' শান্তস্বরে বললেন অরবিন্দ, 'আমার যতটুকু দরকার ততটুকু আমাকে দেন আর বাকিটা তিনি নিজের জন্যে রাখেন। যখন তিনি আমাকে অভাবে রাখছেন না তখন আর অভিযোগ কী।'

এই অরবিন্দ! প্রথম দর্শনে দীনেন্দ্রকুমার তো থ বনে গেলেন। শ্যামবর্ণ

ক্ষীণদেহ, মাথায় বাবরিকাটা পাতলা চুল, মধ্যে চেরা সিঁথি, মুখে অল্প-অল্প বসন্তের দাগ, পরনে আমেদাবাদ মিলের বিশ্রী পাড়ওয়ালা মোটা থাদি, কাছার আধখানা খোলা, গায়ে আঁটো মেরজাই, পায়ে শুঁড়তোলা সেকেলে নাগরা জুতো—এই অরবিন্দ ঘোষ, আই-সি-এস, ইংরেজি ফরাসি ল্যাটিন হিব্রু গ্রীকের সজীব ফোয়ারা! লিখছেন দীনেন্দ্রকুমার: 'দেওঘরের পাহাড় দেখাইয়া যদি কেহ বলিত—ঐ হিমালয়, তাহা হইলেও বোধ হয় এতদূর বিস্মিত ও হতাশ হইতাম না।' কিন্তু চোখ দুটি দেখেছ? কেমন কোমলতায় মাথানো, স্বপ্ন দিয়ে ভরা।

ছাত্র পাটকার বলছে, কোনোদিন নিজের জামা-কাপড় কিনতে দেখা যায়নি অরবিন্দকে। বাড়িতে সাদাসিধে ধুতি আর মেরজাই আর বাইরে এমন কি দরবারে বেরুতে হলেও সাধারণ ড্রিল-স্যুট, মাথায় হ্যাটক্যাপ কিছু নয়, সামান্য দিশি পিরালি টুপি।

শোন লোহার বা নারকোল দড়ির খাটে, লেপ-তোশক নেই, শুধু মালাবারী ঘাসের মাদুর বিছানো, শীতের সময় শস্তা একটা কম্বল। গায়ে দেবার জন্যে পাঁচ-সাত টাকা দামের নীল একখানি আলোয়ান।

পাটকার জিজ্ঞেস করলে, 'এমন শক্ত বিছানায় শোন কী করে?'

সেই নির্ভুল হাসিটি হাসলেন অরবিন্দ। বললেন, 'আমি যে ব্রহ্মচারী। আমাদের শাস্ত্রে বলেছে ব্রহ্মচারী কখনো নরম বিছানায় শোবে না।'

দীনেন্দ্রকুমার লিখছেন: 'যত দিন তাঁহার সহিত একত্র বাস করিয়াছি, তাঁহাকে ব্রহ্মচর্যনিরত পরদুঃখকাতর আত্মত্যাগী সন্ন্যাসী ভিন্ন অন্য কিছু মনে হইত না। যেন জ্ঞানসঞ্চয়ই তাঁহার জীবনের ব্রত।'

আর কী পাঠানুরাগ। লেখায়-পড়ায় কাব্যালোচনায় অনেক রাত পর্যন্ত জাগে বলে অরবিন্দ ওঠে দেরি করে। উঠে ইসবগুল মিশিয়ে এক গ্লাস জল খায়। তারপর চা খেয়ে কবিতা লিখতে বসে। টেবিলের উপর একটি ছোট টাইম-পিস ঘড়ি, নয়তো মুখ-খোলা একটা ওয়াচ, লেখা চলে দশটা পর্যন্ত। দশটায় উঠে স্নান করতে যায়। স্নান সেরে এসে আবার কবিতার খাতা নিয়ে বসে, লিখিত লাইনগুলি আওড়ায়, দরকার হলে কাটাকুটি করে। এগারোটা বাজতে-না-বাজতেই খাবার আসে। খেতে-খেতে খবরের কাগজ পড়ে—যা ঠাকুর রান্না করে দেয়, কখনো কখনো তা রীতিমত অখাদ্য, তাই নির্বিকারে গলাধঃকরণ করে। খাবার সময়ও হাতের কাছে একটি চুরুট ধরানো থাকে। ভাতের প্রতি বিশেষ স্পৃহা নেই, রুটিই বেশি রুচিকর। একবেলা মাংস আরেক বেলা মাছ। আবার

কখনো সম্পূর্ণ নিরামিষ।

সন্ধ্যার পর প্রায় ঘণ্টা খানেক বারান্দায় দ্রুত পায়চারি করে। এই তার দৈনন্দিন ব্যায়াম। তার পর সন্ধ্যা অন্তে খাওয়া, আবার সেই গভীর রাত পর্যন্ত তন্ময় হয়ে পড়া। একাগ্র হয়ে পড়া।

মনের একাগ্রতাই সমস্ত জ্ঞানের উৎস।

এক সন্ধ্যায় পড়ছেন অরবিন্দ, চাকর টেবিলের উপর খাবার রেখে বললে, 'সাব খানা রাখা হ্যায়।'

'আচ্ছা।'

ঘণ্টাখানেক পরে চাকর এল ডিস নিয়ে যেতে, দেখল খাবার যেমন ছিল তেমনি আছে, অরবিন্দ পড়ছেন তো পড়ছেনই, হাত লাগাননি।

অরবিন্দকে তাড়া দেবার কথা সে ভাবতেও পারল না, পাটকারকে গিয়ে বললে। পাটকার গিয়ে সবিনয়ে অরবিন্দকে মনে করিয়ে দিল—খাবার অনেকক্ষণ দিয়ে গিয়েছে।

অরবিন্দ মৃদু হাসলেন। দ্রুত শেষ করলেন খাওয়া। আবার বসলেন বই নিয়ে।

গল্প করতে-করতে অরবিন্দ খুব হাসে—বলছেন দীনেন্দ্রকুমার।

এ হাসি হয়তো মামার বাড়ি থেকে পাওয়া। দেওঘরে যোগেন-মামাকে বললেন দীনেন্দ্রকুমার, 'আপনার বাবা খুব হাসতে পারেন। এমন প্রাণ খুলে হাসতে কাউকে দেখিনি।'

'এ কী হাসি দেখছেন!' বললে যোগেন-মামা, 'বাবা যখন তাঁর বন্ধু দ্বিজেন ঠাকুরের সঙ্গে গল্প করতে-করতে হাসেন তখন মনে হয় সমস্ত বাড়িটা বুঝি হাসির ঢেউয়ে ভেসে যাবে।'

লিখছেন দীনেন্দ্রকুমার: 'দিবারাত্রি একত্র বাস করিয়া ক্রমে যতই অরবিন্দের হৃদয়ের পরিচয় পাইতে লাগিলাম, ততই বুঝিতে পারিলাম অরবিন্দ এ পৃথিবীর মানুষ নহেন, অরবিন্দ শাপভ্রষ্ট দেবতা। ভগবান কি ভাবিয়া তাঁহাকে বাঙালী করিয়া অভিশপ্ত ভারতে নির্বাসিত করিয়াছিলেন, তা তিনিই বলিতে পারেন।'

একদিন তাঁর ভিক্টোরিয়া ঘোড়ার গাড়িতে একা যাচ্ছেন অরবিন্দ, ক্যাম্প রোড থেকে শহরের দিকে, হঠাৎ রাস্তায় ঘোড়া ক্ষেপে গেল। দারুণ দুর্ঘটনার সম্মুখীন হলেন অরবিন্দ। তখন সেই বিপদকে নিবারিত করবার জন্যে তিনি কঠোর মনোবল প্রয়োগ করলেন। সহসা দেখলেন কে এক আলোময় দেবতা তাঁ

মর্মের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন—তিনিই যেন সমস্ত ঘটনা সমস্ত চালনার প্রভু, সমস্ত কিছুই যেন তাঁর শাসনের বশীভূত।

দুর্ঘটনা কেটে গেল।

এই বিষয় নিয়ে ইংরেজিতে আর একটি সনেট লিখলেন অরবিন্দ :

ঐশ্বরিক

বিদ্যুদ্দাম অশ্বক্ষুর—বিপদের নর্তন-আসরে
বসে ছিনু, পথ যেন চিত্র কোন খেয়ালী শিল্পীর
আঁকাবাঁকা এলোমেলো, অকস্মাৎ মর্মের ভিতরে
ধীরে ধীরে মোরে যেন ঢেকে দিল তাহার শরীর।

আমার মাথার উর্ধ্বে দেখা গেল শক্তিশালী শির
মুখ তার অ-মৃত্যুর অমৃতের শান্তিতে মগন,
বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য তার কোথা নাই পরিধি প্রাচীর
দীপ্ত দৃপ্ত দৃষ্টি তার একচ্ছত্র ভুবনলোচন।

সূর্য আর বাতাসের সঙ্গে তার মিশে গেছে কেশ
হৃদয়ের মাঝে তার বিশ্ব রাজে—সে-ই দেখি আমি—
আমার সত্তায় দেখি চিরন্তন শান্তির প্রবেশ
সেই সে একার শান্তি মৃত্যুহীন চিরদূরগামী।

সে মুহূর্ত চলে গেল, সব ফের আগের মতন,
রয়ে গেল চিরস্থায়ী মৃত্যুঞ্জয় মহান স্বপন॥

যোগসাধনার আগেই এই যোগাবস্থা।

'দেশে মাধবরাওয়ের ছেলের খুব অসুখ।' বলছেন অরবিন্দ, 'ডাক্তাররা আশা ছেড়ে দিয়েছে। মাধবরাও তার করল, শুধু বন্ধ করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো। তার পেয়ে সবাই প্রার্থনায় বসল আর ছেলে ভালো হয়ে উঠল। আমি জানি এ ঘটনার কথা। মাধবরাও আমাকে টেলিগ্রাম দেখিয়েছে। আরেকবার, আমার মামাতো বোনের খুব অসুখ, টাইফয়েড। ডাক্তাররা আশা

ছেড়ে দিয়েছে, বললে, এখন একমাত্র যা করবার আছে তা হচ্ছে প্রার্থনা। সবাই প্রার্থনা শুরু করল। মেয়ে চোখ চাইল। তার জ্ঞান ফিরে এসেছে।'

কলেজ থেকে এসে নভেল পড়ছেন অরবিন্দ। পাশে বসে বন্ধুরা দাবা খেলছে। আধ ঘণ্টা পড়ে বইটা শেষ করে রেখে অরবিন্দ এক পেয়ালা চা খেলেন। কেমন তিনি পড়েছেন বন্ধুদের পরীক্ষা করতে ইচ্ছে হল। বইটা নিয়ে একটা পৃষ্ঠা থেকে খানিকটা পড়ে বন্ধু চারু দত্ত জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার বলো তো আগে-পরে কী ঘটেছে?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অরবিন্দ আনুপূর্বিক সব বলে দিলেন।

সেদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছে, বাইরে কারুর বেরোনো হয়নি। চারু দত্তের বাড়িতে আছেন অরবিন্দ। কথা হল রাইফেল দিয়ে গুলি ছোঁড়ার খেলা হোক। দেখি কে নিশানা বিদ্ধ করতে পারে। তুমি, অরবিন্দ, তুমিও একবার গুলি ছুঁড়ে দেখ না। অরবিন্দ বললেন, রাইফেল কখনো ধরিনি। রাইফেল কী করে ধরতে হয়, কী করে তাক করতে হয় আমরা শিখিয়ে দেব! সকলের পীড়াপীড়িতে অরবিন্দ রাইফেল তুলে নিলেন। নিশানাটা কী? নিশানাটা দেয়াশালাইয়ের কাঠির মাথায় ছোট্ট কালো বিন্দুটি। দশ-বারো ফুট দূরে কাঠিটাকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। অরবিন্দ তাক করলেন। ছুঁড়লেন গুলি।

প্রথম গুলিতেই নিশানা বিদ্ধ হল। আবার ছুঁড়লেন তো আবার লক্ষ্যবেধ। একবার, দুবার, তিনবার। পর পর তিনবার।

চারু দত্ত বললেন, 'এ লোক সিদ্ধ হবে না তো কে হবে?'

॥ সাত ॥

একদিন এক দৃঢ়-দীপ্ত দীর্ঘায়ত যুবক অরবিন্দের বাসায় এসে উপস্থিত হল। বাঁ হাতে একটা লোটা, ডান হাতে একটা লাঠি।

নাম যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্ধমান জেলায় বাড়ি, এলাহাবাদে কায়স্থ পাঠশালায় পড়াশোনা করেছে।

কী চাই?

মিলিটারিতে ঢুকতে চাই।

অরবিন্দ তীক্ষ্ণ চোখে যতীন্দ্রকে পর্যবেক্ষণ করলেন।

বাধাটা কী?

ইংরেজের ফৌজে বাঙালীর প্রবেশ নিষেধ।

কেন? ভেতো বাঙালী ভীরু বাঙালী, যুদ্ধ করতে অশক্ত—এই অজুহাত?

না, তার উলটোটাই বিবেচনা ক'রে। বাঙালী লড়াই করতে শিখলে ইংরেজ-াজত্ব লোপাট হয়ে যাবে এই ভয়ে।

উত্তরে আনন্দিত হলেন অরবিন্দ। তবে তুমি এখন কী চাও?

যদি দয়া করে এই মহারাজার ফৌজে আমাকে ঢুকিয়ে দেন।

বাঙালী ছেলে চাকরি না চেয়ে যোদ্ধা হতে চায় এ এক অভিনব ব্যাপার। সীজীবী না হয়ে অসিজীবী! অরবিন্দ উৎসাহিত বোধ করলেন। লেফটেনেন্ট াধব রাওকে ধরলেন। প্রথমত অন্তত একে একটা পদাতিক সৈন্য-সেপাই বা ডিগার্ড হিসেবে বহাল করুন।

যতীন্দ্র তার পদবীর বন্দ্য-টুকু বাদ দিয়ে উপাধ্যায় হয়ে গেল। সাজল রুবিয়া ব্রাহ্মণ। ফৌজে ভর্তি হয়ে গেল।

অরবিন্দ যতীন্দ্রকে তাঁর বিপ্লব-ভাবনার মধ্যে নিয়ে এলেন।

অরবিন্দের বিপ্লব-ভাবনা কী?

মন্ত্র—বন্দেমাতরম্। মন্দির—মনোমন্দির। ভবানীমন্দির।

কার্যপ্রণালী ত্রিবিধ। প্রথমত গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করা, যার উদ্দেশ্য হবে শস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য দেশবাসীকে প্রস্তুত করা। দ্বিতীয়ত, গুপ্তভাবে নয়, প্রকাশ্যে াধীনতার আদর্শ সাধারণ্যে প্রচার করা। দেশের অনেকে মনে করে যে াধীনতা মরীচিকা মাত্র, ভারতবাসীর পক্ষে অলভ্য ও অবাস্তব এই মর্মান্তিক থ্যাকে ভেঙে দেওয়া। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যতই মজবুত হোক, আর আপাতদৃষ্টিতে ারতবাসীরা যতই দুর্বল ও নিরস্ত্র হোক, বলসাধনার ফলে এই ভারতবাসীরাই রটিশকে উচ্ছেদ করতে পারবে—এই বিশ্বাসকে জাগিয়ে তোলা। তৃতীয়ত সহযোগে ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের শক্তিতে ব্রিটিশ শাসনকে অচল করে দেওয়া। ই পথপ্রস্তুতি ও কর্মপদ্ধতির ফল ফলতে সময় লাগবে ত্রিশ বছর।

আপনি তাহলে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের পক্ষে?

নিশ্চয়ই। সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা কবে কোন দেশ অর্জন রেছে? ফ্রান্স? আমেরিকা? ইটালি? গুপ্ত সমিতির মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে কাশ্য বিদ্রোহের প্রস্তুতি-সাধন। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ যদি কৃতকার্য না হয় তবে শস্ত্র বিদ্রোহ ছাড়া আর পথ কী!

অরবিন্দ যতীন্দ্রনাথকে আরো কাছে ডেকে নিলেন। বললেন, 'তোমাকে

আমি বাংলায় পাঠাব, সেখানে তুমি গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করবে।'

যতীন্দ্রনাথ এক কথায় রাজী। সশস্ত্র সৈনিক হয়ে লাভ কী যদি মাতৃভূমি স্বাধীনতার সংগ্রামে না লাগি ?

আর মাতৃভূমিকে স্বাধীন করা, পরপীড়কের কবল থেকে উদ্ধার করা ছাড় জীবনের ব্রত কী !

স্ত্রী মৃণালিনীকে চিঠি লিখছেন অরবিন্দ : 'অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জ পদার্থ, কতগুলা মাঠ ক্ষেত্র বন পর্বত নদী বলিয়া জানে, আমি স্বদেশকে মা বলি জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মা'র বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষ রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কি করে ? নিশ্চিন্তভাবে আহার করিত বসে, স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে, না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াই যায় ?'

বছর দেড়েক পরে ট্রেনিং শেষ হলে যতীন্দ্রনাথ অরবিন্দের আশীর্বাদ নি কলকাতা রওনা হল।

অরবিন্দ আরো বিশদ হলেন : গুপ্ত সমিতির লক্ষ্য হবে স্বাধীনতার আদ যুবশক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ করা। শুধু যুবকদের আনুকূল্য নয়, জনসাধারণের সহানুভূতি অর্জন। জনসাধারণের ভয় ভাঙিয়ে দেওয়া। আমরাও সমর্থ ও সক্ষম এ প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত করে তোলা। তারপরে নিরন্তর অসহযোগে ও প্রতিরো ইংরেজের শাসনের বনেদকে শিথিল করে ফেলা। শেষে গেরিলা-যুদ্ধ শুরু ক দেওয়া। বিশাল দেশ ভারতবর্ষ আর মুষ্টিমেয় ব্রিটিশ সৈন্য। গেরিলা যুদ্ধে তারা বিপর্যস্ত হবে। চাই কি, বিদেশ থেকে সাহায্য মিলে যাবে আমাদে এদিকে ভারতীয় সৈন্যরাও বিদ্রোহ করে বসবে। নিতান্ত বাধ্য না হলে ইংরে তার রাজত্ব ছাড়বে না। তবে যখন বুঝবে ভারতীয় বিদ্রোহ অপ্রতিরোধ্য হ উঠেছে তখন তাড়াতাড়ি একটা আপোস-রফা করে শাসনভার ছেড়ে দিয়ে স পড়বে। জোর করে তাদের হাত থেকে শাসনভার কেউ কেড়ে নেবে এ সহ্য ক ইংরেজের ধাত নয়, বরং গতিক খারাপ বুঝলে তারা আগেভাগে পথ দেখবে তাতে ক'রে যতটুকু বাঁচে, যতটুকু রাখা যায়।

পশ্চিম ভারতেও গুপ্ত সমিতি আছে। তার নেতা এক মারাঠী ভদ্রলো নাম মাণ্ডাভালে। অরবিন্দ তাঁর কাছ থেকে গুপ্ত সমিতির শপথ-বাক্য গ্র করলেন। বাংলা আর মারাঠা একমন্ত্রে উজ্জীবিত হোক। হোক তাদের এক মন্ত্রগুপ্তি।

একদিন ভোরবেলা, বিছানা ছেড়ে তখনো উঠেননি অরবিন্দ, হাতে একটা নভাসের ব্যাগ নিয়ে বারীন এসে হাজির। ব্যাগটা যত ময়লা তারও চেয়ে ণ ময়লা তার জামা-কাপড়।

'তুই কোত্থেকে ?'

'আপাতত পাটনা থেকে।'

'সেখানে কী করছিলি ?'

'সেখানে চায়ের দোকান দিয়েছিলাম। ব্যবসা ফেল মেরেছে।'

'যা স্নানের ঘর থেকে পরিষ্কার হয়ে আয়।'

এণ্ট্রান্স পাস করে মেজদা মনোমোহনের কাছে ঢাকায় গিয়েছিল বারীন। বেছিল কৃষিবিদ্যায় কৃতী হবে। কোথাও অর্থানুকূল্য মিলল না। কায়ক্লেশে ছ টিকে ছিল, তারপর কিছু একটা করা উচিত ভেবে পাটনায় গিয়ে চায়ের কান দিল। ক' দিনেই দোকানে গণেশ ওলটাল। এখন অগতির গতি দার কাছে এসে শরণ নিলে।

বিপ্লবের হাতে খড়ি তার আগেই হয়েছে দেওঘরে, এখন অরবিন্দ তাকে গুপ্ত তি কার্যকর করার কাজে আহ্বান করলেন।

কোত্থেকে কে জানে বারীন আত্মা নামাবার বিদ্যা শিখে এসেছে। সেটা বার কেমনতরো ?

প্রথমেই মেনে নিতে হবে ইহলোকের বাইরে পরলোক বলে একটা স্থান বা স্থা আছে। আর মৃত্যুতেও মানুষের শেষ হয় না, তার আত্মা বিদেহী স্থায় থাকে বা ঘোরাফেরা করে। আবার জীবিত মানুষের মধ্যে এমন কেউ উ আছে যাদের মধ্য দিয়ে ঐ বিদেহী আত্মা কথা বলতে বা লিখতে পারে। আর বক্তব্য নিজের হাতে লিখে দিতে পারে। বারীনের হয়েছে সেই ক্ষমতা। ই লেখনই অটোমেটিক রাইটিং বা স্বতোলিখন।

একদিন আত্মা-নামানোর বৈঠক বসাল বারীন।

শূন্যের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাবার আত্মাকে চাই। তিনি আসুন।'

কতক্ষণ পরে বারীনের হাতের কাগজে লেখা ফুটল : আমি এসেছি। আমি ডি. ঘোষ।

আপনি যে কে. ডি. ঘোষ তার প্রমাণ কী ?

প্রমাণ—আমি তোকে তোর ছেলেবেলায় একটা সোনার ঘড়ি উপহার দিলাম—

সেই কথা বারীনের স্মরণেও ছিল না, চিন্তনেও ছিল না। কিন্তু এখন কথাট
এল বলে সজ্ঞানে স্মৃতিমন্থন করে স্পষ্ট হল, কথাটা ঠিক। ছেলে ভুলে গেলে
বাবা ভোলেননি।

আরেকটা প্রমাণ দিন।

ইঞ্জিনিয়র দেওঘরের বাড়ির দেয়ালে একটা ছবি আছে।

কেউ-কেউ তক্ষুনি ছুটল খোঁজ নিতে। এসে বললে, কোনো ছবি নেই।

আত্মাকে জানানো হল সেই কথা।

লেখা পড়ল—ভালো করে খুঁজে দেখ। হনুমানের ছবি। আঁকা ছবি।

পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেল দেয়ালের সেই ছবি চুনকামে ঢাকা পড়েছে।

সেই স্বতোলিখনের বৈঠকেই একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ এসে মন্দির গড়তে ব
গেলেন—ভবানী মন্দির।

অরবিন্দ 'ভবানী মন্দির' নিয়ে একটি বিপ্লবাত্মক পুস্তিকা লিখলেন।
নমশ্চণ্ডিকায়ৈ। মন্দিরের প্রতিষ্ঠা শুধু হৃদয়ে নয়, বাইরেও, কোনো পর্বতে
অরণ্যে যেখানে বিপ্লবী যোদ্ধারা, অভয়ার সন্তানেরা, আশ্রয় নিতে পারবে।
হবে ভারতবর্ষের মন্দির। শক্তির মন্দির।

'বক্তৃতার উত্তেজনা নহে, ম্লেচ্ছদত্ত বিদ্যা নহে, সভাসমিতির ভাব-সঞ্চা
শক্তি নহে, সংবাদপত্রের ক্ষণস্থায়ী প্রেরণা নহে,' বলছেন অরবিন্দ, 'নিজের ম
আত্মার বিশাল নীরবতায় ভগবান ও জীবের সংযোগে যে গভীর অবিচলি
অভ্রান্ত শুদ্ধ সুখদুঃখজয়ী পাপপুণ্যবর্জিত শক্তি সম্ভূত হয়, সেই মহাসৃষ্টিকারি
মহাপ্রলয়ঙ্করী, মহাস্থিতিশালিনী, জ্ঞানদায়িনী মহাসরস্বতী, ঐশ্বর্যদায়ি
মহালক্ষ্মী, শক্তিদায়িনী মহাকালী, সেই সহস্র তেজের সংযোজনে একীভূতা চ
প্রকট হইয়া ভারতের কল্যাণে ও জগতের কল্যাণে কৃতোদ্যম হইবে। ভার
স্বাধীনতা গৌণ উদ্দেশ্যমাত্র, মুখ্য উদ্দেশ্য ভারতের সভ্যতার শক্তি প্রদর্শন
জগৎময় সেই সভ্যতার বিস্তার ও অধিকার।'

এই স্বতোলিখন কী প্রমাণ করে? প্রমাণ করে পার্থিব জগৎই জীবনের
বা সীমা নয়। স্থূলতাই নয় চরম বাস্তবতা। চেতনার ঊর্ধ্বতন স্তর আ
মনের বাইরে আছে অতিমানস।

স্বতোলিখনের লেখক সর্বক্ষণ অনুভব করে সে নিজে লিখছে না, অপর
কেউ যেন তাকে দিয়ে লেখাচ্ছে। আর মাঝে-মাঝে এমন জিনিস লেখাচ্ছে
তার জাগ্রত মনে নেই, নিমগ্ন মনে নেই, যা একেবারে তার ধ্যান-ধারণার বাই

অরবিন্দ নিজেও এই স্বতোলিখনে অভ্যস্ত হলেন।

বারীনকে পাঠিয়ে দিলেন বাংলায় যতীনকে বিপ্লবের কাজে সাহায্য করতে। বারীন বিপ্লবের বার্তাকে সুদূর গ্রামে দরিদ্র ও অজ্ঞানাচ্ছন্নদের এলাকায় নিয়ে গেল। সে এখন নিজের আনন্দে নিজেই মেতে উঠেছে। চোখ খুলে জগৎটাকে দেখ—দেখ তুমিও কম নও, তোমার মধ্যেই রয়েছে ব্রহ্মবল। বাহুবল না থাকলে ব্রহ্মবলকে ধরবে কী করে? গ্রামের মুদিখানায় বসে গ্রামের ছেলেদের সে মাৎসিনি আর গ্যারিবল্ডির জীবনী শোনায়, শোনায় বিবেকানন্দের বাণী, গীতার উপদেশ, অমৃতসমান মহাভারতের কথা। সমিতির সংখ্যা বাড়তে লাগল দিনে-দিনে।

এদিকে অরবিন্দের চাকরিতে উন্নতি হল—পাকাপাকিভাবে ইংরেজির প্রফেসর হলেন। মাইনে হল তিনশো ষাট টাকা।

বিয়ে করলেন অরবিন্দ। বিয়ে করলেন ভূপালচন্দ্র বসুর মেয়ে মৃণালিনীকে। মৃণালিনীর বয়স চৌদ্দ, অরবিন্দের ঊনত্রিশ। বিয়ে হল কলকাতায়, বৈঠকখানা রোডে, হাটখোলার দত্তদের বাড়িতে। অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু, ভূপালের বন্ধু, তিনিই ঘটকালি করেছিলেন।

বিয়ে হিন্দুমতে হচ্ছে। কথা উঠল, অরবিন্দ বিলেত-ফেরত, তাকে তাই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

অরবিন্দ প্রস্তাব নস্যাৎ করে দিল।

'তবে অন্তত মাথাটা কামাও।'

'অসম্ভব।'

তারপরে অর্থমূল্যে ব্রাহ্মণ পুরোহিত সমস্ত দোষ শোধন করে নিল।

বিয়ের পর অরবিন্দ সস্ত্রীক দেওঘর গেলেন। সেখান থেকে মৃণালিনী, সরোজিনীকে নিয়ে নৈনিতাল।

দীনেন্দ্রকুমার লিখছেন, জ্যোতিষ শাস্ত্রে অরবিন্দের প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। দীনেন্দ্রকুমার তাঁর স্বগ্রামবাসী তান্ত্রিক কালীপদ ভট্টাচার্যকে দিয়ে অরবিন্দের জন্ম-পত্রিকা প্রস্তুত করেছিলেন। তার থেকে ভট্টাচার্য বললেন, 'তোমার ছাত্রটি অসাধারণ ব্যক্তি, মহারাজার সে খুব প্রিয়পাত্র, কিন্তু তার অদৃষ্টে গার্হস্থ্য সুখ নেই।'

গার্হস্থ্য সুখ নেই—সেটা কী ধরনের অসুখ হবে কে তখন তা আন্দাজ করতে পারত? একদিন অলৌকিকের, আধ্যাত্মিকের আদেশ আসবে তার

কোনো স্পষ্ট নির্দেশ তো তখনো ছিল না। আদেশ যখন আসে তখন সমগ্র মানুষটারই জন্মান্তর ঘটে যায়। তখন সেই আগের মানুষটার সঙ্গে নবীভূত বা পরিবর্তিত মানুষের কোনো সম্পর্ক থাকে না। বুদ্ধের তাই হয়েছিল, কনফুসিয়াসেরও তাই।

স্ত্রীকে চিঠি লিখছেন অরবিন্দ: দুঃখ হলে বা কি হয়? সংসারে সুখের অন্বেষণে গেলেই সেই সুখের মধ্যেই দুঃখ দেখা যায়, দুঃখ সর্বদা সুখকে জড়াইয়া থাকে। ধীর চিত্তে সব সুখ দুঃখ ভগবানের চরণে অর্পণ করাই মানুষের একমাত্র উপায়।

নৈনিতাল থেকে ভুবন চক্রবর্তীকে চিঠি লিখছেন অরবিন্দ:

আমি আমার স্ত্রী ও বোনকে নিয়ে নৈনিতাল এসেছি। জায়গাটা সুন্দর কিন্তু ঠাণ্ডা যতটা ভেবেছিলাম তার আদ্ধেকও নয়। বৃষ্টি না হলে দিনের তাপ বরোদার চেয়ে বেশি। যদি ইতিমধ্যে বরোদায় বৃষ্টি হয়ে যায় তবে মহারাজা জুনের শেষাশেষি রওনা হবেন—তবে মাঝপথে আগ্রা মথুরা হয়ে যাবেন বলে বরোদায় পৌঁছুতে-পৌঁছুতে জুলাইয়ের সেই প্রথম সপ্তাহ। আমি আলাদা ফিরব এবং সম্ভবত পয়লা জুলাই পৌঁছুব। আপনি যদি ভালো বোঝেন কিছু আগেই যাবেন, দেশপাণ্ডে ওখানে থাকবেন। আমি আমার নতুন বাড়ি আসবাবে সাজিয়ে দেবার জন্য মাধব রাওকে লিখেছি, সে কতদূর কী করল খবর নেই।

ব্যানার্জি আশা করি কলকাতায়ই আছে। দেওঘরে আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে এসেছিল। ইতি।

দীনেন্দ্রকুমার বলছেন, অরবিন্দকে কোনোদিন রাগ করতে দেখলাম না। প্রশংসা বা প্রতিষ্ঠার জন্য এতটুকু লোলুপতা নেই। কত উচ্চপদের কর্মচারী কত মানসম্রমের অধিকারী, একটু চেষ্টা করলে অমনি কত মানসম্রম আপনিও আদায় করতে পারেন। কিন্তু আপনার হুঁশ নেই। সামনাসামনি একদিন অভিযোগ করলেন দীনেন্দ্রকুমার: কত লোক তেলের ভাঁড় নিয়ে আপনার দরজায় ঘুরে বেড়ায়, আপনি সবাকার উপেক্ষা নিয়ে একধারে পড়ে থাকেন। আমার ভালো লাগে না। শুনে অরবিন্দ হাসেন। বলেন, কতগুলো মূর্খের তোষামোদ কুড়িয়ে কি কিছু আনন্দ আছে?

মূর্খদের কথা দূরে থাক, পণ্ডিত ব্যক্তির প্রশংসায়ও অরবিন্দের উল্লাস কই?

রমেশ দত্ত, উড়িষ্যা-বিভাগের কমিশনার, রামায়ণ-মহাভারতের সংক্ষিপ্ত পদ্যানুবাদ করে কত নাম করেছেন, মহারাজার নিমন্ত্রণে এসেছেন বরোদায়।

শুনেছেন অরবিন্দ ঘোষও রামায়ণ-মহাভারতের অংশবিশেষ অনুবাদ করেছে। অরবিন্দের কাছে এসে দেখতে চাইলেন নমুনা।

অরবিন্দ খুব কুণ্ঠিত। তবু যখন দেখতে চাইছেন—'না' বলা যায় না।

পড়ে তো রমেশ দত্ত মুগ্ধ, অভিভূত। বললেন, 'তোমার এই অনুবাদ পড়বার পর মনে হচ্ছে আমি কেন পণ্ডশ্রম করতে গিয়েছিলাম। এ লেখা আগে চোখে পড়লে আমি কখনো আমার লেখা ছাপতে দিতাম না।'

এই গুণীজনের সংবর্ধনায়ও অরবিন্দের কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। তিনি যেমন মৌনী তেমনি উদাসীন।

টেবিলের উপর 'জুয়েল ল্যাম্প', ধারে একখানি চেয়ার। সেই চেয়ারে বসে ঐ জুয়েল ল্যাম্পের আলোয় অরবিন্দ রাত একটা পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। ঝাঁকে-ঝাঁকে মশা তাঁকে ছেঁকে ধরে, শত দংশনেও তিনি চঞ্চল হন না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেখায় বা পড়ায় মনোনিবেশ করে বসে আছেন তন্ময় হয়ে, যেন যোগনিমগ্ন তপস্বী। সাধ্য কী সামান্য মশা তাঁর সাধনায় বিঘ্ন ঘটায়!

'একটা গল্প শোনো।' পরবর্তীকালে শ্রীঅরবিন্দ বলছেন: 'একবার এক ইউরোপীয় মহিলা মহর্ষি রমণের সঙ্গে দেখা করতে চায়। মহর্ষির সামনে ধ্যান করতে বসে সে মশা তাড়াতে শুরু করে আর মহর্ষির কাছে মশার উৎপাত নিয়ে নালিশ জানায়। মহর্ষি বলেন, ভদ্রমহিলা যদি মশার কামড় সহ্য করতে না পারেন তা হলে তাঁর দ্বারা যোগ করা হবে না। ভদ্রমহিলা কথার গূঢ় অর্থ বুঝতে পারল না। সে মশা-ছাড়া সাধন চায়।'

আন্তরিক আনন্দের অমল আভা অরবিন্দের মুখে ছড়িয়ে পড়ে যখন তাঁর লেখা কবিতাটি ঠিক মনের মতন হয়ে ওঠে। হোক তা মহাভারত কি রামায়ণের থেকে অনুবাদ, অনুবাদকেও মনঃপূত করে তোলা কম তৃপ্তির কথা নয়।

অনেক সময় মূল আর অনুবাদ দুইই অরবিন্দ পড়ে শোনায় তার মাস্টার-মশাইকে। বলে, ইউরোপীয় সাহিত্যে দান্তে আর হোমারের কবিতা অতুলনীয়, কিন্তু যাই বলুন, কবিত্বে বাল্মীকি সর্বশ্রেষ্ঠ।

কলেজের ছাত্রদের কাছেও অরবিন্দ খুব প্রিয় হয়ে উঠেছেন। কলেজ ইউনিয়নের সভাপতি অরবিন্দ। এমন কি ডিবেটিং সোসাইটির কর্তৃত্বও তাঁর হাতে।

কিন্তু নোট মিলিয়ে টেক্সট্ পড়াতে রাজী নন কিছুতেই। বলছেন, 'একবার Southey-র Nelson পড়াচ্ছিলাম। কিন্তু বইয়ের নোটের সঙ্গে আমার

বক্তৃতার কোনো মিল ছিল না। ছাত্ররা এসে নালিশ করল, এ কেমনতরো? নোটের সঙ্গে আপনার ব্যাখ্যার মিল নেই কেন? বললাম, আমি নোট পড়িনি, তাই। দেখি তোমাদের নোট। পড়ে দেখলাম, একেবারে রাবিশ। অত খুঁটিনাটি ঘাঁটতে আমি অভ্যস্ত নই। আমি পড়াতাম আর মনকে ছেড়ে দিতাম, যে যা পারো যতটুকু পারো তাই সংগ্রহ করে নাও। তাই তো আমার আর পণ্ডিত হওয়া হল না।' অরবিন্দ হাসলেন: 'কিন্তু ছাত্ররা তো শুধু আমার নোটই নিত না, বোম্বাইয়ের প্রফেসরদেরও নোট নিত, যদি অবশ্য তারাও পরীক্ষক হত। নোট যদি দেখতে চাও দেখ গে মনোমোহনকে। তার বইয়ের আষ্টেপৃষ্ঠে নোট। কত নোট-লেখা কাগজের টুকরো যে তার বইয়ে গাঁথা থাকত তার ইয়ত্তা করা যায় না। আমি যদি অত কর্তব্যপরায়ণ হতে পারতাম!'

পরের ছুটিতে অরবিন্দ কলকাতা গেলেন।

দেখা হল বিপ্লবী ব্যারিস্টার পি. মিত্র বা প্রমথনাথ মিত্রের সঙ্গে। যতীন্দ্রনাথই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করল। পি. মিত্র ও সরলা দেবী লাঠিখেলা ও ব্যায়াম শিক্ষার ব্যপদেশে বিপ্লবসঙ্ঘ সংঘটন করেছিলেন। সঙ্গে জুটেছিল বিভূতি ভট্টাচার্য। আরো ছ'টা সঙ্ঘ স্থাপনের প্রস্তাব হল।

পরে মেদিনীপুর গিয়ে অরবিন্দ হেমচন্দ্র দাসকে শপথবাক্য পাঠ করালেন। পাঠের সময় তার হাতে দিলেন একখানি গীতা ও একটা তরবারি।

শপথবাক্যটি এই: আমি যে কোনো উপায়ে হোক ভারতমাতার স্বাধীনতা অর্জন করব ও সঙ্ঘের এই গোপন সংকল্পের কথা বাইরে কারো কাছে প্রকাশ করব না।

হেমচন্দ্রের বাগানে বন্দুক চালনার মহড়া হল।

বারীন ভবানী মন্দির গড়বার জন্যে দারুণ ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। আগে তার জন্যে উপযুক্ত একটা জায়গা দরকার তো। বারীন জায়গা খুঁজতে বিন্ধ্য পর্বতে গিয়ে হাজির হল। পাহাড়ী শান্তিতে ভালো মন্দির হবে, কিন্তু মনোমত জায়গা খুঁজে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ফিরে এল পাহাড়ী জ্বর নিয়ে। সেই অগতির গতি সেজদার বাড়িতে, বরোদায়।

জ্বর আর নামে না। ডাক্তারী চিকিৎসার ত্রুটি নেই কিন্তু জ্বর সেই পাহাড় সমান।

একদিন কোথা থেকে কে জানে এক নাগা সন্ন্যাসী এসে হাজির।

'ওখানে কে শুয়ে আছে?' অরবিন্দকে জিজ্ঞেস করল সন্ন্যাসী।

'আমার ভাই। পাহাড়ে গিয়েছিল, জর নিয়ে এসেছে।'

'এক গেলাস জল নিয়ে এস।'

জল এলে সন্ন্যাসী মন্ত্র পড়তে পড়তে একটা ছুরি দিয়ে জলের উপর দাগ কাটল। বারীনকে বললে, 'জলটা খেয়ে ফেল। দেখবে কাল থেকে জর নেই।'

বারীন জল খেয়ে চোখ বুজল।

যেমন বলেছিল সন্ন্যাসী। পরদিন আর বারীনের জর নেই। সে সম্পূর্ণ সুস্থ।

অরবিন্দ ভাবলেন, এ কি যোগশক্তি?

॥ আট ॥

এ যোগশক্তি ছাড়া আর কী।

যোগশক্তিতে যদি ব্যাধি সারে তবে, অরবিন্দ ভাবলেন, সেই শক্তিতে পরাধীনতার থেকে আরোগ্যলাভ হবে না কেন? পরাধীনতাই তো সব চেয়ে বড় ব্যাধি। স্বাধীনতাই তো সেই ব্যাধির নিরাকরণ। যোগশক্তির বলে সেই স্বাধীনতাই বা আসবে না কেন?

ঐ নাগা সন্ন্যাসীই অরবিন্দকে একটি কালী-স্তোত্র শোনালেন—বারে বারে যার শেষ কথা 'জহি', 'জহি'। হনন করো, নিধন করো। সেই সঙ্গে সন্ন্যাসী কিছু ক্রিয়া ও যজ্ঞ করলেন। বললেন, 'এ সমস্তই তোমার বিপ্লবের সাহায্যের জন্যে।'

ভবানী মন্দির যে গড়তে হবে সেখানেও তো যোগশক্তির প্রয়োজন।

অরবিন্দের ভবানী-ভাবনাটি দেখা যাক।

কে ভবানী? কেন তাঁর জন্যে মন্দির গড়ব?

ভবানী অনন্ত শক্তির আধার। কখনো তিনি প্রেম, কখনো তিনি জ্ঞান, কখনো তিনি ত্যাগ, কখনো তিনি করুণা। তিনি দুর্গা, তিনি কালী, তিনি লক্ষ্মী, তিনিই রাধা। তিনিই আমাদের সৃষ্টিকর্ত্রী।

তিনিই বিশুদ্ধা শক্তি।

রণশক্তি, ধনশক্তি, বিজ্ঞানশক্তি। রাক্ষস অসুর দেবতা সবই তাঁর শক্তির প্রকাশ। তারপর প্রাণশক্তি। প্রতীচ্যে কত শক্তির অভ্যুত্থান হচ্ছে কিন্তু প্রাচ্যে একমাত্র জাপান। ভারতবর্ষে আমরা অকৃতকর্মা যেহেতু আমরা শক্তিহীন। আমাদের শক্তি নেই, প্রাণবেগ নেই, নেই তেজ-দ্যুতি। আমরা শক্তিকে

ছেড়েছি বলে শক্তিও আমাদের ছেড়েছে।

শক্তির অভাবে আমাদের জ্ঞানও নিষ্ফল। আমাদের মাথায় শুধু একটা মৃত-ভার, আমাদের হাতে শুধু এক বিষ-পাত্র।

যে শক্তিমান সে-ই ভক্তিমান হতে পারে। শক্তি নেই বলে আমাদের ভক্তিও সারশূন্য। শক্তির অভাবে ভক্তিকে আমরা ঘনীভূত করতে পারি না, চালনা করতে পারি না, পারি না বাঁচিয়ে রাখতে। ভক্তি হচ্ছে লেলিহান আগুন, শক্তি হচ্ছে তার বন্ধন। যদি ইন্ধন অল্প হয়, আগুন কতক্ষণ!

জ্ঞানের আলোকে প্রদীপ্ত কর্মদৈত্য যদি প্রেমে ঈশ্বর-সন্নিধানে পৌঁছতে পারে তা হলেই ভক্তি চিরস্থায়ী, তবেই দিব্য জীবনের সংযোজন। কিন্তু দুর্বলপ্রকৃতি মানুষরে সাধ্য নেই ভক্তির বিপুল দায়িত্ব বহন করতে পারে, তাই উর্ধ্বে উঠেও সে পড়ে যায় মাটিতে।

ভারতবর্ষের এখন একমাত্র যা প্রয়োজন তা হচ্ছে শক্তি। শক্তি শারীরিক, শক্তি মানসিক, শক্তি নৈতিক, সর্বোপরি আধ্যাত্মিক শক্তিই। এই আধ্যাত্মিক শক্তিই সমস্ত শক্তির অব্যর্থ উৎস। শক্তির অভাবে আমরা শুধু ছায়া-মানুষ হয়ে আছি, যার হাত আছে অথচ যে সবলে আঁকড়ে ধরতে পারে না, পারে না বা প্রহার করতে—পা আছে কিন্তু স্থির লক্ষ্যে সবেগে অগ্রসর হবার ক্ষমতা নেই।

আমাদের ভারতবর্ষ জ্ঞানে প্রবীণ, অনুভূতিতে ও আস্পৃহায় তীক্ষ্ণ, কিন্তু ক্লৈব্য আমাদের আপাদমস্তক গ্রাস করে আছে—আমরা আলস্য ও দৌর্বল্য, শৈথিল্য আর ভীরুতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছি। যদি ভারতবর্ষকে বাঁচতে হয়, তাহলে তাকে যৌবনে নবীভূত হতে হবে, তপ্ত প্রাণবেগ ছুটবে তার ধমনীতে, আর ফলে সে বিশাল এক কর্মবলের সমুদ্র হয়ে উঠবে, কখনো শান্ত কখনো উত্তরঙ্গ কখনো বিস্তীর্ণ কখনো অগাধ।

নিশ্চয় আবার ভারতবর্ষের পুনর্জন্ম হবে। আমাদের মধ্যে যারা তামসিকতায় অভিভূত তাদেরই কথা হচ্ছে এ অসম্ভব, যেহেতু ভারতবর্ষ জরাজীর্ণ, রক্তহীন, নিরুৎসাহ। এ এক মূর্খ প্রলাপ। নিজে ইচ্ছে করে দুর্বল না হলে, ব্যক্তি বা জাতিকে কার সাধ্য দুর্বল করে? কে তাকে হত্যা করে যদি সে নিজে হতে না আত্মহত্যা চায়?

জাতি কী? মাতৃভূমি কী? এ কোনো ভূখণ্ড নয়, শুধু বাক্যালঙ্কার নয়, নয় বা অলস কল্পনাবিলাস। লক্ষ লক্ষ বিচ্ছিন্ন শক্তির এ এক প্রচণ্ড সমাহার, যেমন লক্ষ লক্ষ দেবতার শক্তির একীকৃত রূপ ভবানী মহিষমর্দিনী। ভারতবর্ষও

সেই ভবানী ভারতী, ত্রিশ কোটি মানুষের সম্মিলিত শক্তির জীবন্ত প্রতিমা। কিন্তু আমরা যে ঘোর তমস-এর কারাগারে বন্দী—অন্তরস্থ ব্রহ্মশক্তিকে না জাগালে ঘুচবে না এই তমসের মোহ।

আমাদের হাজার-হাজার সাধু-সন্ন্যাসী তাদের জীবন দিয়ে নীরবে কী শিখিয়েছেন আমাদের? ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন থেকে কোন বাণী বিচ্ছুরিত হয়েছে? কী সেই সার কথা যা নিয়ে বীরসিংহ বিবেকানন্দের বক্তৃতা সমস্ত বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল? সে হচ্ছে এই—ত্রিশ কোটি মানুষ, সে রাজাই হোক বা কুলিই হোক, হোক ব্রাহ্মণ বা চণ্ডাল, সকলের মধ্যে একই ঈশ্বর বসবাস করছেন। আমরা সকলে ঈশ্বর, সকলেই স্রষ্টা, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ঈশ্বর-শক্তি আর সমস্ত জীবনই তো সৃজন—শুধু নির্মিত নয়, রক্ষণ—এমন কি ধ্বংসও সৃষ্টিরই রূপান্তর। আমাদের যদি ভাগ্য বা মায়ার হাতের পুতুল হতে সাধ না যায়, আমরা সকলেই সেই সর্বশক্তিমানের প্রতিভাস।

ভারতবর্ষকে পুনর্জন্ম নিতে হবে—বিশ্বের ভবিষ্যৎ তাই দাবি করছে। ভারতবর্ষই সমস্ত বিশ্বের গুরুস্থানীয় হবে—শেখাবে বিজ্ঞানে দর্শনে ধর্মে পরম সামঞ্জস্য। শেখাবে সমগ্র মানব জাতির এক আত্মা, পশুত্বের উৎসাদন করে শেখাবে দেবত্ব। দেবত্ব যে শেখাবে তার দিব্যত্ব লাভ করা চাই।

সেই উদ্দেশেই ভগবান রামকৃষ্ণ এসেছিলেন এদেশে আর সেই বাণী দিকে দিকে প্রচার করেছিলেন বিবেকানন্দ। যদি সেই কাজ আশানুরূপ সাফল্যে উত্তীর্ণ না হয়ে থাকে, তার জন্যে দায়ী আমরা নিজেরা—যেহেতু আমরাই আমাদের জীবনে তমসের ঘন মেঘ নামিয়ে এনেছি—জাড্য আর সংশয়, দ্বিধা আর ভীরুতা। কর্মের অভাবে আমাদের জ্ঞান আর শক্তির অভাবে আমাদের ভক্তি জীবন্ত সত্য হয়ে ওঠেনি। তবু আমাদের ভুললে চলবে না কালীই ভবানী, শক্তি-জননী, যাকে রামকৃষ্ণ পূজা করতেন ও যার সঙ্গে তিনি এক হয়ে গিয়েছিলেন।

মা আমাদের ডাকছেন, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ব্যক্তিবিশেষের অকর্মণ্যতায় কলঙ্কিত হবার নয়, আবার তাঁর সর্বাঙ্গীণ পূজার প্রতিষ্ঠা হোক। সর্বাঙ্গীণ শুধু নয়, সার্বভৌম।

এ জাতির দরকার শক্তি, আরো শক্তি, আরো আরো শক্তি। মায়ের আরাধনা ছাড়া সে শক্তি আসবে কোত্থেকে? মা নিজের জন্যে পূজা চান না, পূজা চান আমাদের জন্যে, যাতে আমাদের হাতে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ

করতে পারেন। না চাইলে, না প্রসন্ন করলে কেউ কিছু দেয় না, দেবতারাও না। আতীব্র আস্পৃহাই দিব্যশক্তিকে নামাতে পারে, আনতে পারে আনন্দের প্লাবন।

পুনর্জীবন লাভ আর কিছুই নয়, আমাদের মধ্যে যে ব্রহ্ম প্রসুপ্ত আছেন তাঁকে যোগে জাগ্রত করা—এ সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক জাগরণ, এ শরীরের চেষ্টায় হবার নয়, নয় বা মেধার স্ফূর্তিতে। ভারতবর্ষের সমস্ত অতীত উত্থান এই ধর্মকে ভিত্তি করেই ঘটেছে, এই পথেই ভারতবর্ষের স্বাভাবিক প্রবণতা। আর কোনো উপায় অবলম্বন করতে গেলেই আমরা প্রতিহত হব।

আধ্যাত্মিক শক্তিই চিরন্তন উৎস, অন্য সমস্ত শক্তি এর থেকেই প্রবাহিত। আধ্যাত্মিক শক্তিই গভীরে অশেষ, অশেষে গভীর। আর সব শক্তি মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেই শুকিয়ে যাবার ভয়। যা ক্ষণজীবী তার জন্যে কে প্রলুব্ধ হবে?

আমাদের তিনটি জিনিস দরকার।

প্রথম, ভক্তি— মায়ের মন্দির। মাকে স্তব না করলে আমরা শক্তি অর্জন করব কী করে?

অতএব আমাদের ভবানীর মন্দির তৈরি করতে হবে, সেই হবে ভারতবর্ষের মন্দির। নাগরিক কলুষের থেকে দূরে, নির্জনে, পবিত্র প্রশান্তিতে, যেখানে বাতাস পরিচ্ছন্ন ও প্রাণপ্রদ। সেই মন্দিরই হবে মার আরাধনার কেন্দ্র, সেই কেন্দ্র থেকেই মাতৃশক্তি অগ্নিশিখার মত সকল পূজারীর হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে প্রবেশ-লাভ করবে। এই মার আদেশ, মার অভিপ্রায়।

দ্বিতীয়, কর্ম—নবীন ব্রহ্মচারী সঙ্ঘ গঠন।

সমস্ত স্তবস্তুতি অর্চনাবন্দনা নিরর্থক যদি না তা কর্মে রূপান্তরিত হয়। আমাদের সেই মঠ চাই যেখানে ব্রহ্মচারীরা সর্বস্ব ত্যাগ করে এসে সেই রূপান্তরের জন্যে কাজ করবে। যদি কেউ চায় সে পূর্ণ সন্ন্যাসী হবে, কিন্তু বেশির ভাগ ব্রহ্মচারীই নির্ধারিত কাজ সমাধা হলে গৃহস্থাশ্রমে ফিরে যাবে। কিন্তু ত্যাগব্রত থেকে কিছুতেই বিচ্যুত হবে না।

চাই অখণ্ড অভিনিবেশ। চাই ইন্দ্রিয়দমন। তবেই না অধ্যাত্মশক্তির সমুদ্রে অবগাহন। তবেই না হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে ভবানী-বহ্নি নিয়ে দেশের সর্বত্র শিখা-সঞ্চার।

তৃতীয়, জ্ঞান।

ভক্তি আর কর্ম সার্থক হতে পারে না যদি ভিত্তিতে না জ্ঞান থাকে।

জ্ঞানের স্বরূপ কী? বেদান্তের সেই সমর্থতম সূক্ত—সোঽহং। সে প্রাচীন

উচ্চারণ কর্মে আর ভক্তিতে প্রোজ্জ্বল হয়ে জাতির হৃদয়ে এখনো যেন উচ্চনাদ হয়ে ওঠেনি।

সেই অমোঘ মন্ত্রই জাতিকে ভয় থেকে দৌর্বল্য থেকে ত্রাণ করবে। জাগাবে নৈরাশ্য থেকে।

সেই মা ডাকছেন। তিনিই ভবানী ভারতী—ভারতমাতা।

সিস্টার নিবেদিতা এসেছেন বরোদায়। এসেছেন মহারাজার নিমন্ত্রণে, বক্তৃতা দিতে।

মহারাজা কাশীরাও যাদবকে বললেন স্টেশনে গিয়ে নিয়ে আসতে। অরবিন্দের দিকে তাকিয়ে বললেন, সঙ্গে আপনি থাকলে ভাল হয়।

অরবিন্দও গেলেন স্টেশনে। নিবেদিতাকে দেখলেন, মনে হল যেন বিপ্লবের বর্তিকা।

আইরিশ বিপ্লবের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন মার্গারেট নোবল, পরবর্তীকালের নিবেদিতা, ভারতবর্ষে নিবেদিতা। সেই বিপ্লবে অরবিন্দের প্রগাঢ় সমর্থন।

ভারতবর্ষের মতই আয়র্ল্যাণ্ডের রাজনৈতিক দুর্দশা। দু দেশই ইংরেজের পদতলে, দু দেশই শাসনেশোষণে জর্জর। দু দেশই নতজানু হয়ে ইংরেজের কাছে করুণা ভিক্ষা করছে। দু দেশেরই কাঁধে ভিক্ষের ঝুলি, গায়ে অপমানের ধুলো, কণ্ঠে মিনতির সুর।

চার্লস স্টুয়ার্ট পার্ণেল আইরিশ বিপ্লবের অন্যতম নেতা। হোমরুল আন্দোলনের পুরোধা। বলছে, আমরা এমন এক গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছি যে কেবল একটিমাত্র যুক্তি বোঝে—অস্ত্রের যুক্তি। কিন্তু কোথায় তখন অস্ত্র, কোথায় বা সিনফিন!

আঠারোশ একানব্বই সালে (১৮৯১) পার্ণেল মারা যায়। অরবিন্দ তার উপরে ইংরেজিতে কবিতা লেখেন।

> হে বিষণ্ণ দীপশিখা, হলে আজ আকাশের তারা,
> মুক্তির সঙ্কেতে তুমি তরবার চেয়ে সূক্ষ্মধার—
> তত তোমা ঘৃণা করে যত ওরা ভয়ে হয় সারা
> কেননা ওদের শিরে নিপতিত তোমার প্রহার।
> মৃত্যুময়ী মৃত্তিকার তুমি এক মহৎ তনয়,
> মৃত্যুতেও হল দেশ শূন্য-পুণ্য জন্ম-জ্যোতির্ময়।

নিবেদিতার মুখে শুধু বিপ্লবের কথা। আর সে বিপ্লব মোটেই অহিংস নয়।

কিন্তু তার সৌন্দর্যবোধও সজাগ। স্টেশন থেকে শহরে আসবার পথে ধর্মশালা দেখে উল্লসিত হয়ে উঠলেন : কী সুন্দর!

পরে আরেকটা দালান দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কী ওটা? কী কদাকার!

ওটা বরোদার কলেজ-দালান।

'মহিলার মাথায় কি ছিট আছে?' জনান্তিকে অরবিন্দকে জিজ্ঞেস করল কাশীরাও।

অরবিন্দ চুপ করে রইলেন। যার মাথায় বিপ্লবচিন্তা তাকে সুস্থতার প্রতিমূর্তি বলা যায় কী করে?

নিবেদিতাকে আলাদা বাসা দেওয়া হয়েছে।

বিদেশিনী মেয়ে অথচ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মুক্তির কথা ভাবছেন, আর সে মুক্তির উপায় যে সশস্ত্র বিপ্লব তাই প্রকাশ্য দিবালোকে যত্র-তত্র প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। নানা জায়গায় তাঁর ঘোরবার উদ্দেশ্য শুধু লোক-সংস্পর্শের জন্যে— কোথায় কতটুকু বিপ্লবের উত্তাপ সঞ্চারিত করতে পারেন তার চেষ্টায়। রাজপুতানার ঠাকুরদের কাছে গিয়েও বিদ্রোহ প্রচার করেছেন। বিদ্রোহ বা বিপ্লব সম্বন্ধে যখন কথা বলেন তখন জ্বলতে থাকেন। কথা এত সরল ও অনর্গল, মনে হয় যেন তাঁর আত্মা কথা কইছে। আর ভাষা এত প্রাণস্পর্শী!

'একেই বলে আগুন।' বললেন অরবিন্দ।

নিবেদিতা অরবিন্দের সঙ্গে নিভৃতে দেখা করতে এসেছেন।

'কালী দ্য মাদার' বলে নিবেদিতা যে একটি বই লিখেছেন তাতে বিপ্লবেরই ইঙ্গিত ছিল—সে বইয়ের প্রশংসা করেছিলেন অরবিন্দ।

'আপনাকে সোজাসুজি একটা কথা জিজ্ঞেস করি।' নিবেদিতা বললেন, 'আপনি কি শক্তির উপাসক?'

'রাজনৈতিক অর্থে নিশ্চয়ই।' বললেন অরবিন্দ, 'ভবানী ভারতীই তো আমার আরাধ্যা।'

দুজনের মধ্যে ভাবের মিল হয়ে গেল।

তারপর যখনই দুজনের দেখা হয় তখন শুধু রাজনীতি আর বিপ্লব নিয়ে আলোচনা। অরবিন্দ অনুভব করেন নিবেদিতার চোখের একাগ্রতায় এমন একটা ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পায় যা শুধু যোগাভ্যাসেই সম্ভব। মনে হয় নিবেদিতার উপলব্ধি হয়েছে, যেন সমাধিতে জন্মেছে তাঁর অধিকার।

কিন্তু যোগ বা আধ্যাত্মিকতা নিয়ে তাঁদের কোনো আলাপ হয়নি।

'কিন্তু যোগের উদ্দেশ্যেই তো নিবেদিতা ভারতে আসেন?' পরবর্তীকালে শিষ্য জিজ্ঞেস করলেন অরবিন্দকে।

'হ্যাঁ, কিন্তু বিবেকানন্দের কাজ হিসেবেই তিনি রাজনীতি গ্রহণ করেন। বিবেকানন্দ নিজেও রাজনৈতিক বিষয়ে ভাবতেন ও মাঝে-মাঝে বিপ্লবের প্রকোপে পড়তেন। একবার একটা vision দেখেন বিবেকানন্দ—অনেকটা মাণিকতলা বাগানের সঙ্গে তার মিল আছে। আশ্চর্যের বিষয় বলতে হবে, অনেক সন্ন্যাসীই ভারতের স্বাধীনতার কথা ভেবেছে। মহর্ষির যুবা শিষ্যরা অনেকে বিপ্লবী। যোগানন্দের গুরুও বিপ্লবের কথা ভেবেছেন, ঠাকুর দয়ানন্দও অন্যতম।'

'ব্রহ্মানন্দও ইংরেজদের তাড়িয়ে দেবার কথা বলতেন।'

'তাই নাকি?' শ্রীঅরবিন্দ বিস্মিত হলেন, 'জানতাম না তো।'

নিবেদিতা বললেন, 'মহারাজার সঙ্গে দেখা করতে যাব। আপনিও চলুন।'

অরবিন্দ আর নিবেদিতা দুজনেই গেলেন সন্দর্শনে। নিবেদিতা মহারাজাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি আপনার কর্তব্যকর্মে অবহেলা করছেন কেন?'

'অবহেলা করছি?' মহারাজা বিস্ময় মানলেন: 'কী কর্তব্যকর্ম?'

'আপনার কর্তব্য হচ্ছে দেশকে বিপ্লবের জন্যে তৈরি করা।'

মহারাজ থ বনে গেলেন।

'অন্তত যারা ইংরেজের বিরুদ্ধে বিপ্লবে নেমেছে তাদেরকে উচিত আপনার সাহায্য করা।'

'দেখি—'

'এ ব্যাপারে যদি বিশদ করে কিছু জানতে চান, মিস্টার ঘোষকে জিজ্ঞেস করবেন।' নিবেদিতা অরবিন্দকে ইঙ্গিত করলেন।

'বেশ, তাই হবে।' মহারাজা হাঁপ ছাড়লেন: 'আমার যা বক্তব্য তা মিস্টার ঘোষের মারফৎই জানাব আপনাকে।'

পাশ কাটালেন মহারাজা। কিন্তু ভেবে পেলেন না অরবিন্দ ঘোষ চুপ করে আছে কেন? সে কি তবে এই সব দলে আছে?

অরবিন্দকে ডেকে আর জিজ্ঞেস করেননি মহারাজা। নিবেদিতার প্রশ্নের উত্তর দিতেও নয়।

ঘটনা যে পথ নেবার তাই নিক। চুপ করে থাকাই সঙ্গত। স্তব্ধতাই চতুরতা।

ওদিকে কলকাতায় বিপ্লবী দলে যতীন আর বারীনের মধ্যে মনান্তর ঘটেছে।

সামরিক শিক্ষা পাবার দরুন যতীন নিয়মানুবর্তিতায় নির্মম প্রভু হয়ে দাঁড়িয়েছে —কোনো শৈথিল্যই সে বরদাস্ত করতে পারছে না। বারীনের কাছে নিয়মবশ্যতা প্রায় অসহ্য। যতীনের কঠোর শাসনে দলের অন্যান্য তরুণেরাও বিরক্ত। নালিশ গেল অরবিন্দের কাছে। বুঝলেন দলপতিত্ব নিয়ে ঝগড়া। তিনি ছুটি নিয়ে কলকাতায় গেলেন।

উঠলেন যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের বাড়িতে। বিদ্যাভূষণ সরকারি চাকুরে হলেও বিপ্লববাদের সমর্থক।

দুদলের বক্তব্য শুনলেন অরবিন্দ।

হেমচন্দ্র দাসও বারীনের পক্ষে। মিলিটারিতে ছিল বলে যতীন তার মেজাজও মিলিটারি করে তুলেছে—ভাবখানা এই, সে সেনাধ্যক্ষ আর সবাই তার আদেশের অনুচর।

তবু যতীনকে সরানো যাবে না, তাকে কাজ করতে দিতে হবে—রায় দিলেন অরবিন্দ। দলনেতা যতীন বা বারীন কেউ নয়, দলনেতা ব্যারিস্টার প্রমথ মিত্র। তাকে চালনা করবে পাঁচজনের এক কমিটি যার একজন নিবেদিতা।

প্রমথ মিত্র নিঃসন্দেহ একজন কাজের লোক, কিন্তু তারও যোগ-জীবন আছে। বিপিন পালের মত তারও আছে আধ্যাত্মিক আস্পৃহা এবং তারা দুজনেই বিজয়-কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য ও অনুরাগী। কিন্তু রাজনীতির মধ্যে ওসব যোগ-নীতি মেশায়নি প্রমথ।

তবু প্রমথর কাজ দারুণ সাফল্য নিয়ে এল, আর তার সঙ্গে, আগুনের সঙ্গে হাওয়ার মত, মিলল বারীনের 'যুগান্তর'। বাংলার হাজার-হাজার তরুণ যুবক বিপ্লবের মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। তারপর আইন-সভায় আসছে বঙ্গ-ভঙ্গ বিল। আর দেখতে হবে না। তখন পাঁচজনের কেন্দ্রীয় কমিটি থাকল বা না থাকল কিছু যায় আসে না। দলে-দলে অমিলের কথা নিয়েই কে আর মাথা ঘামায়।

যতীনের বাড়িতে আছেন অরবিন্দ, অবিনাশ ভট্টাচার্যকে বারীন নিয়ে এল। অরবিন্দ অবিনাশকে শপথবাক্য পাঠ করালেন। বললেন, 'সুন্দর সুযোগ এসে গিয়েছে। বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে জোরালো আন্দোলন চালাও। দেখবে এ আন্দোলনে অযুত কর্মী এসে যাবে।'

'নো কম্প্রোমাইজ'—না, কোনো আপোস নয়—অরবিন্দ একটি পুস্তিকা রচনা করলেন। কিন্তু কলকাতার কোনো প্রেসই তা ছাপতে রাজী হল না। অবিনাশ তখন তার নিজের বাড়িতে রাত্রে মারাঠা বিপ্লবী কুলকার্নিকে দিয়ে লেখাটা

কম্পোজ করিয়ে ছাপিয়ে নিল। কয়েক হাজার কপি ছাপানো হল। তারপর হল উদার বিতরণ।

ভবানী মন্দিরের প্রকল্প অনেক দেশব্রতীকেই মাতিয়ে তুলেছে। 'রাষ্ট্রমত' পত্রিকার সম্পাদক হরিভাও মোদক ও উকিল কাকাসাহেব পাতিলের সঙ্গেও এ নিয়ে অরবিন্দের আলোচনা হল। তাদের মতে প্রকল্পের ধর্মীয় দিকটা বাতিল করে দিয়ে জোর দেওয়া উচিত অস্ত্রসংগ্রহ আর বোমা তৈরির উপর। চারু দত্ত পরিহাস করে বললেন, 'বড্ড বেশি যোগের কথা বলা হয়েছে।'

অরবিন্দ মৃদু হেসে বললেন, 'গেরুয়া আলখাল্লাটা ইউনিফর্ম হিসেবে দেখ না কেন?'

॥ নয় ॥

মা ডাকছেন।

মন্দির-প্রকল্পের রচয়িতা শ্রীঅরবিন্দ ডাক দিলেন ব্রহ্মচারীদের : শোনো মায়ের ডাক শোনো। আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে প্রকাশিত হবার জন্যে তিনি প্রতীক্ষা করে আছেন। প্রতীক্ষা করে আছেন আমাদের পূজা পাবেন বলে। আমাদের অন্তরবাসী ঈশ্বর তমসে প্রচ্ছন্ন বলে মা নিষ্ক্রিয়। আবার মা নিষ্ক্রিয় বলে ঈশ্বরও নির্জীব, বিষন্ন—মায়ের সন্তানেরা কেন তখনো মাকে ডাকছে না সাহায্য করতে? যারা অন্তরে এই জাগরণ-চাঞ্চল্য অনুভব করছ তারা স্বার্থের এই কৃষ্ণ-যবনিকা ছুঁড়ে ফেলে দাও, অকর্মণ্যতার কারাপ্রাচীর চূর্ণ করো, এবং যে যে-ভাবে প্রেরিত হও সে সে-ভাবে মাকে পূজা করো—কেউ দেহ দিয়ে, কেউ বা মস্তিষ্ক দিগে, কেউ বা বাক্য দিয়ে, কেউ বা বিত্ত দিয়ে—কেউ বা প্রার্থনা দিয়ে। পশ্চাদপসরণ নেই, যারা আহূত হয়েছে অথচ মার কথা শোনেনি, আবির্ভাবের দিন কত না জানি তাদের উপর রোষ করবেন মা, আর যারা মার কথা শুনবে, মার আসার পথ কিছুটাও সহজ করে দেবে, দেখ না কী প্রসন্ন সুন্দর মুখে বরদাত্রী মা তাকাবেন তাদের দিকে।

পরিশিষ্টে ব্রহ্মচারীদের জন্যে নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করলেন অরবিন্দ। ব্রহ্মচারীরা চার বছর মার কাজে নিয়োজিত থাকবে। তারা মঠের সমস্ত আইন-শৃঙ্খলার অনুগত হবে, মেনে চলবে সমস্ত সংযম-নিয়ম, আচার-বিচার। শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা রক্ষা করবে প্রাণপণে। আত্মত্যাগ ও আত্মবিলুপ্তিই হবে

তাদের দক্ষিণ ও বাম বাহু।

করণীয় কাজ চার শ্রেণীতে বিভক্ত হল : জনসাধারণের জন্য, মধ্যবিত্তদের জন্য ধনীদের জন্য এবং দেশের জন্য। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করতে হবে করতে হবে চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যবস্থা, মধ্যবিত্তদের জন্যও গড়ে তুলতে হবে উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান আর ধনীদের মধ্যে জাগাতে হবে দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি—দানে ও সেবায় তৎপরতা। অর্থানুকূল্য ঘটলে ব্রহ্মচারীদের উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিদেশে পাঠানো হবে। কেউ-কেউ পদব্রজে বিদেশ ভ্রমণ করবে ভারতবর্ষকে বিদেশীদের চোখে আকর্ষণীয় করে তুলতে—আর্য আদর্শে তাদের অনুপ্রাণিত করে তুলতে। মায়ের আশীর্বাদ থেকে আমরা বঞ্চিত হব না।

ভবানী মন্দির বলতে মঠও হল না, মন্দিরও হল না। শুধু একটি পুস্তিকা হয়ে রইল।

তারই তেজ কী নিদারুণ!

দেশময় সমস্ত যুবশক্তি মেতে উঠল এই পরিকল্পনায়। কোথায় একটি আগ্নেয় ইঙ্গিত বুঝি প্রচ্ছন্ন আছে তারই তাপে প্রতি চিত্ত প্রদীপ্ত হয়ে উঠল।

ভবানী আর কে! ভবানীই ভারতমাতা।

দেয়ালে ভারতবর্ষের মানচিত্র টাঙানো। হ্যাঁ, এই ভারতমাতার প্রতিকৃতি ছাত্র মুন্সিকে বলছেন অরবিন্দ : ভারতের ভূখণ্ড যার শরীর, ভারতবাসীরা দেহের জীবকোষ, ভারতের সাহিত্য আর ভাষা যার স্মৃতি আর বাক্, সমগ্র জাতির সংস্কৃতি-নির্যাস যার জীবন্ত আত্মা—আর জাতির স্বাধীনতা আর সমৃদ্ধিতেই মা পরিত্রাণ।

'ভারতবর্ষকে জীবন্ত মাতৃরূপে দর্শন করো।' আবার বলছেন অরবিন্দ 'এই মাতৃমূর্তি ধ্যান করো আর নববিধা ভক্তির মাধ্যমে তাকে আরাধনা করো।'

ভবানী মন্দির পুস্তিকায় রাজনীতির নাম-গন্ধ নেই। অথচ সমস্ত ইংরেজ পুলিস এর মধ্যে ভয়ঙ্কর এক বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ আবিষ্কার করে বসল। বেদান্তে ছদ্মবেশে সমস্ত বন্ধনের অন্ত ঘটানো।

উনিশশো পাঁচ সালের বিশে জুলাই বঙ্গবিভাগ আইন পাস হল। সঙ্গে সঙ্গে ভারত জুড়ে, বিশেষত বাংলায়, শুরু হয়ে গেল উত্তাল আন্দোলন। সাতুই অগাস্ট কলকাতার টাউন হলে এক বিরাট সভায় বিলিতি পণ্যবর্জন বা বয়কটের প্রস্তাব গৃহীত হল। অরবিন্দ বললেন, বাঙালীর জীবনে নতুন এক চেতনা জন্মলাভ করল দেড়শো বছরের ঘুমঘোর থেকে জাগল এবার বাঙালী।

সেপ্টেম্বরে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বরোদায়ও সভা হল। অরবিন্দ তখন বরোদা লেজের প্রিন্সিপ্যাল, মোট মাইনে সাতশো দশ টাকা। সে সভায় তিনি পস্থিত ছিলেন, কিন্তু নীরব ছিলেন। তখনো তিনি মহারাজার চাকরিতে, ইংরেজ রকারের বিরোধিতা করে কিছু বলা তাঁকে সাজে না।

উনিশশো পাঁচের ষোলই অক্টোবর বঙ্গবিভাগ বাস্তবায়িত হল—পূর্ববঙ্গ গেল াসামে, পশ্চিমবঙ্গ বিহার-উড়িষ্যায়।

অরবিন্দ লিখলেন : 'ঈশ্বরের লগ্ন'।

'ইতিহাসে এমন মুহূর্ত আসে যখন মানুষের মধ্যে আত্মার জাগরণ হয় এবং ামাদের সত্তার সমুদ্রে ঈশ্বরের নিশ্বাস উত্তাল আলোড়ন তোলে—যখন সামান্ত কটু প্রয়াসেই বিরাট ফসল ফলে ও ভবিতব্য তার মোড ঘোরায়।

সে মানুষ ও জাতি হতভাগ্য যে ঐশ মুহূর্ত আসবার পরও নিক্রিয় থাকে, অভ্যর্থনার জন্যে তেল-সলতের বাতি তৈরী করে রাখেনি বলে তা জ্বালতে ারে না, বা জেগে থেকেও ডাক শোনবার জন্যে যারা কান খাড়া করে নেই । যারা কানে দিব্যি তুলো গুঁজে রয়েছে।

তারা আরো ধিক্‌ৃত যারা জেগেছিল, শুনেছিল, বলসঞ্চয় করেও রেখেছিল কন্তু যারা সেই শক্তি প্রয়োগ করেনি কিংবা যারা সেই শক্তি অপচয় করেছে।

সেই ঐশ্বরিক প্রহরে আত্মবঞ্চনা আর কপটতা থেকে প্রাণকে মুক্ত করো, ারিচ্ছন্ন রাখো, যাতে নিজের সত্তার গভীরে সোজাসুজি তাকাতে পারো, ারিষ্কার শুনতে পারো সেই আহ্বান-মন্ত্র। যে পবিত্র সে-ই তো পারে সমস্ত ভয়কে ঝেড়ে ফেলতে। ভয়ঙ্কর সেই প্রহর—বাত্যা, ঘূর্ণাবর্ত আর বহ্নি—শ্বরের ক্রুদ্ধ পদপাত। কিন্তু যে তার মুখোমুখি হতে পারে নিজের সত্য শ্বাসের উপর ভর করে, সে-ই দাঁড়ায়—আর যদি সে পড়েও সে আবার ওঠে -আর যদি সে প্রভঞ্জনের পাখায় চড়েও অদৃশ্য হয়, সে আবার ফেরে। তামাদের কানের কাছে তোমাদের পার্থিব বুদ্ধিকে ফিসফিস করতে দিও না—কননা এ লগ্ন অপ্রত্যাশিত, এ লগ্ন আকস্মিক।'

থানা শহরে বন্ধু চারু দত্তের বাড়িতে তার আত্মীয় সুবোধ মল্লিকের সঙ্গে রবিন্দের আলাপ হল। আলাপ গাঢ় হল বন্ধুতায়। বন্ধুতা ঘনীভূত হল প্রবমননে।

উনিশশো পাঁচের তিরিশে অগাস্ট অরবিন্দ তাঁর স্ত্রীকে চিঠি লিখছেন। ই চিঠিটি অরবিন্দ-জীবনের অরবিন্দ-ভাবনার একটি নিখুঁত ভাষ্য!

অন্তরঙ্গ গোপনীয় চিঠি। বাইরে প্রকাশের বা প্রচারের উদ্দেশে এ লেখা নয়। উনিশশো আট সালে বাড়িতে খানাতল্লাসির সময় পুলিস এই চিঠিটি— সঙ্গে আরো কটি চিঠি—পাকড়াও করে, আলিপুর বোমার মামলায় দাখিল করে আদালতে। আদালত পবিত্র হয়ে যায়।

'প্রিয়তমা মৃণালিনী,' চিঠি লিখছেন অরবিন্দ: 'তোমার ২৪এ অগাস্টের পত্র পাইলাম। তোমার বাপ-মার আবার সেই দুঃখ হইয়াছে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, কোন ছেলেটি পরলোকে গিয়াছে তাহা তুমি লিখ নাই। দুঃখ হলে বা কি হয়! সংসারে সুখের অন্বেষণে গেলেই সেই সুখের মধ্যেই দুঃখ দেখা যায়, দুঃখ সর্বদা সুখকে জড়াইয়া থাকে, এই নিয়ম যে পুত্র-কামনার সম্বন্ধেই ঘটে তাহা নহে, সব সাংসারিক কামনার ফল এই। ধীর চিত্তে সব সুখ দুঃখ ভগবানের চরণে অর্পণ করাই মানুষের একমাত্র উপায়।'

দুঃখ তো কারুরই লক্ষ্য নয়, সুখের পথেই দুঃখের আনাগোনা। যে আলোতে চোখ মেলে থাকবার জন্যেই মানুষের নিয়ত প্রয়াস, সে আলো থেকে চোখকে বঞ্চিত করেই মানুষের আবার নিদ্রা—নিদ্রার জন্যেই নিদ্রা নয়, জাগরণের জন্যে নিদ্রা। মহানিদ্রাও মহাজাগরণের জন্যে।

তারপর স্বামী-স্ত্রীতে টাকা-পয়সার মিটমাট। এবার থেকে অরবিন্দ মৃণালিনীকে মাসে দশ-পনেরো না পাঠিয়ে কুড়ি টাকাই পাঠাবেন। এ মাসের বাকি টাকাটা পরের মাসে যাবে।

তারপর: 'এখন সেই কথাটি বলি।'

কোন কথা?

'তুমি বোধ হয় এর মধ্যে টের পেয়েছ, যাহার ভাগ্যের সঙ্গে তোমার ভাগ জড়িত, সে বড় বিচিত্র ধরনের লোক। এই দেশে আজকালকার লোকের যেম মনের ভাব, জীবনের উদ্দেশ্য, কর্মের ক্ষেত্র, আমার কিন্তু তেমন নয়। সব বিষয়ে ভিন্ন, অসাধারণ। সামান্য লোক অসাধারণ মত, অসাধারণ চেষ্টা, অসাধার উচ্চ আশাকে যাহা বলে তাহা বোধ হয় তুমি জান। এই সকল ভাবকে পাগলা বলে, তবে পাগলের কর্মক্ষেত্রে সফলতা হইলে ওকে পাগল না বলিয়া প্রতিভাবা মহাপুরুষ বলে। কিন্তু কজনের চেষ্টা সফল হয়? সহস্র লোকের মধ্যে দশজ অসাধারণ, সেই দশজনের মধ্যে একজন কৃতকার্য হয়। আমার কর্মক্ষেত্রে সফলতা দূরের কথা, সম্পূর্ণভাবে কর্মক্ষেত্রে অবতরণও করিতে পারি নাই, অতএ আমাকে পাগলই বুঝিবে। পাগলের হাতে পড়া স্ত্রীলোকের পক্ষে বড় অমঙ্গল

কারণ স্ত্রী-জাতির সব আশা সাংসারিক সুখ-দুঃখেই আবদ্ধ। পাগল তাহার স্ত্রীকে সুখ দিবে না, দুঃখই দেয়।'

হিন্দু ধর্মের প্রণেতারা কী বলছেন এ ব্যাপারে? সংসারে যারা অসাধারণ, অসামান্য চরিত্র ও চেষ্টার দৃষ্টান্তস্থল তাদের স্ত্রীদের কী উপায় হবে? ঋষিরা কী উপদেশ দিলেন? লিখছেন অরবিন্দ: 'ঋষিরা স্ত্রীজাতিকে বললেন, পতিঃ পরমো গুরুঃ এই মন্ত্রই একমাত্র মন্ত্র বুঝিবে। স্ত্রী স্বামীর সহধর্মিণী, তিনি যে-কার্যই স্বধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিবেন, তাহাতে সাহায্য দিবে, মন্ত্রণা দিবে, উৎসাহ দিবে, তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মানিবে, তাঁহারই সুখে সুখ, তাঁহারই দুঃখে দুঃখ করিবে। কার্য নির্বাচন করা পুরুষের অধিকার, সাহায্য ও উৎসাহ দেওয়া স্ত্রীর অধিকার।'

তারপরেই জিজ্ঞাসা: তুমি কোন পথ ধরবে? হিন্দু ধর্মের পথ না নতুন সভ্য ধর্মের পথ? মৃণালিনী যে এক পাগলকে বিয়ে করেছে সে তার পূর্বজন্মের কর্মফল। তাই ভাগ্যের সঙ্গে একটা মীমাংসা করে নেওয়া ভালো। সেটা কেমনধারা মীমাংসা? মৃণালিনীও কি পাঁচজনের মতে সায় দিয়ে অরবিন্দকে পাগল বলে উড়িয়ে দেবে? পাগলকে পাগলামি থেকে কে নিরস্ত করবে? মৃণালিনীও পারবে না—তার চেয়ে অরবিন্দের স্বভাব বলবত্তর। তবে কি মৃণালিনী গৃহকোণে বসে কাঁদবে, না তার স্বামীর সঙ্গে ছুটবে পাগলের উপযুক্ত পাগলী হবে, যেমন অন্ধ রাজার মহিষী গান্ধারী দু চোখে বস্ত্র বেঁধে অন্ধ সেজেছিল?

অরবিন্দের বিশ্বাস হাজার ব্রাহ্মস্কুলে পড়ুক, মৃণালিনী হিন্দুর ঘরের মেয়ে, হিন্দু পূর্বপুরুষের রক্ত তার শরীরে, সে সহধর্মিণীর পথই ধরবে নিঃসন্দেহ।

তারপর অরবিন্দ লিখছেন তাঁর তিন পাগলামির কথা:

'আমার তিনটি পাগলামি আছে। প্রথম পাগলামি এই, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান যে গুণ, যে প্রতিভা, যে উচ্চ শিক্ষা ও বিদ্যা, যে ধন দিয়াছেন, সবই ভগবানের, যাহা পরিবারের ভরণ-পোষণে লাগে আর যাহা নিতান্ত আবশ্যকীয় তাহাই নিজের জন্য খরচ করিবার অধিকার, যাহা বাকি রহিল, ভগবানকে ফেরৎ দেওয়া উচিত। আমি যদি সবই নিজের জন্য, সুখের জন্য, বিলাসের জন্য খরচ করি, তাহা হইলে আমি চোর। হিন্দুশাস্ত্রে বলে যে ভগবানের নিকট ধন লইয়া ভগবানকে দেয় না, সে চোর। এ পর্যন্ত ভগবানকে দুই আনা দিয়া চৌদ্দ আনা নিজের সুখে খরচ করিয়া হিসাবটা চুকাইয়া সাংসারিক সুখে মত্ত রহিয়াছি। জীবনের অর্ধাংশটা বৃথা গেল, পশুও নিজের ও নিজের পরিবারের উদর পুরিয়া

কৃতার্থ হয়।'

অরবিন্দ বুঝতে পেরেছেন ধর্মকার্যে যে ব্যয় করা তাই ভগবানের জন্য ব্যয় করা। যে টাকা ভাই-বোনকে দিয়েছেন তার জন্যে তাঁর কোনো গ্লানিবোধ নেই, সে আশ্রিত-সেবা, আশ্রিতকে রক্ষা করা মহাধর্ম, কিন্তু শুধু ভাই-বোনকে দিলেই কি হিসেব মেটে ? এই দুর্দিনে সমস্ত দেশ অরবিন্দের কাছে আশ্রিত—ত্রিশ কোটি ভাইবোনে ভরা দেশ—তাদের মধ্যে কেউ মরছে অনাহারে, কেউ-কেউ নানা কষ্টে ক্লেশে জর্জর—তাদের কোনো হিত করতে হবে না ?

এ ব্যাপারে মৃণালিনী কি অরবিন্দের পাশে দাঁড়াবে না ? সামান্য লোকের মত খেয়ে-পরে থেকে সমস্ত উদ্বৃত্ত ভগবানকে দেব—মৃণালিনী যদি এই ত্যাগ-স্বীকারে সম্মত হয় তা হলেই অরবিন্দ কৃতকাম।

'তুমি বলেছিলে, আমার কোনো উন্নতি হল না, এই একটি উন্নতির পথ দেখিয়ে দিলাম—যাবে কি এ পথে ?'

তারপর দ্বিতীয় পাগলামির কথা বললেন অরবিন্দ :

'দ্বিতীয় পাগলামি সম্প্রতিই ঘাড়ে চেপেছে, পাগলামিটা এই যে-কোনমতে ভগবানের সাক্ষাৎ-দর্শন লাভ করিতে হইবে। আজকালকার ধর্ম, ভগবানের নাম কথায়-কথায় মুখে নেওয়া, সকলের সমক্ষে প্রার্থনা করা, লোককে দেখানো আমি কি ধার্মিক। তাহা আমি চাই না। ঈশ্বর যদি থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিবার, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন-না-কোন পথ থাকিবে, সে পথ যতই দুর্গম হোক, আমি সে পথে যাইবার দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছি। হিন্দুধর্মে বলে, নিজের শরীরের নিজের মনের মধ্যে সেই পথ আছে। যাইবার নিয়ম দেখাইয়া দিয়াছে, আমি সেই সকল পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি, আমার ইচ্ছা তোমাকেও সে পথে নিয়া যাই—'

অরবিন্দ দৃঢ়স্বরে বললেন, আমি সাধনপথে যাত্রা শুরু করে দিয়েছি। দৃপ্ততর ঘোষণা করলেন : আমি ভগবানের সামনে মুখোমুখি দাঁড়াতে চাই, তাঁকে দেখতে চাই সোজাসুজি—এবং সেই উপলব্ধির পথ কী যখন জেনেছি তখন আর নিবৃত্তি নেই। তুমি আসবে আমার সঙ্গে ?

তৃতীয় পাগলামি দেশ। আর এই দেশ অরবিন্দের কাছে মাটি নয়, মৃন্ময়ী মাতৃমূর্তি।

'আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার জন্য আমার গায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না,

জ্ঞানের বল। ক্ষত্রতেজ একমাত্র তেজ নহে, ব্রহ্মতেজও আছে, সেই তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাব নূতন নহে, আজকালকার নহে, এই ভাব নিয়া আমি জন্মিয়াছিলাম, এই ভাব আমার মজ্জাগত, ভগবান এই মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন।'

এখন মৃণালিনী কী করবে? সে কি আধুনিক কালের শিষ্যা হয়ে সাহেব-পূজামন্ত্র জপ করবে? উদাসীন থেকে স্বামীর শক্তিকে খর্ব করবে না সহানুভূতি দেখিয়ে তার উৎসাহবর্ধন করবে?

'তুমি বলিবে,' লিখছেন অরবিন্দ: 'এই সব মহৎকর্মে আমার মত সামান্য মেয়ে কি করিতে পারে, আমার মনের বল নাই, বুদ্ধি নাই, ওই সব কথা ভাবিতে ভয় করে। তাহার সহজ উপায় আছে, ভগবানের আশ্রয় নাও, ঈশ্বর-প্রাপ্তির পথে একবার প্রবেশ কর, তোমার যে-যে অভাব আছে তিনি শীঘ্র পূরণ করিবেন, যে ভগবানের নিকট আশ্রয় লইয়াছে, ভয় তাহাকে ক্রমে-ক্রমে ছাড়িয়া দেয়। আর আমার উপর যদি বিশ্বাস করিতে পার, দশজনের কথা না শুনিয়া আমারই কথা যদি শোন, আমি তোমাকে আমারই বল দিতে পারি, তাহাতে আমার বলের হানি না হইয়া বৃদ্ধি হইবে। আমি বলি, স্ত্রী স্বামীর শক্তি, মানে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে নিজের প্রতিমূর্তি দেখিয়া তাহার কাছে নিজের মহৎ আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি পাইয়া দ্বিগুণ শক্তিলাভ করে।'

মৃণালিনী কি অরবিন্দের আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি হবে না? শুধু নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যেই মনোযোগী থাকাকে কি উন্নতি বলে? পরোপকার ও স্বার্থত্যাগের দিকে তো তার টান আছে, যা তার অভাব তা শুধু মনের জোরের। শুধু ঈশ্বর-উপাসনায়ই এই জোর আসবে। জগতে ভগবানের কাজ করতেই আসা—মৃণালিনী যেন পিছিয়ে না থাকে।

'এটাই ছিল আমার গুপ্ত কথা।' অরবিন্দ চিঠি শেষ করছেন এই ভাবে: 'কারুর কাছে প্রকাশ না করিয়া নিজের মনে ধীর চিত্তে এই সব চিন্তা কর, এতে ভয় করিবার কিছু নাই, তবে চিন্তা করিবার অনেক জিনিস আছে। প্রথমে আর কিছু করিতে হইবে না, কেবল রোজ আধ ঘণ্টা ভগবানকে ধ্যান করিতে হয়, তাঁর কাছে প্রার্থনারূপে বলবতী ইচ্ছা প্রকাশ করিতে হয়। মন ক্রমে-ক্রমে তৈয়ারী হইবে। তাঁর কাছে সর্বদা এই প্রার্থনা করিতে হয়, আমি যেন স্বামীর জীবন, উদ্দেশ্য ও ঈশ্বর-প্রাপ্তির পথে ব্যাঘাত না করিয়া সর্বদা সহায় হই, সাধনভূত হই। ইতি—তোমার—'

উনিশশো পাঁচের একুশে অক্টোবর মৃণালিনীকে লেখা আরেকখানি চিঠি পাওয়া যায়—সেখানে আছে বারীনের অসুখের সংবাদ, আর, 'এইখানে শেষ করছি, এখুনি আমাকে ধ্যানে বসতে হবে।'

মাধব রাওকে সামরিক প্রশিক্ষণের জন্যে ইউরোপে পাঠিয়েছেন অরবিন্দ—বোমা তৈরির পদ্ধতি-প্রণালী শিখে আসতে, যদি পারে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে আনতে।

মৃণালিনীকে লিখছেন অরবিন্দ . 'মাধব রাওকে টাকা পাঠাতে হবে। তাকে বিশেষ কাজে বিলেতে পাঠানো হয়েছে। স্বদেশী আন্দোলন চালাতে আমাকে বিস্তর খরচ করতে হচ্ছে। এখন যে এক বৃহৎ কাজে নামছি তার জন্য প্রভূত অর্থ দরকার।'

অরবিন্দের আর বুঝি বরোদার চাকরি ভালো লাগছে না। তিনি এখন রাজনীতির দিকে ঝুঁকছেন।

উনিশশো পাঁচের ডিসেম্বরে বেনারসে কংগ্রেস বসেছে। অরবিন্দ গেছেন—বাক্-বিতণ্ডায় যোগ দিতে নয়, শুধু উপস্থিত থাকতে। সভাপতি গোপালকৃষ্ণ গোখেল আর বিষয়—প্রজ্বলন্ত বিষয়—বঙ্গভঙ্গ।

বাংলার উপর কী নির্মম আঘাত হেনেছে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট—কী ক্রুর, কী বর্বর—জ্বালাময় ভাষণ দিলেন গোখেল, আর দেশময় যে আলোড়ন জেগেছে তা যে আমাদের জাতির ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়, ধর্মমতনির্বিশেষে সমস্ত জাতি যে এবার একতাবদ্ধ হবে—গাইলেন তারও প্রশস্তি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দাবি কী রাখলেন সরকারের কাছে? দাবি রাখলেন, ভারতকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে রেখেই স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হোক, আর সে শাসনকর্তৃত্বও ধীরে-ধীরে, ক্রমান্বয়ে। আর বিলিতি পণ্যবর্জনও গ্রাহ্য হল না।

'অসহ্য।' বালগঙ্গাধর তিলক অরবিন্দকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন মণ্ডপ থেকে।

॥ দশ ॥

বেনারস থেকে অরবিন্দ বরোদায় ফিরলেন।

এক মাস পরে দু মাসের ছুটি নিলেন কলেজ থেকে। সঙ্গে গ্রীষ্মের ছুটিটাও যুক্ত করলেন। এলেন বাংলায়।

বাংলাই জাতির ভরসা। বাংলাই দেশের পথ-প্রদীপ।

মহামতি গোখেলই তো বলেছেন, বাংলা আজ যা ভাবে আগামীকাল তাই বাকি ভারতবর্ষের ভাবনা।*

চোদ্দই এপ্রিল বরিশালে প্রাদেশিক সম্মিলন হচ্ছে, অরবিন্দ গেলেন যোগ দিতে। বাংলা তখন দেশপ্রেমের প্লাবনে উত্তাল—তার কণ্ঠে প্রাণপ্রদ প্রার্থনার মন্ত্র বন্দেমাতরম। মাকে বন্দনা করি। আর তবে কে পায়! কে আটকায়!

বঙ্গভঙ্গের পর পূর্ববঙ্গ-আসামের ছোটলাট তখন ব্যামফিলড ফুলার। দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজ্যশাসন করছেন। হুকুম জারি করলেন প্রকাশ্যে পথেঘাটে বন্দেমাতরম বলা যাবে না। না, কোনো সভাতেও নয়।

সেই অনুসারে বরিশালের ম্যাজিস্ট্রেট সর্ত আরোপ করলেন—প্রাদেশিক সম্মিলন হতে পারবে যদি বন্দেমাতরম ধ্বনি না তোলো। ঐ অসুরধ্বংসী মন্ত্রটা আমাদের শ্রবর্ণে না শুনতে হয়।

নেতারা সর্ত মানতে রাজী হলেন না। তাঁরা স্থির করলেন সরকারী অনুমতি ছাড়াই সভা করবেন। মিছিল করে সবাই এগিয়ে চললেন মণ্ডপের দিকে। পুরোভাগে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, বিপিনচন্দ্র পাল এবং অরবিন্দ, পিছনে জেলা-প্রতিনিধি ও স্বেচ্ছাসেবকের দল—স্বেচ্ছাসেবকের বাহুতে বা বুকে বন্দেমাতরম ব্যাজ আঁটা। নীরব বন্দেমাতরম বুঝি মুখর বন্দেমাতরমের চেয়েও বেশি উচ্চারিত।

অগ্রগামীদের বাদ দিয়ে পুলিস হঠাৎ পশ্চাদবর্তীদের উপর লাঠি চালাল। নীরব মন্ত্র এবার সরব স্তোত্রে উর্ধ্বায়িত হল—বন্দেমাতরম। স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে বালক চিত্তরঞ্জন গুহ রক্তাক্ত উদাহরণ হয়ে রইল। লাঠির ঘায়ে মাথা ফেটে গিয়েছে তবু ধ্বনি সে ছাড়ছে না—বন্দেমাতরম। কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে এলেও ঘোষণা ম্লান হচ্ছে না। কিসের ঘোষণা? আমি মায়ের সন্তান, অভয়ার

* বোম্বাই-এর 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দ কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখেন বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে। তারই মধ্যে এক জায়গায় তিনি লিখেছিলেন: "What Bengal thinks to-morrow, India will be thinking to-morrow week"; এই কথাটাই লোকে গোখেলের মুখে বসিয়ে দিয়েছে এই প্রচলিত রূপান্তরে: What Bengal thinks to-day India will think to-morrow।

সন্তান—আমি মাকে বন্দনা করি—বন্দেমাতরম।

নিরস্ত্র নিরুপদ্রব মিছিলের উপর ব্রিটিশ শাসকের এই প্রথম হিংস্র আক্রমণ আর মার খেয়েও মাকে ডাকতে ছাড়ব না বাঙালীর এই প্রথম সত্যাগ্রহ। প্রথম অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন।

আজ বাঙালী যা করে, বাকি ভারতবর্ষ কাল তাই অনুসরণ করে।

বরিশালের নাম হল—'বরিশাল পুণ্যে বিশাল হলো লাঠির ঘায়ে।'

সন্দেহ কী, এই ইংরেজ শাসনের অবসানের সূচনা হল। অরবিন্দ বললেন, বঙ্গভঙ্গ অভিশাপের ছদ্মবেশে আশীর্বাদ। মায়ের আশীর্বাদ।

অধিবেশনের সভাপতি ব্যারিস্টার আবদুল রসুল। তাকে পুলিস বললে সভা করতে অনুমতি দিতে পারি যদি প্রতিশ্রুতি দেন যে সভাস্তে ঐ বন্দেমাতরম-টা বলবেন না।

রসুল বললেন, সভা সভা, তার মধ্যে কোনো প্রতিশ্রুতি থাকতে পারে না।

পুলিস জোর করে সভা ভেঙে দিল।

একটা ধ্বনিকে এত ভয়! মন্ত্রের মধ্যে যে ব্রহ্মতেজ আছে তাই অসুরদের মর্মশূল।

কিন্তু এই ধ্বনি কে বন্ধ করবে? রাস্তায় এই ধ্বনি তোলা বারণ—কিন্তু বাড়ির বারান্দায়? বারান্দা তো আর রাস্তা নয়। তাই রাস্তায় পুলিস দেখলে যুবকেরা রাস্তা ছেড়ে আশেপাশের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে আর চেঁচিয়ে বলছে, বন্দেমাতরম। ধরতে-ছুঁতে পাবে না কেননা আইন-ভঙ্গ হচ্ছে না। কোনো অভিধানেই বারান্দাকে রাস্তা বলে না।

তখন এই ধ্বনি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। শবযাত্রীদের কণ্ঠেও এই বোল—বন্দেমাতরম। এটি শ্মশানঘাট। এখানে রাস্তার আইন খাটবে না।

মরেছে কে?

দাসত্ব।

দাহ হচ্ছে কার?

পরাধীনতার।

বরিশালের সভা-ভঙ্গের পর অরবিন্দ বিপিন পালের সঙ্গে পূর্ববঙ্গে গেলেন। সফরের উদ্দেশ্য পূর্ববঙ্গকে স্বচক্ষে দেখা এবং প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে জনসাধারণের মধ্যে তাঁর বিপ্লবচিন্তা সঞ্চারিত করে দেওয়া। হলও তাই। জায়গায়-জায়গায়

বিরাট জনতা সভায় জমায়েত হল আর অরবিন্দ তাঁর জাগৃতি-মন্ত্রে তাদের উদ্বুদ্ধ করে তুললেন। সঙ্গে আছেন বিপিন পাল, সন্দেহ নেই, তাঁর বক্তৃতা ভিতরের বস্তু।

পরবর্তীকালে শ্রীঅরবিন্দ বলছেন: 'বিপিন পাল ছিলেন মস্ত বক্তা; সে সময় তাঁর বক্তৃতায় আগুন জ্বলত। তাকে এক ধরনের অবতরণই বলতে পারো। পরে তাঁর সেই বাকশক্তি হ্রাস পায়। আমার মনে আছে তিনি কখনো 'স্বাধীনতা' কথাটা ব্যবহার করতেন না, সর্বদা বলতেন, 'ব্রিটিশ প্রভুত্বহীন স্বায়ত্তশাসন'। বরিশাল কনফারেন্সের পর যখন চাষীরা যোগ দিল তখন চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার লোক হাজির হত বিপিন পালের বক্তৃতা শুনতে। তাঁর সাথে সুরেন ব্যানার্জির তুলনা হয় না। সুরেন ব্যানার্জি এ রকম কোনো প্রভাব দেখাতে পারেননি, কিন্তু বলেছি তো, পরে বিপিন পাল এই ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন।'

বারীন এসে বললে, একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করা যাক।

বাংলায় তো?

হ্যাঁ, বাংলায়।

নাম?

যুগান্তর।

কী থাকবে তাতে?

সরাসরি বিদ্রোহ। ব্রিটিশ শাসনের সমূল উচ্ছেদ। বারীন তাকাল অরবিন্দের দিকে: তুমি রাজী আছ?

সম্পূর্ণ। সায় দিলেন অরবিন্দ।

উনিশশো ছ-এর তেরোই মার্চ 'যুগান্তর'-এর পত্তন হল।

বারীন ছাড়া সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে থাকলেন অবিনাশ ভট্টাচার্য আর বিবেকানন্দের ছোট ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। আরো দুজন সহযোগী লেখক জুটল—দেবব্রত বসু আর উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। গোড়ার দিকের কিছু সম্পাদকীয় প্রবন্ধ অরবিন্দ নিজে লিখতেন আর বরাবরই রাখলেন একটি অদৃশ্য কর্তৃত্বের সম্পর্ক।

কানাই ধর লেনে যুগান্তর অফিস। একদিন পুলিস এল সার্চ করতে—এ পত্রিকার সম্পাদক কে? পত্রিকায় তখন সম্পাদকের নাম ঘোষণা করবার আইন ছিল না, তাই পুলিস ফাঁপরে পড়ল—কে সম্পাদক?

আমি সম্পাদক। ভূপেন দত্ত নিজের থেকে এগিয়ে এলেন।

পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে রাজদ্রোহ প্রচার করা হয়েছে। আপনাকে তাই গ্রেপ্তার করতে এসেছি।

সুসংবাদ। করুন গ্রেপ্তার।

পুলিস তার কাজ করল। বললে, 'এখন চলুন, কোর্টে বিচার হবে।'

অরবিন্দ কড়া নির্দেশ পাঠালেন : ব্রিটিশ কোর্টে কিছুতেই আত্মপক্ষ সমর্থন করতে যাবে না, কেননা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে আমরা বৈধ বলে স্বীকার করি না। আমাদের বিচার করতে তাদের কোনো অধিকার নেই।

যা শাস্তি হোক হবে, ভূপেন দত্ত আদালতে কোনো সাফাই দিল না। নীরব হয়ে রইল। আমরা ব্রিটিশ কোর্ট মানি না, বিচারে তার কোনো এক্তিয়ার নেই।

যুগান্তর-এর কাটতি গোড়া থেকেই বাডতির মুখে, এখন এ ঘটনার পর তা দুর্দান্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠল। এক বছরেই এক হাজার থেকে দশ হাজার গ্রাহক। একটা প্রেস কুলিয়ে উঠতে পারছে না। একাধিক প্রেসের শরণ নিতে হল। সমস্ত দেশ তখন বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছে, হাত বাডিয়েছে স্বাধীনতার জন্যে। সে ফল বুঝি এখন নাগালের মধ্যে।

এত যেখানে কাটতি সেখানে আয়ের অঙ্ক না জানি কত পরিস্ফীত। সবাই তখন বিদ্রোহে মশগুল, আয়ব্যয়ের কড়া-ক্রান্তি নিয়ে কে মাথা ঘামায়। এরা তো আর অর্থোপার্জনের জন্যে কাগজ বের করছে না, এ কাগজ শুধু জনসাধারণকে বিপ্লবে মাতিয়ে দিতে, তাতিয়ে রাখতে। গেরিলা-যুদ্ধের কৌশল শেখাতে।

দেবব্রত বসুর সঙ্গে খুলনায় বেড়াতে গেলেন অরবিন্দ।

সাধারণ লোকের মধ্যে তখন কী উদ্দীপনা! সবাই যেন তখন নতুন প্রত্যয়ে এসে আশ্রয় পেয়েছে। অরবিন্দের মধ্যে পেয়েছে যেন নতুন আশ্বাস। জীবনের নতুন অর্থ।

আগে-আগে একটা সাহেব দেখলে সবাই কেমন কুঁকড়ে থাকত, পালাত লেজ গুটিয়ে। সে চটকলের সাহেবই হোক বা হোক কোনো জাহাজের মাঝিমাল্লা। কিন্তু এখন আর পালাচ্ছে না কেউ, বিশীর্ণ হয়ে যাচ্ছে না। দরকার হলে দৃপ্ত সাহসে দাঁড়াতে পারছে মুখোমুখি। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারছে।

কী এক অনপনেয় নৈরাশ্য সকলকে আচ্ছন্ন করেছিল। ক্রমশই সরে যাচ্ছে সেই অন্ধ তমসা। সেই জড় সমাধি। আলস্যকে নিয়ে যাবেন অভ্যুদয়ে, তার জন্যেই তো অরবিন্দ।

খুলনায় অরবিন্দের কী খাতির! অরবিন্দ একজন রাজনৈতিক নেতা সে জন্যে নয়, অরবিন্দ যে ডাক্তার কে.ডি. ঘোষের ছেলে তার জন্যে।

'ওরে আমাদের সেই ডাক্তার সাহাবের ছেলে!' অন্তরঙ্গ শ্রদ্ধায় ও সৌহার্দ্যে একে অন্যে বলাবলি করে।

ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ শুধু জনপ্রিয় ছিলেন না, ছিলেন সকলের প্রিয়জন। ভালোবাসার অর্থ হচ্ছে সেবার মাধুরী। সবাইকে এই সেবামাধুর্য বিতরণ করেছেন। শুধু চিকিৎসা, সেবা। এমন কোনো লোক নেই যে ডাক্তার সাহেবের কাছে প্রার্থনা করে কিছু অন্ততঃ পায়নি। কিংবা রিক্ত হাতে গিয়ে রিক্ত হাতেই ফিরে এসেছে।

সেই ডাক্তার সাহেবের ছেলে এসেছে! তাকে রাজকীয় শ্রদ্ধায় আপ্যায়ন করো।

তার সঙ্গে উনি কে?

সুহৃদের ভাষায় কী চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে দেবব্রত। কোনো ভাষা বা ভাবের আড়ম্বর নয়, তপ্ত প্রাণের সহজ সত্য কথা। আবেগ যেমন আছে তেমনি আছে যুক্তি, দাহ যেমন আছে তেমনি আছে উজ্জ্বলতা। আগুন যত বেশি জ্বলে ততই তো আলো হবে। সবাই দেবব্রতের ভাষণে মুগ্ধ।

কিন্তু সে তখন নিরামিষাশী, আছে শুধু ফল খেয়ে। সুতরাং ভোজনের আপ্যায়নটা একমাত্র অরবিন্দকে।

কী বিরাট আয়োজন করেছে! প্রকাণ্ড থালার ধারে ধারে সাত থাক বাটি সাজানো, বিচিত্র ব্যঞ্জনের সমারোহ। হাত বাড়িয়ে সবগুলোর নাগাল পান অরবিন্দের এমন সাধ্য নেই, যা বা সীমিত নাগালের মধ্যে পাচ্ছেন তা-ও অল্পই মাত্র মুখে তুলছেন। প্রীতি বস্তুর মধ্যে নয়, প্রীতি আস্বাদে।

জুন মাসে বরোদায় আবার ফিরলেন অরবিন্দ। গেলেন চান্দোদে, কাছেই কার্নালি। সেখানে শেষবারের মত ব্রহ্মানন্দ স্বামীর সঙ্গে দেখা। সেই নিমীলিতচক্ষু ব্রহ্মানন্দ, যিনি অরবিন্দের প্রণাম পাবার পর তাকিয়েছিলেন চোখ মেলে। তাকিয়েছিলেন গভীর-পরিচিত অন্তরঙ্গ দৃষ্টিতে। কী সুন্দর দুটি চোখ! অরবিন্দ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কী সুন্দর দুটি চোখ! ব্রহ্মানন্দও না কোন মুগ্ধ হয়েছিলেন!

এক বছরের বিনা-বেতন ছুটি নিলেন অরবিন্দ। জুলাই মাসে এলেন কলকাতায়। প্রথমে কানাই ধর লেনে যুগান্তর অফিসে উঠলেন। সে ডেরা ছেড়ে

উঠলেন রাজা সুবোধ মল্লিকের প্রাসাদোপম বাড়িতে, ১২ নম্বর ওয়েলিংটন স্ট্রীটে। সুবোধ মল্লিক বন্ধু হয়ে গিয়েছেন—এক ভাবনায় ভাবুক—তাই কোথাও কিছু বাধল না।

বিপিন পাল বললেন, আসুন একটা ইংরেজি পত্রিকা বের করি।

টাকা কোথায়? জিজ্ঞেস করলেন অরবিন্দ।

এই পাঁচ শো টাকা আছে। বিপিনচন্দ্র পকেট থেকে টাকা বের করলেন।

পেলেন কোথায়?

হরিদাস হালদার দিয়েছেন।

তবে আর কথা কী। বার করুন পত্রিকা।

পত্রিকার নাম কী?

নাম তো সংসারে একটাই আছে। নাম বন্দেমাতরম। আপনি থাকবেন সম্পাদকমণ্ডলীতে।

প্রকাশ্যে নয়, নেপথ্যে থাকব। লিখব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ।

তাইতেই প্রচুর হবে। অগাধ হবে।

অরবিন্দ উপলব্ধি করলেন, মা তাঁকে ডেকেছেন, মনোনীত বলে ডেকেছেন। উপলব্ধি করলেন শব্দই শক্তি। শব্দের পিছনে যে চিন্তা সেই চিন্তাই সক্রিয় প্রাণ-প্রেরণা।

বুঝলেন বরোদার চাকরিতে আর ফিরে যাওয়া চলবে না। বাংলায়, কলকাতায়ই তাঁকে থাকতে হবে। কিন্তু তাঁর চলবে কী করে? খাবেন কী?

॥ এগার ॥

দেশীয় শিক্ষার সর্বতঃ সংস্কার দরকার এটা অনেকেই অনুভব করেছিলেন। বারো-তেরো বছর আগে থেকেই 'ইন্দুপ্রকাশে' অরবিন্দ বলছিলেন এ সংস্কারের কথা। ইংরেজি শিক্ষায় যত সদগুণই থাক, তা মানুষকে মানুষ করে তোলে না। জাতীয় ঐতিহ্য থেকে ছাত্রদের বিচ্যুত করে, বিচ্ছিন্ন রাখে। নির্বীর্য করে দেয়। তাদের মাঝে জাগায় না কোনো বৃহত্তর অভীপ্সা। তাদের মধ্যে শুধু দাস-ভাবেরই বিবৃদ্ধি ঘটায়। শেখায় শুধু অনুকরণ করতে।

শুধু অনুকরণ নয়—হনুকরণ।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের পুরোধা আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তিনি

শুরুতে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করলেন—নাম ভাগবত চতুষ্পাঠী। উদ্দেশ্য শিক্ষাকে কিঞ্চিৎ ভগবৎমুখী করা, যাতে ছাত্রদের চরিত্র বলোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যাতে তাদের মধ্যে নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গের প্রেরণা দেখা দেয়।

সেই চতুষ্পাঠীর মুখপত্র হল 'ডন' পত্রিকা। 'ডন' পত্রিকা ঘিরে গড়ে উঠল ডন সোসাইটি। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হল ধর্মে ও কর্মে, ত্যাগে ও ভোগে, প্রেমে ও সেবায় বাঙালীকে প্রদীপ্ত করে তোলা।

ইংরেজ সরকার সার্কুলার জারি করেছে, ছাত্ররা রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে যোগ দিতে পারবে না। রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুধু নয়, সামান্য সভায় যোগদানও নিষিদ্ধ। দলে-দলে ছাত্ররা আদেশ অমান্য করল। ফলে স্কুল-কলেজ থেকে বিতাড়িত হল দলে-দলে।

এখন এদের নিয়ে কী করা যায়!

সরকারের বয়ে গেছে তাদের ভাবনা ভাবতে। তার শুধু শাসন-শৃঙ্খলার ভাবনা। ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে নয়, নিজের ভবিষ্যৎ নিয়েই সে বিব্রত।

এই উপলক্ষে বিরাট সভা বসল কলকাতায়। সভাপতি সুবোধচন্দ্র মল্লিক। শুধু বিলিতি পণ্য নয়, বিলিতি শিক্ষাও বর্জন করো। জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হোক।

তাই হবে। টাকা? সুবোধ মল্লিক এক লাখ টাকা দিতে রাজী হলেন।

বন্দেমাতরম। সে কী উৎসাহ! এ রাজার মত দান। দেশের লোক এক কণ্ঠে সুবোধ মল্লিককে রাজা বলে ঘোষণা করল। সরকারী খেতাবের কী দাম, রাজশ্রী না রাজ্যভূষণ, দেশের লোকের কাছে সুবোধ মল্লিক রাজা হয়ে গেলেন। দেশের লোক যাকে রাজা বলে তাকে শিরোপার জন্যে রাজার কাছে মাথা বিকোতে হয় না।

কয়েক মাসের মধ্যেই আনুষ্ঠানিক ভাবে জাতীয় সাহিত্য পরিষদ গঠিত হল। ধনী জমিদারেরা অর্থ দিলেন অকাতরে। বলা হল, জাতীয় শিক্ষা সরকারী শিক্ষার থেকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হবে। সরকারী শিক্ষা দ্বারা কবলিত হয়ে তা সঙ্কর ভাবাপন্ন হবে না, এবং তা সরকারী শিক্ষার বিরোধিতাও করবে না।

এখন প্রশ্ন উঠল জাতীয় সাহিত্য পরিষদের আওতায় যে জাতীয় কলেজ বা মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হবে তার অধ্যক্ষ হবেন কে?

আর কে! অধ্যক্ষ হবেন অরবিন্দ ঘোষ। সুবোধ মল্লিকের প্রস্তাব সকলে এক বাক্যে সমর্থন করলে। কিন্তু অরবিন্দ কি বরোদার চাকরি ছেড়ে এ কাজ নিতে

রাজী হবেন ? বরোদায় অরবিন্দ সাড়ে সাতশো টাকা মাইনে পাচ্ছেন, আর আমরা বড় জোর দেড়শো দিতে পারব। মাসিক ছশো টাকার মায়া কি ছাড়তে পারবেন অরবিন্দ ?

অরবিন্দ নির্দ্বিধায় রাজী হলেন। বরোদায় তাঁর চাকরি, কলিকাতায় তাঁর কাজ, তাঁর জীবনের ব্রত। তাঁর দেশকে স্বাধীন করতে হবে, সেই লক্ষ্যে দেশের যুব শক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করতে হবে, ঘুচিয়ে দিতে হবে ভয়, কাপুরুষতা, জাগিয়ে দিতে হবে জীবনের নবতন মূল্য ও মহিমার বোধ। প্রেরিত করতে হবে প্রবলতর আস্পৃহায়।

'জয়ের কারণ শক্তি।' লিখছেন অরবিন্দ: 'কোন্ শক্তিতে দুর্বল পক্ষের জিত হয়, প্রবল পক্ষের শক্তি পরাজিত বা বিনষ্ট হয় ? আমরা ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত সকল পরীক্ষা করিলে বুঝিতে পারিব, আধ্যাত্মিক শক্তির বলে এই অঘটন ঘটিয়াছে, আধ্যাত্মিক শক্তিই বাহুবলকে তুচ্ছ করিয়া মানবজাতিকে জানায় যে এই জগৎ ভগবানের রাজ্য, অন্ধ স্থূল প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র নহে। শুদ্ধ আত্মা শক্তির উৎস, যে আত্মাপ্রকৃতি গগনে অযুত সূর্য ঘুরাইতে থাকে, অঙ্গুলিস্পর্শে পৃথিবী দোলাইয়া মানবের সৃষ্ট পূর্ব গৌরবের চিহ্নসকল ধ্বংস করে, সেই আত্মাপ্রকৃতি শুদ্ধ আত্মার অধীন। সেই প্রকৃতি অসম্ভবকে সম্ভব করে, মূককে বাচাল করে, পঙ্গুকে গিরি উল্লঙ্ঘন করিবার শক্তি দেয়। সমস্ত জগৎ সেই শক্তির সৃষ্টি। যাহার যাহার আধ্যাত্মিক বল বিকশিত তাহার জয়ের উপকরণ আপনিই সৃষ্ট হয়, বাধা-বিপত্তি আপনি সরিয়া গিয়া অনুকূল অবস্থা আনায়, কার্য করিবার ক্ষমতা আপনিই ফুটিয়া তেজস্বিনী ও ক্ষিপ্রগতি হয়। য়ুরোপ আজকাল এই Soul Force বা আধ্যাত্মিক শক্তিকে আবিষ্কার করিতেছে, এখনও তাহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই, তাহার ভরসায় কার্য করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু ভারতের শিক্ষা, সভ্যতা, গৌরব, বল, মহত্ত্বের মূলে আধ্যাত্মিক শক্তি। যতবার ভারতজাতির বিনাশকাল আসন্ন বলিয়া সকলের প্রতীতি হইবার কথা ছিল, আধ্যাত্মিক বল গুপ্ত উৎস হইতে উগ্রস্রোতে প্রবাহিত হইয়া মুমূর্ষু ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছে, আর সকল উপযোগী শক্তিও সৃজন করিয়াছে। এখনও সেই উৎস শুকাইয়া যায় নাই, আজও সেই অদ্ভুত মৃত্যুঞ্জয় শক্তির ক্রীড়া হইতেছে।'

প্রায় চৌদ্দ বছর পর বরোদা ছাড়লেন অরবিন্দ। নবতর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন কলকাতায়।

তাঁর দিব্য জীবন গ্রন্থে এই মর্মে লিখছেন অরবিন্দ :

'কোন অস্পষ্ট অতীতে প্রবুদ্ধ মনের প্রথম আলোকসম্পাতে মানুষের মধ্যে জেগেছে এক লোকোত্তর এষণা—দিব্য স্বরূপের অস্ফুট ইশারা তাকে পূর্ণতার অভিমুখে প্রেরিত করেছে। ছুটিয়েছে বিশুদ্ধ সত্যের অনির্বাণ আনন্দ-আলোকের সন্ধানে। ব্যাকুল করেছে অমৃতত্বের সুগভীর চেতনায়। এ এষণার বিরাম নেই, যুগ যুগান্ত ধরে এ প্রবাহিত হয়ে এসেছে, এর আদি নেই, এর অন্তও অনির্ণেয়। সংশয়ের নাস্তিকতার দীর্ঘতম তমসা পেরিয়েও জীবনের প্রাচামূলে এর অরুণলেখা আবির্ভূত হয়েছে—প্রাচীন ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দেবে। মানুষের করপুট বহিঃপ্রকৃতির বিপুল ঐশ্বর্যের দানে ভ'রে-ভ'রে উঠেছে, তবু তার প্রাণের হাহাকার যাচ্ছে না, কোন গোপন গহনে বেজে উঠছে এক অতৃপ্ত আকুতি। প্রমত্ত বিত্তৈষণাও সে-আর্তিকে আবৃত করতে পারছে না, থেকে-থেকেই মানুষ উন্মন হয়ে পড়ছে। আলো চাই, স্বকীয়তা চাই, চাই অমৃতের অধিকার—চাই দিব্য জীবনের জ্যোতির্ময় মহিমা—এই অভীপ্সা নিয়েই বিশ্বলোকে মানুষের যাত্রা শুরু, তেমনি এই বিশ্বলোকেই সে-অভীপ্সার প্রপূর্তিতেই যাত্রার বিরাম। এর চেয়ে বৃহত্তর বাসনা তার বুদ্ধির বাইরে, তার মনেরও অগোচর।'

উনিশশো ছ সালের অগাস্টে অরবিন্দ নতুন কাজের ভার নিলেন। তিনি অধ্যক্ষ আর ডন-এর সতীশ মুখোপাধ্যায় সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। সতীশ ত্যাগসিদ্ধ, চিরকুমার। আর অরবিন্দ, বিপিন পালের ভাষায়, বিধাতাচিহ্নিত যুগ-পুরুষ।

'সন্ধ্যা'য় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় কী লিখছেন?

কমল-শুভ্র অরবিন্দ দেখিয়াছ কি? ভারত-মানস-সরোবরের প্রস্ফুটিত শতদল। এ ফিরিঙ্গির আঁদাড়ে-পাঁদাড়ের সিল্ক-ডাফোডিল নহে। নির্গন্ধ! রঙের বাহার। কেবল বর্ণ-বিলাস!! দেবতার পূজায় লাগে না। যাগ-যজ্ঞে অনাবশ্যক। শুধু সাহেব বিবির সাহেবিয়ানার আড়ম্বর! আমাদের এই অরবিন্দ জগৎ-দুর্লভ। হিমশুভ্র বর্ণে সাত্ত্বিকতার দিব্যশ্রী। বৃহৎ ও মহৎ। হৃদয়ের প্রখরতায় বৃহৎ—হিন্দুর স্বধর্ম মহিমায় মহৎ। এমন একটা গোটা ও খাঁটি মানুষ এমন বজ্রের মত বহ্নিগর্ভ, কমল-দলের ন্যায় কান্ত-পেলব, এ হেন জ্ঞানাঢ্য, এমন ধ্যান-সমাহিত মানুষ তোমরা ত্রিভুবনে খুঁজিয়া পাইবে না।'

পনেরোই অগাস্ট, জন্মদিনে, জাতীয় কলেজের কাজে যোগ দিলেন অরবিন্দ। আরো যাঁরা অধ্যাপনার ভার নিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিনয়কুমার সরকার, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও হারানচন্দ্র চাকলাদার। অরবিন্দের তো শুধু অধ্যাপনা নয়, রয়েছে বন্দেমাতরম।

বন্দেমাতরম-এর মূল সুর কী?

বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ। যদি অবিচারকে না প্রতিহত করা যায় তবে স্বাধীনতা অর্জনের পক্ষে যে উৎসাহ ও অধ্যবসায় একান্ত প্রয়োজনীয় তাই স্তিমিত হয়ে পড়বে। আঘাতের বিনিময়ে আঘাত করো। আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও, জাতির পুরুষত্বকে জাগিয়ে তোলো। নিপীড়িত জাতির এ ছাড়া পথ নেই। জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাকে শাস্তি দেওয়া।- শাস্তি না দিলে নিমক-হারামি বন্ধ হবার নয়। যে জাতি স্বাধীন হতে চায় তাকে অত্যাচার ও নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হবে। জাতিকে তৈরি করে নেবার জন্যে নিগ্রহই দৈব ব্যবস্থা। আমরা ঈশ্বরের নেহাইয়ের উপর জ্বলন্ত লোহা, তিনি যে আমাদের উপর তাঁর হাতুড়ির ঘা মারছেন তা ধ্বংস করবার জন্যে নয়, আমাদের নতুন করে নির্মাণ করবার জন্যে। দুঃখের দাহ ছাড়া কে কবে বাড়তে পেরেছে?

বন্দেমাতরম-এর জন্যে একটা পরিচালনা সমিতি গঠিত হল। বিপিন পালই সম্পাদক রইলেন। আয়ব্যয়ের ভার নিলেন সুবোধ মল্লিক আর নীরদ মল্লিক। সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগ দিলেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ আর বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ওয়েলিংটন স্ট্রীটে সুবোধ মল্লিকের বাড়ি ছেড়ে অরবিন্দ ছকু খানসামা লেনে বাসা নিলেন। সে বাসায় মৃণালিনী এল। এল সরোজিনী। এল বারীন আর অবিনাশ। আসা-যাওয়া করতে লাগল বিপ্লবমন্ত্রে নবদীক্ষিতের দল।

বন্দেমাতরম-এর পাঞ্চজন্য ধ্বনিত হল সগৌরবে। মূল সম্পাদকীয় রচনা বেশির ভাগই অরবিন্দের লেখা। আর আবেদন-নিবেদন নয়, নয় প্রসাদ-ভিক্ষা —এবার থেকে শুরু হল যুক্তিসিদ্ধ দাবি, শুধু প্রস্তাব নয় ঘোষণা, শুধু প্রতিবাদ নয় আক্রমণ, শুধু প্রার্থনা নয়, আঘাত। কলম যে তরবারির চেয়েও শক্তিশালী তার প্রমাণ দিলেন অরবিন্দ। অথচ এমন কুশলী রচনা, সাধ্য নেই রাজদ্রোহের অপরাধে আইনত দণ্ডনীয় করা যায়। কোথাও একটুকু ছিদ্র নেই, স্খলিত একটি শিথিল বাক্য নেই কোনোখানে।

দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়, যারা ইংরেজি-জানা, সবাই মেতে উঠল। সাংবাদিকতায় এত বিরাট ঐশ্বর্য কোনোদিন দেখেনি আগে। শত্রুপক্ষীয়েরাও প্রশংসা না করে পারল না। এমন কি লণ্ডনে টাইমস পত্রিকায়ও 'বন্দেমাতরম থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি প্রকাশিত হতে লাগল।

কী ভাষা! যেমন তার ঔজ্জ্বল্য তেমনি তার প্রাখর্য! কী প্রগাঢ় কবিত্ব!

চিন্তায় সজীব, অর্থে গভীর, প্রকাশে প্রাঞ্জল—এর আর জুড়ি নেই কোথাও। তারপর কী সূক্ষ্ম পরিচ্ছন্ন পরিহাস, কখনো-কখনো বা প্রজ্জলন্ত বিদ্রূপ। অথচ ঘাতসহ যুক্তি! সরকার জ্বলতে লাগল, পুড়তে লাগল কিন্তু শায়েস্তা করবার উপায় খুঁজে পেল না। আইনের জাল যতদূর ফেলা যায় তার বাইরে দাঁড়িয়ে বন্দেমাতরম তার আওয়াজ দিচ্ছে। ধরা-ছোঁয়া দূরের কথা, ধারেকাছে পৌঁছুনই কঠিন।

ছকু খানসামা লেন ছেড়ে অরবিন্দ সবাইকে নিয়ে বাসা করলেন ২৩ স্কট লেনে। বারীন চলে গেল তাদের মুরারিপুকুরের বাগানে।

এদিকে 'বন্দেমাতরম'-এ লেখা বা লক্ষ্য নিয়ে সম্পাদক বিপিন পালের সঙ্গে তাঁর সহকারী শ্যামসুন্দর ও হেমেন্দ্রপ্রসাদের মতভেদ হল। পরিচালনা-সমিতি ফয়সালা করতে গিয়ে সহকারীদেরই সমর্থন করল। ফলে কাগজ থেকে সরে গেলেন বিপিন পাল।

অরবিন্দ তখন শ্বশুরালয়ে, ভূপাল বসুর বাড়তে, সার্পেন্টাইন লেনে। ঘোরতর অসুস্থ। হঠাৎ একদিন দেখলেন বন্দেমাতরম-এ সম্পাদক হিসেবে তাঁর নাম মুদ্রিত হয়েছে। সে কী কথা! তিনি তো নেপথ্য নায়ক, অপ্রকাশিত থেকেই চালাচ্ছেন সমস্ত—তাঁকে নামে আবদ্ধ করা কেন? পরিচালক সমিতির সেক্রেটারিকে কড়া করে চিঠি লিখলেন অরবিন্দ: আমার অনুমতি ছাড়া আমার নাম সম্পাদক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে কেন? নাম প্রত্যাহার করুন।

নাম প্রত্যাহৃত হল।

চিরন্তন চালক হয়ে অরবিন্দ শুধু এক দিনের সম্পাদক।

মনোমোহন ঘোষ তখন ঢাকায় প্রফেসর। তিনি অরবিন্দের জন্যে দারুণ চিন্তিত হলেন। এ তুমি কী করছ? তুমি একজন উঁচুদরের কবি—জাত-কবি, তোমার রাজনীতিতে নিমজ্জিত হবার কী দরকার? তোমার কবিত্বশক্তির অপনোদন হবে।

কবিত্বশক্তি? বন্দেমাতরম-এ অরবিন্দ যা লিখছেন তাই কি কবিত্বমণ্ডিত নয়? তাতে নেই কি গভীরের ডাক, সুদূরের ইশারা? কবিতা কি শুধু ছন্দোবদ্ধ কথায়? জীবনের সৌষম্যসাধনও তো অনন্য কবিতা।

অরবিন্দ কোথায় চলেছেন জানতে চান মনোমোহন?

অরবিন্দ তো আগেই লিখেছেন:

'নিশ্চিন্ত নির্ভয় থাকো
চলিবে এ দীর্ঘ খেলা, দুর্ধর্ষ সংগ্রাম
নির্ধারিত গন্তব্য না যতদিন হবে উপনীত,
সে গন্তব্য তুমি নিজে
তমসার পরপারে তুমিই ঈশ্বর।'

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী এসেছেন অরবিন্দের কাছে। কই, সম্পাদকীয় নিবন্ধ কই? অরবিন্দ সজাগ হলেন। কিন্তু কাগজ কই লেখবার? টেবিলের উপর স্তূপীকৃত খবরের কাগজ, তার ভিতর থেকে পুরনো একটা মোড়কের টুকরো টেনে নিয়ে তাতে খসখস করে লিখতে লাগলেন অরবিন্দ। পনেরো মিনিটের মধ্যে প্রবন্ধ তৈরি হয়ে গেল। একটু থামলেন না, অদলবদল করা দূরের কথা, কোথাও একটু কাটাকুটি করলেন না কোন গহন উৎস থেকে নির্বারিত স্রোতে বেরিয়ে এল প্রাণনির্ঝর।

সেই প্যাকিং পেপারে লেখা প্রবন্ধই পরদিন সকালে পাঠকের মনে দেশ-প্রেমের আগুন জ্বালালো। সে কী প্রগাঢ় আবেগ অথচ বক্তব্যের কী স্বচ্ছতা'

অন্যের মহানুভবতার ছায়ায় বিশ্রাম করা নয়, নিজের ন্যায্য অধিকারের উপর দাঁড়ানো। শুধু দাঁড়ানো নয়, এগিয়ে যাওয়া, ঝাঁপিয়ে পড়া। মুঘল বা ইংরেজ যে ভারতবর্ষ জয় করেছে তা সমগ্র ভারতবাসীর কাছ থেকে পায়নি। কেড়ে নিয়েছে ক্ষুদ্র কয়েকটা সুবিধাভোগী সম্প্রদায় থেকে। শুধু মারাঠা ও শিখের সমরসাফল্যের কারণ শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সমগ্র জাতিকে নিয়ে এসেছিল সমক্ষসংঘাতে। সমস্ত জাতি যদি সংগ্রামের প্রেরণায় একত্র থাকতে পারত তাহলে স্বাধীনতা হারাতে হত না—আবার যদি তা উদ্ধার করতে হয় তবে সমগ্র জাতিকে একবার রণোন্মুখতায় একাগ্র হতে হবে।

অরবিন্দের অসুখ প্রায় ডিসেম্বর পর্যন্ত গড়াল, তিনি হাওয়া বদল করতে দেওঘর গেলেন। ছাব্বিশে ডিসেম্বর কলকাতায় কংগ্রেস, তার কিছু আগেই তিনি ফিরে এলেন। কংগ্রেসকেও যে তাঁকে নেপথ্য থেকে চালাতে হবে।

এবারের সভাপতি দাদাভাই নওরোজি। যদিও তিনি এতদিন নরমপন্থী ছিলেন, অরবিন্দ ও তিলকের সংস্পর্শে এসে তাঁকে এবার পথ বদলাতে হল। তিনি নিজেই উপলব্ধি করেছিলেন ভারতবর্ষের দারিদ্র্য ইংরেজ শাসনের কুফলে ক্রমশই বেড়ে চলেছে। আর দারিদ্র্যের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে তার দুর্বলতা। সুতরাং তিনি আর স্বায়ত্তশাসনের কথা ভাবতে পারছেন না—তিনি অরবিন্দকে

সমর্থন করলেন—হ্যাঁ, পূর্ণাঙ্গীণ স্বাধীনতা চাই।

মূল প্রস্তাবে সরাসরি 'স্বাধীনতা' কথাটা রাখা হল না—পরিবর্ত-শব্দ নেওয়া হল—স্বরাজ। স্বরাজ বুঝি স্বাধীনতার চেয়ে গুরুতর বৃহত্তর শব্দ। স্বরাজে শুধু স্বাধীন হওয়া নয়, স্বরাট হওয়া। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেয়ে স্বারাজ্য প্রতিষ্ঠা মহত্তর সাধন।

মূল প্রস্তাব রচনায় অরবিন্দের হাত অনেকখানি। এই প্রস্তাব নিয়েই নরমপন্থী ও গরমপন্থীদের মধ্যে একটা বিভেদ হতে যাচ্ছিল, দাদাভাই সুকৌশলে বিপদ এড়ালেন, প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। ইংরেজ তার গভর্ণমেণ্ট চালাক, আমরাও আমাদের গভর্ণমেণ্ট চালাব। আমাদের শাসনযন্ত্রের তিন বাহন—স্বদেশী, বিলিতিবর্জন আর জাতীয় শিক্ষা। আমরাও যেমন ইংরেজ সরকারের মুখাপেক্ষী হব না, তেমনি আমাদের সরকারের উপরেও কোনো বিদেশী হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করব না।

স্বরাজ—স্বরাজ—পূর্ণাঙ্গ স্বরাজ।

অরবিন্দ বলছেন: 'আমরা পূর্ণাঙ্গ স্বরাজ চাই। যদি বৃটিশ জাতি এমন যুক্ত সাম্রাজ্যের ব্যবস্থা করে যে, তাহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া ভারতবাসীর সেইরূপ স্বরাজ সম্ভব হয়, আপত্তি কি? আমরা ইংরেজ জাতির বিদ্বেষে স্বরাজ চেষ্টা করিতেছি না, দেশরক্ষার জন্য করিতেছি। কিন্তু আমরা পূর্ণাঙ্গ স্বরাজ ভিন্ন অন্য আদর্শ স্বীকার করিয়া দেশবাসীকে মিথ্যা রাজনীতি ও দেশরক্ষার ভুল মার্গ প্রদর্শন করিতে প্রস্তুত নহি।'

বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ নেই, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের প্রথম উদ্গাতা অরবিন্দ, কিন্তু প্রয়োজনবোধে দেশের স্বাধীনতার জন্যে অস্ত্র ধরতে বা সশস্ত্র যুদ্ধ করতে তিনি পরাঙ্মুখ নন। যে অক্টোপাসের থাবা মেলে দেশকে আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরে ইংরেজ শোষণ করছে তার উচ্ছেদ সাধনে সশস্ত্র অভ্যুত্থান হবে এ আর বিচিত্র কী।

কিন্তু এহো বাহ্য আগে কহ আর। 'ভারতের স্বাধীনতা গৌণ উদ্দেশ্যমাত্র, মুখ্য উদ্দেশ্য ভারতের সভ্যতার শক্তি প্রদর্শন এবং জগৎময় সেই সভ্যতার বিস্তার ও অধিকার।' লিখছেন অরবিন্দ: 'আমরা যদি পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বলে, বক্তৃতার জোরে, বাহুবলে স্বাধীনতা বা স্বায়ত্ত-শাসন আদায় করিতে পারিতাম, সেই মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত হইত না। ভারতীয় সভ্যতার বলে আধ্যাত্মিক শক্তিতে, আধ্যাত্মিক শক্তির সৃষ্ট সূক্ষ্ম ও স্থূল উপায়ে স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে সেইজন্য ভগবান আমাদের পাশ্চাত্ত্য ভাবযুক্ত আন্দোলন ধ্বংস করিয়া

বহির্মুখী শক্তিকে অন্তর্মুখী করিয়াছেন।'

মৃণালিনী তখন দেওঘরে, সরোজিনীও তার সঙ্গে আছে, অরবিন্দ তাঁর স্কট লেনের বাসা থেকে ১৯০৭-এর ১৭ই ফেব্রুয়ারি চিঠি লিখলেন :

প্রিয় মৃণালিনী,

অনেক দিন চিঠি লিখি নাই, সেই আমার চিরন্তন অপরাধ, তাহার জন্য তুমি নিজ গুণে ক্ষমা না করিলে আমার আর উপায় কি ? যাহা মজ্জাগত তাহা একদিনে বেরোয় না, এই দোষ শোধরাইতে আমার বোধ হয় এই জন্ম কাটিবে।

8th জানুয়ারি আসিবার কথা ছিল, আসিতে পারি নাই, সে আমার ইচ্ছায় ঘটে নাই। যেখানে ভগবান নিয়া গিয়াছেন সেইখানে যাইতে হইল। এইবার আমি নিজের কাজে যাই নাই, তাঁহারই কাজে গিয়াছিলাম। আমার এইবার মনের অবস্থা অন্যরূপ হইয়াছে, সে কথা এই পত্রে প্রকাশ করিব না। তুমি এখানে এস, তখন যাহা বলিবার আছে, তাহা বলিব ; কেবল এই কথাই এখন বলিতে হইল যে এর পরে আমি আর নিজের ইচ্ছাধীন নই, যেইখানে ভগবান আমাকে নিয়া যাইবেন সেইখানে পুতুলের মত যাইতে হইবে, যাহা করাইবেন তাহা পুতুলের মত করিতে হইবে। এখন এই কথার অর্থ বোঝা তোমার পক্ষে কঠিন হইবে, তবে বলা আবশ্যক নচেৎ আমার গতিবিধি তোমার আক্ষেপ ও দুঃখের কথা হইতে পারে। তুমি মনে করিবে আমি তোমাকে উপেক্ষা করিয়া কাজ করিতেছি, তাহা মনে করিবে না। এই পর্যন্ত আমি তোমার বিরুদ্ধে অনেক দোষ করিয়াছি, তুমি যে তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলে, সে স্বাভাবিক, কিন্তু এখন আমার আর স্বাধীনতা নাই, এর পরে তোমাকে বুঝিতে হইবে যে আমার সব কাজ আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া ভগবানের আদেশেই হইল। তুমি আসিবে, তখন আমার কথার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিবে। আশা করি ভগবান আমাকে তাঁহার অপার করুণার যে আলোক দেখাইয়াছেন, তোমাকেও দেখাইবেন কিন্তু সে তাঁহারই ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তুমি যদি আমার সহধর্মিণী হইতে চাও তাহা হইলে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে যাহাতে তিনি তোমার একান্ত ইচ্ছার বলে তোমাকেও করুণা-পথ দেখাইবেন। এই পত্র কাহাকেও দেখিতে দিবে না, কারণ যে কথা বলিয়াছি, সে অতিশয় গোপনীয়। তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও বলি নাই, বলা নিষিদ্ধ। আজ এই পর্যন্ত।

তোমার স্বামী

॥ বারো ॥

অরবিন্দের কাছে রাজনীতি অধ্যাত্মসাধনা। বলা যেতে পারে যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজা এ যেন তাঁরই নীতি, তাঁরই বিধান। তাঁকেই আরাধনা।

জাতীয়তাবাদ নবতন ধর্মরূপে অরবিন্দের কাছে প্রতিভাত হল। পূজার বেদীতে সমাসীন দেশমাতা—ভবানী ভারতী। দেশের স্বাধীনতার জন্যে প্রয়াস করাই মহাদেবীর পূজা করা। সে পূজার মন্ত্র বন্দেমাতরম—অর্ঘ্য আত্মবলি।

অরবিন্দের কাজ হল সকলকে সেই মাতৃমন্দিরে আহ্বান করে আনা আর বলিপ্রদত্ত হতে প্রবুদ্ধ করা।

মুক্তিসাধনা যদি ঈশ্বরসাধনা হয় তবে ঈশ্বরই সেই সাধনার শক্তি যোগাবেন। শক্তি না যোগালে বীরের কাছে তিনি দায়মুক্ত হবেন কী করে?

লিখছেন অরবিন্দ: 'আর্যশিক্ষার মধ্যে বিদ্বেষ বা ঘৃণার স্থান নাই। নারায়ণ সর্বত্র। কাহাকে বিদ্বেষ করিব, কাহাকে ঘৃণা করিব? আমরা যদি পাশ্চাত্ত্য ভাবে রাজনীতিক আন্দোলন করি, তাহা হইলে বিদ্বেষ ও ঘৃণা অনিবার্য হয় এবং পাশ্চাত্ত্যমতে নিন্দনীয় নহে, কেননা স্বার্থের বিরোধ আছে, একপক্ষে উত্থান, অন্যপক্ষে দমন চলিতেছে। কিন্তু আমাদের উত্থান কেবল আর্যজাতির উত্থান নহে। আর্যচরিত্র, আর্যধর্মের উত্থান। আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় পাশ্চাত্ত্য রাজনীতির প্রভাব বড় প্রবল ছিল, তথাপি প্রথম অবস্থায়ও এই সত্য উপলব্ধ হইয়াছে; মাতৃপূজা, মাতৃপ্রেম, আর্য অভিমানের তীব্র অনুভবে ধর্ম-প্রধান দ্বিতীয় অবস্থা প্রস্তুত হইয়াছে। রাজনীতি ধর্মের অঙ্গ, কিন্তু তাহা আর্যভাবে, আর্যধর্মের অনুমোদিত উপায়ে আচরণ করিতে হয়। আমরা ভবিষ্যৎ আশাস্বরূপ যুবকদিগকে বলি, যদি তোমাদের প্রাণে বিদ্বেষ থাকে তাহা অচিরে উন্মূলিত কর। বিদ্বেষের তীব্র উত্তেজনায় ক্ষণিক রজঃপূর্ণ বল সহজে জাগ্রত হয় ও শীঘ্র ভাঙিয়া দুর্বলতায় পরিণত হয়। যাহারা দেশোদ্ধারার্থে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও উৎসর্গীকৃতপ্রাণ, তাঁহাদের মধ্যে প্রবল ভ্রাতৃভাব, কঠোর উদ্যম, লৌহসম দৃঢ়তা ও জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য তেজ সঞ্চার কর, সেই শক্তিতে আমরা অটুটবলান্বিত ও চিরজয়ী হইব।'

ইংরেজের হাতে দুই খরধার অস্ত্র—ছাত্রদলন আর বিনাবিচারে নির্বাসন। অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম'-এ অগ্নিময়ী লেখনীতে শুধু সমালোচনা নয়, প্রতিকার দাবি করলেন। আর প্রস্তাব নয়, প্রার্থনা নয়, প্রতিবাদ নয়,—এবার প্রতিকার। রাত্রে

অরবিন্দের কাছে টেলিগ্রাম এল—লালা লাজপত রায় ও তাঁর সহকর্মী অজিত সিং বিনাবিচারে বন্দী হয়েছে। অরবিন্দ তক্ষুনি লিখলেন: 'গভর্ণমেন্টের অবিচার অত্যাচার নতশিরে মেনে নেবার সময় চলে গিয়েছে। লগ্ন সমাগত। এখন পাঞ্জাবীরা প্রমাণ করুক তারা সিংহের জাত—তারা বীরাগ্রগণ্য। এক লাজপত গেছে তো হাজার লাজপত জেগে উঠেছে।'

সমস্ত নেতার আড়ালে রয়েছেন ভগবৎনেতা আর সেই নেতার যদি অনুবর্তন করা যায় তা হলে আর কিসের ভয়, কোথায় পরাজয়? লিখলেন অরবিন্দ: 'যে রাজাকে আমরা আমাদের যুদ্ধের সেনাপতি করেছি তিনি আমাদের দেশমাতা, স্বয়ং সর্বশক্তিমান, অবিনশ্বর সত্তা যা তরবারি ছিন্ন করতে পারে না, হুতাশন দগ্ধ করতে পারে না, সমুদ্র পারে না নিমজ্জিত করতে। নির্বাসনে সে বিচ্ছিন্ন হবার নয়, নয় বা কারাগারে বন্দী হবার। লাজপত রায় কিছু নয়, তিলক কিছু নয়, বিপিন পাল কিছু নয়। তারা সেই মহানায়কের হাতের প্রহরণ—আর, তোমরা মনে কর এরা চলে গেলে ভগবানের হাতের অস্ত্রের অভাব হবে? ভগবান তাঁর ইচ্ছাসাধনের জন্যে ওদের জায়গায় আর কাউকে পারবেন না নির্বাচিত করতে?'

ইংরেজ তখন তার জঘন্যতম ভেদনীতি প্রবর্তন করলে। পৃথক করে শাসন করার নীতি। কুমিল্লা ও জামালপুরে নিদারুণ দাঙ্গা হল—হল মন্দির-ধ্বংস, হল সতীত্ব লুণ্ঠন। অরবিন্দ লিখলেন: 'যদি বাঙালী জাতি সত্যিই এমনি পক্ষাঘাত-গ্রস্ত হয়ে থাকে যে দুর্বৃত্তরা তাদের স্ত্রীলোকদের লাঞ্ছিত করলেও তারা বাধা দেবে না, প্রতিকারে উদ্যত হবে না, প্রয়োজন বোধে মরতে প্রস্তুত থাকবে না, তবে ধরাধামকে অযথা ভারাক্রান্ত না করে তারা যত দ্রুত লুপ্ত হয় ততই মঙ্গল।'

'যুগান্তর'-এ দাঙ্গার জন্যে গভর্ণমেন্টকেই সরাসরি অভিযুক্ত করা হল—তারা দানব, তারাই দানবদের লেলিয়ে দিয়েছে। আর যায় কোথা! এ তো প্রত্যক্ষ রাজদ্রোহ। স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদকীয় দায়িত্ব স্বীকার করে নিলেন—হ্যাঁ, এই প্রবন্ধ তাঁরই রচনা। তবে চল, কোর্টে চল, রাজদ্রোহের অভিযোগের সম্মুখীন হও।

কোর্টে মামলা উঠলে ভূপেন্দ্রনাথ চাইলেন আত্মপক্ষ সমর্থন করতে। অরবিন্দ বললেন, তুমি বিপ্লবী হয়ে বিদেশী আদালতকে মানতে যাবে কেন?

ভূপেন্দ্রনাথ আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন না। বললেন, ইংরেজের আদালতকে স্বীকার করি না।

ভূপেন্দ্রনাথের এক বছর জেল হয়ে গেল। ম্যানেজার বলে অবিনাশ ভট্টাচার্যও

চালান হয়েছিল কিন্তু তার বিরুদ্ধে গ্রাহ্য কোন প্রমাণ খাড়া করা গেল না বলে সে বেকসুর খালাস হল।

ভূপেন্দ্রনাথও ছাড়া পেতে পারতেন যদি না তিনি তাঁর সম্পাদকত্ব স্বীকার করতেন। তখনকার আইনে পত্রিকায় সম্পাদকের নাম উল্লেখ করবার কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। রাজদ্রোহমূলক রচনার জন্য আইনত সম্পাদক দায়ী হবে, কিন্তু কোথায় সম্পাদক? ভূপেন্দ্রনাথ যদি চালাকি করে বলতে পারতেন, কে সম্পাদক জানি না, তাহলে সরকার হিমসিম খেয়ে যেত, অপরাধ প্রমাণ করা অসম্ভব হত। কিন্তু যেহেতু অভিযুক্ত রচনাটা ভূপেন্দ্রনাথের নিজের লেখা তিনি সম্পাদকীয় দায়িত্ব স্বীকার করে নিতে কুণ্ঠিত হলেন না। চালাকি দ্বারা মহৎ কাজ হয় না। বিপ্লব এক মহৎ কাজ।

যুগান্তর আর বন্দেমাতরম একই আগুনের এ-পিঠ ও-পিঠ। যুগান্তর বাংলা, বন্দেমাতরম ইংরিজি। বন্দেমাতরম-এ যুগান্তরের সেই রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধের অনুবাদ বেরিয়েছে আর বেরিয়েছে একখানা চিঠি যার শিরোনাম—ভারত ভারতবাসীদের জন্যে। আর যায় কোথা। গভর্ণমেণ্টের অনেক দিনের অভিলাষ অরবিন্দকে জেলে পাঠায়। তারা জানে, বোঝে, বিশ্বাস করে অরবিন্দই সমস্ত নাটের গুরু, কিন্তু এত দিন অনেক কায়দা করেও তাকে কবজা করতে পারেনি। কী করে পারবে? অরবিন্দের প্রত্যক্ষ অস্ত্র তো শুধু লেখনী, কিন্তু এমন কৌশলে তিনি তা চালান, মর্ম বিদ্ধ করলেও কিছুতেই তা রাজদ্রোহ হয়ে ওঠে না। কিন্তু এবার আর পার পেতে হল না, একে তো রাজদ্রোহ-মার্কা-মারা চিঠিটাই ছাপা হয়েছে, তার উপর আবার 'ভারতীয়ের জন্যে ভারতবর্ষ'।

যুগান্তরের মামলার রায় বেরুল ১৯০৭ সনের ২৪শে জুলাই আর তার ছ দিন পরে ৩০শে জুলাই 'বন্দেমাতরম' অফিস সার্চ করল পুলিশ। কী কতগুলো কাগজপত্র কুড়িয়ে নিয়ে গেল। ষোলই অগাস্ট অরবিন্দের বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট বেরুল। খবর শোনামাত্র অরবিন্দ নিজের থেকে থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন—এই যে আমি।

অরবিন্দ জামিন পেলেন। জামিনদার বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু আর ওয়েলিংটন স্কোয়ারের নীরদ মল্লিক।

খবরটা সমগ্র দেশে আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ল। সমস্ত লোকের মুখের মন্ত্র হল অরবিন্দ! বন্দেমাতরম-এর সমস্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ তাহলে অরবিন্দের লেখা। তাই বলো! নইলে কে অমন উচ্চাদর্শে উদ্দীপ্ত করবে দেশবাসীকে? দেশ-

মাতৃকার চরণে আত্মোৎসর্গ করবার অন্তরঙ্গ প্রেরণা যোগাবে? কে জাগাবে সত্যিকার স্বাধীন হবার আকাঙ্ক্ষা?

অরবিন্দ শুধু লেখক নন তিনি প্ররোচক, তিনি শুধু রচয়িতা নন, তিনি চেতয়িতা। তাঁর বাক্য কতগুলি মৃত শব্দ নয়, জ্বলন্ত নক্ষত্র। তিলকের পত্রিকা মারাঠা লিখল: 'মধুরাত্মা অরবিন্দ। আজ তাঁর যে লেখাকে রাজদ্রোহ বলছ কে জানে কালকে তাই ঐশী বাণী হয়ে উঠবে।'

আজ যে কথার জন্যে অরবিন্দকে জেলে বন্দী করতে চাইছ কাল কে জানে সেই কথাতেই কারাগারের দ্বারমোচন হবে।

নানা দিক থেকে অরবিন্দের কাছে অভিনন্দন আসতে লাগল, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে লাগল অজস্র প্রশস্তি-স্তুতি।

দিলীপকুমার রায়কে অরবিন্দ লিখছেন: 'আমি কোনোদিন যশের আকাঙ্ক্ষা করিনি, না, আমার রাজনীতিক জীবনেও না, আমি চিরদিন যবনিকার অন্তরালে থেকে অজ্ঞাতসারে লোকেদের এগিয়ে যাবার ও কার্য সিদ্ধ করবার প্রেরণা যোগাবার পথটাই মনোনীত করেছি, হতবুদ্ধি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আমাকে রাজদ্বারে অভিযুক্ত করে আমাকে জোর করে জনসাধারণের নেতা বানিয়ে আমার সমস্ত খেলা পণ্ড করে দিয়েছে।'

জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অধ্যক্ষপদ ছেড়ে দিলেন অরবিন্দ। তাঁর রাজনীতিক কার্যকলাপের দরুন পরিষদের কোনো না ক্ষতি হয় তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। ছাত্ররা সভায় সমবেত হয়ে অরবিন্দকে বিদায় অভিনন্দন দিল, তারা তাদের অধ্যক্ষের নানাবিধ গুণের অনেক প্রশংসা করল ও সম্প্রতি তিনি যে বিপদে পড়েছেন তার জন্যে সহানুভূতি জানাল।

'বিপদ?' অরবিন্দ তাঁর অভিভাষণে বললেন: 'আমি বিপদে পড়েছি এ তোমাদের কে বললে? এ আমার জীবনের ব্রত। আমার ছেলেবেলা থেকেই আমি এ ব্রত গ্রহণ করেছি, এই ব্রতপূর্তিতে যা দুঃখক্লেশ সমস্তই আমার ন্যায্য প্রাপ্য—এ তো আমার আগের থেকেই জানা। এর জন্যে তোমাদের সমবেদনা প্রকাশ করবার প্রয়োজন নেই। তোমরাও এই তপস্যায় ব্রতী হও। এই তপস্যায় তোমাদের সমানুভূতি প্রতিষ্ঠিত করো। তোমরা আমাকে সম্মান দেখাচ্ছ না, আমার মধ্যে যে মা আছেন তোমাদের সহানুভূতি তাঁর প্রতি। আমি যা করেছি যতটুকু আমি দিয়েছি বা সয়েছি, সব আমার মার জন্যে, মার উদ্দেশে। তোমরা সবাই মার উপযুক্ত সন্তান হও।'

ছাত্ররা পীড়াপীড়ি করতে লাগল : আমাদের কিছু উপদেশ দিন।

উপদেশ ? অরবিন্দ বললেন : আমি শুধু এক উপদেশ দিতে পারি। দেশকে তোমরা বড় করো। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এ জাতীয় মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল সে উদ্দেশ্য তোমরা সফল করো। ভারতে দুঃখের রজনী তিরোহিত হবার পর মহিমোজ্জ্বল দিন আসবে তখন ভারত আবার জগতের গুরু হবে। সেই শুভ-দিবসের আবির্ভাব তোমরা ত্বরান্বিত করো। তোমাদের কিছুটা লিখিয়ে পড়িয়ে জীবিকার্জনের উপযুক্ত করে তোলাই এ বিদ্যালয়ের লক্ষ্য নয়, আসল লক্ষ্য হচ্ছে তোমাদের মাতৃভূমির সন্তানরূপে গঠন করে তোলা যাতে সন্তানরূপে মাতৃভূমির জন্যে দুঃখ-ক্লেশ সহ্য করতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হও।

জাতির ইতিহাসে এমন এক-এক সময় আসে যখন ভগবান দেশের সামনে একটি মাত্র কর্মের আদর্শ তুলে ধরেন। তেমনি এক সময় এখন উপস্থিত হয়েছে। সে আদর্শ হচ্ছে একমাত্র দেশজননীর সেবা। এই সেবার কাছে আর সমস্ত কাজ গৌণ, তুচ্ছ। তোমাদের যা কিছু কাজ সব এই সেবায় প্রাধাবিত হোক। যদি বিদ্যার্জন করবে তো মায়ের জন্য বিদ্যার্জন করো—তোমার দেহ-মন-আত্মাকে মায়ের পরিপূর্ণ সেবার জন্যেই নিয়ন্ত্রণ ও নিয়োগ করো। তোমরা জীবিকার্জন করবে যাতে মায়ের জন্যেই জীবনধারণ করতে পারো। বিদেশে যাবে যাতে সেখান থেকে জ্ঞান আহরণ করে এনে মায়ের সেবায়ই তা লাগাতে পারো। কাজ করো যাতে মায়ের সমৃদ্ধি হয়। দুঃখ ভোগ করো যাতে মা আনন্দিত হন। তোমার বাঁচা-মরা সমস্ত কিছুই একটি কথার মধ্যে বিধৃত—তা হচ্ছে সেবা।

রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হবার পর যত অভিনন্দন এসেছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের 'নমস্কার'। মামলা তখনো কোর্টে ওঠেনি, অরবিন্দ জামিনে মুক্ত, সেই অবস্থায় কবিতাটির রচনা,—অগাস্ট, ১৯০৭; বন্দেমাতরম-এ প্রকাশিত হল দিন কয়েক পরেই—৮ই সেপ্টেম্বর।

প্রভুত্বদৃপ্ত ইংরেজ যখন একবার ধরেছে তখন অরবিন্দকে যে রেহাই দেবে না, কারাগারে নিক্ষেপ করবে, দেশবাসীর মনে তখন সে ধারণা স্বভাবতই বলবান ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

দেবতার দীপহস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্রদূতে, বলো, কোন রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে। বন্ধনশৃঙ্খল তার
চরণবন্দনা করি করে নমস্কার—

কারাগার করে অভ্যর্থনা। রুষ্ট রাহু
বিধাতার সূর্যপানে বাড়াইয়া বাহু
আপনি বিলুপ্ত হয় মুহূর্তেক পরে
ছায়ার মতন।

অরবিন্দ 'বিধাতার সূর্য'। অরবিন্দ 'রুদ্রদূত'।

প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়—প্রত্যগাত্মানন্দস্বামী জাতীয় মহাবিদ্যালয়ে অরবিন্দের সহকর্মী। তিনি লিখছেন: অরবিন্দ যখন রাজনীতিতে ব্যাপৃত তখন তিনি বহ্নিমান রুদ্রমূর্তি আবার যখন তিনি অধ্যাপনায় নিমগ্ন তখন তিনি শান্ত, কোমলাভ। এই রুদ্র আর শান্তভাব যুগপৎ অরবিন্দে প্রকাশিত—অরবিন্দ যেন শিবের তৃতীয় নয়ন। কখনো তিনি ডমরুনিনাদী, কখনো বা নীরব ও সমাহিত। শুধু কর্মযোগী নন, জ্ঞানযোগী নন, অরবিন্দে পূর্ণযোগের সমাহার। অরবিন্দ যেন শাশ্বত সত্যের স্থির মূর্তি।

অরবিন্দের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ প্রণাম করলেন স্বয়ং লীলাপুরুষকে:

তারপরে তাঁকে নমি যিনি ক্রীড়াচ্ছলে
গড়েন নতুন সৃষ্টি প্রলয়-অনলে,
মৃত্যু হতে দেন প্রাণ, বিপদের বুকে
সম্পদেরে করেন লালন, হাসিমুখে
ভক্তেরে পাঠায়ে দেন কণ্টককান্তারে
রিক্ত হস্তে শত্রুমাঝে রাত্রি-অন্ধকারে,
যিনি নানা কণ্ঠে কন, নানা ইতিহাসে
সকল মহৎ কর্মে, পরম প্রয়াসে
সকল চরম লাভে, দুঃখ কিছু নয়,
ক্ষত মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সর্ব ভয়।
কোথা মিথ্যা রাজা, কোথা রাজদণ্ড তার
কোথা মৃত্যু, অন্যায়ের কোথা অত্যাচার!

মামলা উঠল কোর্টে। অভিযোগ বন্দেমাতরম-এর কোনো বিশেষ সম্পাদকীয় প্রবন্ধের জন্যে নয়, অভিযোগ, 'ভারত ভারতীয়দের জন্য' চিঠির জন্য আর যুগান্তরের সেই প্রবন্ধের অনুবাদের জন্যে। কিন্তু ও চিঠি কার লেখা, ও প্রবন্ধ কার অনুবাদ। কে লেখক কে অনুবাদক এখন আর এই প্রশ্ন নেই—প্রশ্ন হচ্ছে কে সম্পাদক? চিঠি বা প্রবন্ধ যারই রচনা বা অনুবাদ হোক সম্পাদক দায়ী।

সম্পাদক কে ?

কাগজের উপরে সম্পাদকের নাম ছাপা হয় না, সরকার পক্ষকে স্বাধীন সাক্ষ্য দিয়ে প্রমাণ করতে হবে অরবিন্দ ঘোষই সম্পাদক।

সরকার পক্ষের উকিল চেঁচিয়ে উঠলেন : অরবিন্দ ঘোষ সম্পাদক কিনা এ জেনে দরকার নেই। আমরা জানি সমগ্র পত্রিকাই অরবিন্দ ঘোষ।

অর্থাৎ অরবিন্দই মূর্ত বন্দেমাতরম।

অরবিন্দের জবাব হল, আমি প্রবন্ধলেখক মাত্র, সম্পাদক নই। অভিযুক্ত রচনার প্রকাশের জন্য আমার কোনো দায়িত্ব নেই।

তা বললে কি চলে ? দাড়াও, দেখাচ্ছি, তুমিই সম্পাদক।

বিপিন পালকে সাক্ষী হিসাবে দাঁড় করাল সরকার।

'উঠুন কাঠগড়ায়। হলফ নিন। বলুন বন্দেমাতরম-এর সম্পাদক কে ?'

প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে অভিবাদন করলেন বিপিন পাল। বললেন, 'বিবেকের নির্দেশে আমি এই আদালতের মোকদ্দমায় কোনো অংশ নিতে অপারগ। সুতরাং আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছি না।'

'আপনি এ মামলায় সরকার পক্ষের সাক্ষী হয়ে এসেছেন তা জানেন ?'

'জানি।'

'যদি সাক্ষ্য না দেন তা হলে যে আদালতের অবমাননা করবেন তা জানেন ?'

'জানি। আর এও জানি সেই অবমাননার জন্যে আমাকে শাস্তিভোগ করতে হবে।'

কিংসফোর্ড বুঝি এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল। পরে যথাবিহিত হুকুম লিখল : আদালত অবমাননার জন্য বিপিনচন্দ্র পালের ছ'মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড।

আর অরবিন্দ ?

অরবিন্দ খালাস।

অরবিন্দ বন্দেমাতরম্-এ লিখলেন : দণ্ডবিধি আইনের চেয়েও দুর্ধর্ষ বিবেক-নির্দেশ। সেই বিবেকের মালিক হওয়ার অপরাধে আইনের বিচারে বিপিন পালের শাস্তি হল।

লেফটেনান্ট গভর্ণর অ্যানড্রু ফ্রেজার লর্ড মিণ্টোকে লিখলেন : যে পালকে আমরা তার বক্তৃতার জন্যে ধরতে পারিনি তাকে তার নীরবতার জন্যে ম্যাজিস্ট্রেট সাজা দিল।

কিন্তু মূল মামলায় কাউকে গাঁথা যাবে না এ কিংসফোর্ডের অসহ্য। মুদ্রাকর

অপূর্ব বোসকে ধরল, দোষী সাব্যস্ত করে পাঠাল জেলে। অপূর্ব যে ইংরেজি জানে না তাতে কী। একজনকে অন্তত তিন মাসের জন্যেও জেলে না পাঠালে ব্রিটিশ প্রভুত্বের মান থাকে কই ?

অরবিন্দ খালাস হয়ে এলে পর রবীন্দ্রনাথ এলেন অভিনন্দন জানাতে। হাসিমুখে বললেন, 'আপনি আমাদের ঠকালেন।'

অরবিন্দও হাসলেন। বললেন, 'সবুর করুন, বেশি দিন আপনাদের ঠকতে হবে না।'

॥ তেরো ॥

উনিশশো সাত সালের ঐ সেপ্টেম্বরেই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও রাজ-দ্রোহের অভিযোগ আনা হল।

অরবিন্দের 'বন্দেমাতরম্', ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা'। বন্দেমাতরম্-এর যেমন সাপ্তাহিক সংস্করণ আছে তেমনি 'সন্ধ্যা'রও আছে সাপ্তাহিক সংস্করণ—নাম 'স্বরাজ'।

পূর্বনাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। হুগলী জেলার 'খনিয়ান' গ্রামে ১৮৬১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে ব্রাহ্মধর্মে আকৃষ্ট হয়ে কেশবচন্দ্র সেনের শিষ্য হন। পরে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের উদ্দেশে সিন্ধু প্রদেশে গিয়ে আকৃষ্ট হন খ্রীষ্টধর্মে। পিতৃব্য কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাবে পাকাপাকি খ্রীষ্টান হয়ে যান, পূর্বনাম ত্যাগ করে নতুন নাম নেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।

শুধু খ্রীষ্টান নন, সন্ন্যাসী খ্রীষ্টান। শুধু বেশভূষায় সন্ন্যাসী নন, সমস্ত জীবন-দর্শনে এক সত্যদ্রষ্টা পুরুষ। অরবিন্দের ভাষায়, 'মানুষ নয়, জ্বলন্ত অনলশিখা'।

তাঁরই হাতের পাঞ্চজন্য এই 'সন্ধ্যা'। সন্ধ্যা অর্থ ইংরেজ-প্রভুত্বের সন্ধ্যা—দেশবাসীর ভীরুতা দুর্বলতা তামসিকতার অবসান।

অরবিন্দের মত তাঁরও সাধনা আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে জাতীয়তার উদ্বোধন।

রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'তিনি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী। অপরপক্ষে বৈদান্তিক, তেজস্বী, নির্ভীক, ত্যাগী, বহুশ্রুত ও অসামান্য প্রভাবশালী। অধ্যাত্ম-বিদ্যায় তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা ও ধীশক্তি আমাকে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট করে।...বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের সময় দেশব্যাপী চিত্তমথনে যে আবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠল তারই মধ্যে একদিন দেখলুম এই সন্ন্যাসী ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। স্বয়ং বের

করলেন 'সন্ধ্যা' কাগজ, তীব্র ভাষায় যে মদির রস ঢালতে লাগলেন তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নিজ্বালা বইয়ে দিলে।'

তার আগে ব্রহ্মবান্ধব ইউরোপ ঘুরে এসেছেন। ইংল্যাণ্ডে, অক্সফোর্ডে ও কেমব্রিজে বেদান্তের উপর ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন। কেমব্রিজ চাইল তাঁকে বেদান্তের অধ্যাপক করে রাখতে। ব্রহ্মবান্ধব ধরা দিলেন না, দেশে ফিরে এসে দেশসেবায় মেতে উঠলেন। শুধু নিজে মাতলেন না, সবাইকে তুললেন মাতিয়ে।

পঞ্চানন তর্করত্নের ব্যবস্থায় আবার হিন্দু হলেন। কিন্তু যে-সন্ন্যাসী সে-ই সন্ন্যাসী।

প্রাচীন বৈদিক আদর্শে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করার চেষ্টায় ব্রহ্মবান্ধব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিত হন। সেই সংযুক্ত প্রয়াসের ফলেই বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা। সেই ব্রহ্মচর্যাশ্রমই আজকের বিশ্বভারতী। আর রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব বলে প্রথম সম্বোধন এই ব্রহ্মবান্ধবের।

রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ প্রকাশের ওজুহাতে ব্রহ্মবান্ধব গ্রেপ্তার হলেন। যথা-রীতি মামলা উঠল কোর্টে।

কী জবাব তোমার? আসামীর উদ্দেশে প্রশ্ন করল ম্যাজিস্ট্রেট।

'যে স্বরাজব্রত উদযাপন করবার জন্যে ঈশ্বর আমাকে নির্বাচিত করেছেন, বিদেশীর আদালতে তার জবাব দিতে আমি প্রস্তুত নই।'

তবে আর কথা কী! ব্রহ্মবান্ধবের সুনিশ্চিত জেল! কিন্তু ব্রহ্মবান্ধব দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'আমাকে আটকে রাখে ফিরিঙ্গিদের কোন জেলখানারই এমন সাধ্য নেই। আমি কলা দেখিয়ে চলে যাব।'

মামলা শেষ হবার আগেই ব্রহ্মবান্ধব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁকে ক্যাম্পবেল হাসপাতালে ভর্তি করানো হল। একটা অস্ত্রোপচারের পরই তিনি মহাপ্রয়াণ করলেন।

সত্যবক্তা ব্রহ্মবান্ধব। সাধ্য নেই বিদেশী শাসন তাঁর স্বাধীনতার অভীপ্সাকে রুদ্ধ করে।

'যে জন্মভূমিকে স্বর্গের চেয়েও বড় মনে করে সেই আসল দেশভক্ত।' বলছেন অরবিন্দ: 'দাসত্বই সমস্ত জাতিকে তামসিক করে ফেলেছে। শরীরে মনে চরিত্রে একটা পক্ষাঘাত আচ্ছন্ন করে তাকে একেবারে অস্তিত্বের নিম্নতম স্তরে নামিয়ে নিয়ে এসেছে, যেন পাঁকের মধ্যে কতগুলি পোকা কিলবিল করছে—এই তমসার স্তর থেকে সত্ত্বভূমিতে তাকে তুলতে হলে তাকে রজোগুণের মধ্য

দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। গত্যন্তর নেই।

শ্রীচৈতন্য কাজীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি? নগর-কীর্তন বন্ধ করার আদেশ জারি হলে শ্রীচৈতন্য তা অমান্য করেননি? বিদ্রোহের ফলে কাজী তার আদেশ প্রত্যাহার তো করলই, শেষে নিজেই সেই কীর্তনে যোগ দিল। শান্তি— শান্তি তো নিশ্চয়ই কাম্য, কিন্তু সে সুষুপ্তির শান্তি নয়, নয় বা কারাগারের শান্তি, না বা শ্মশানের।'

আরো বলছেন অরবিন্দ: 'পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক শক্তি শারীরিক শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং তা শারীরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে যেখানে প্রপীড়ক পরশাসন জাতীয়তাবাদকে ধ্বংস করবার জন্যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে, সেই বিপৎকালে যারা চূড়ান্ত স্বাধীনতার মহামহিম আহ্বানে পরাঙ্মুখ থাকবে, তারা শুধু শারীরিক সাহসেই পরাভূত নয়, তারা আধ্যাত্মিকতায়ও পরাভূত। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে এই ক্লৈব্যই অর্জুনকে গ্রাস করেছিল—তাই গীতাতে এই আধ্যাত্মিক সত্যই উচ্চারিত হল যে, তুমি যদি তোমার স্বধর্ম ও তোমার কর্তব্যের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভীরুতাকে এনে বসাও, তা হলে তোমার সমস্ত বিকাশ-সম্ভাবনার অবসান ঘটল। যারা উপযুক্ত ক্ষেত্রে সাহসদৃপ্ত প্রতিরোধকে অভ্যর্থনা জানাতে কুণ্ঠিত হয় তারা যেন আজীবন অপমানভোগের কলঙ্কভাগীদের দলে গিয়ে তাদের নাম লেখায়। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি কী? ভিত্তি আমাদেরই দেশবাসীর অন্তর্নিহিত শক্তিতে আমাদের নির্বিচল বিশ্বাস। তাই আমাদের উচিত হবে সুযোগ পাওয়ামাত্রই সাহসিক কর্মের পরিচয় দেওয়া—আর শক্তিকে অনবরত সক্রিয় করে তোলার মধ্যেই আমাদের জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতি। আর এই ক্রমান্বিত অগ্রগতিতেই আমাদের চরমতম জয়—সেই জয়ই এশিয়ার দরকার, ভারতবর্ষের দাবি।'

বিবেকানন্দের বাণীই আবার উচ্চারিত হল: কাপুরুষত্বের চেয়ে পাপ নেই— কাপুরুষ উদ্ধার হয় না। এক ঘা খেয়ে দশ ঘা তেড়ে মারতে হবে—তবে মানুষ! সাহসী হও, সাহসী হও—মানুষ একবারই শুধু মরে। বৎসগণ, কামড়ে পড়ে থাকো, আমার সন্তানগণের মধ্যে কেউ যেন কাপুরুষ না থাকে। যদি তোমরা সাহসী না হও, তাহলে তোমাদের বিষয়ে আমাকে জলাঞ্জলি দিতে হবে। আমি তোমাদের মরতে দেখলেও খুশি হব, তবু তোমাদের লড়তে হবে। সেপাইয়ের মত আজ্ঞাপালনে জান কবুল করে বরং নির্বাণলাভ করবে তবু ভীরুতাকে আমল দেওয়া চলবে না। জয় মা, জয় মা কালী, কালী, কালী। রোগ শোক আপদ

দুর্বলতা সব গেছে তোমাদের। মহাবিজয়, মহালক্ষ্মী, মহাশ্রী তোমাদের। মাভৈঃ!

'রাজনীতি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম' সোজাসুজি বলছেন অরবিন্দ : 'একমাত্র ক্ষত্রতেজেই স্বাধীনতা ও মহনীয়তা অর্জন করা যায়—রক্ষণ করা যায়।'

কিন্তু বহির্মুখী শক্তিকে শেষ পর্যন্ত অন্তর্মুখী করা চাই।

'ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় দিব্যচক্ষুতে যাহা দেখিয়াছিলেন, দেখিয়া বার বার বলিতেন, শক্তিকে অন্তর্মুখী কর—' লিখছেন অরবিন্দ : 'কিন্তু সময়ের দোষে তখন কেহ তাহা করিতে পারি নাই, স্বয়ং করিতে পারেন নাই, কিন্তু ভগবান আজ তাহা ঘটাইয়াছেন। ভারতের শক্তি অন্তর্মুখী হইযাছে। যখন আবার বহির্মুখী হইবে, আর সেই স্রোত ফিরিবে না, কেহ রোধ করিতে পারিবে না। সেই ত্রিলোকপাবনী গঙ্গা ভারত প্লাবিত করিয়া পৃথিবী প্লাবিত করিয়া অমৃত স্পর্শে জগতের নূতন যৌবন আনয়ন করিবে।'

মেদিনীপুরে প্রাদেশিক কনফারেন্স বসছে ১৯০৭ এর ৭ই ডিসেম্বর। দেশের রাজনীতি তখন দুই দলে বিভক্ত—জাতীয়তাবাদীদের নেতা অরবিন্দ আর মডারেট বা নরমপন্থীদের নেতা সুরেন্দ্রনাথ। জাতীয়তাবাদীদের লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা আর নরমপন্থীদের লক্ষ্য হোমরুল বা স্বায়ত্তশাসন।

কলকাতার কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব ছিল পূর্ণাঙ্গ স্বরাজলাভ—নরমপন্থীরা তার অর্থ করতে চাইল ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রবর্তন—বিশুদ্ধ স্বাধীনতা বলতে দূরের কথা ভাবতেও যেন এদের সাহসে কুলোয় না। অরবিন্দ বুঝলেন মেদিনীপুরে অবধারিত একটা সংঘর্ষ বাধবে।

ছয়ুই ডিসেম্বর অরবিন্দ মৃণালিনীকে চিঠি লিখলেন :

প্রিয় মৃণালিনী,

আমার এইখানে এক মুহূর্তও সময় নাই ; লেখার ভার আমার উপর, কংগ্রেস সংক্রান্ত কাজের ভার আমার উপর, 'বন্দেমাতরমে'র গোলমাল মিটাইবার ভার আমার উপর। আমি পেরে উঠছি না। তাহা ছাড়া আমার নিজের কাজও আছে, তাহাও ফেলিতে পারি না।

আমার একটি কথা শুনিবে কি ? আমার এখন বড় দুর্ভাবনার সময়, চারিদিকে যে টান পড়েছে পাগল হইবার কথা। এই সময় তুমি অস্থির হইলে আমারও চিন্তা ও দুর্ভাবনা বৃদ্ধি হয়, তুমি উৎসাহ ও সান্ত্বনাময় চিঠি লিখিলে আমার বিশেষ শক্তিলাভ হইবে, প্রফুল্ল চিত্তে সব বিপদ ও ভয় অতিক্রম করিতে পারিব।

জানি দেওঘরে একলা থাকিতে তোমার কষ্ট হয়, তবে মনকে দৃঢ় করিলে এব
বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিলে দুঃখ তত মনের উপর আধিপত্য করিতে পারি
না। যখন তোমার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে, তোমার ভাগ্যে এই দুঃ
অনিবার্য, মাঝে মাঝে বিচ্ছেদ হইবেহ, কারণ আমি সাধারণ বাঙ্গালীর ম
পরিবার বা স্বজনের সুখ জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিতে পারি না। এই অবস্থা
আমার ধর্মই তোমার ধর্ম, আমার নির্দিষ্ট কাজের সফলতায় তোমার সুখ ন
ভাবিলে তোমাব অন্য উপায় নাই। আর একটা কথা, যাহাদের সঙ্গে তু
এখন থাক, তাঁহারা অনেকে তোমার আমার গুরুজন, তাঁহারা কটুবাক্য বলিলে
অন্যায় কথা বলিলে, তথাপি তাঁহাদের উপর রাগ করো না। আর যাহ
বলেন তাহা যে সবই তাঁহাদের মনের কথা বা তোমাকে দুঃখ দিবার জন্যে ব
হইয়াছে তাহা বিশ্বাস করো না। অনেক বার রাগের মাথায় না ভেবে ক
বেবোয়, তাহা ধরে রাখা ভাল নয়। যদি নিতান্ত না থাকিতে পার আমি গিরি
বাবুকে বলিব, তোমার দাদামহাশয বাড়িতে থাকিতে পারেন, আমি যতদি
কংগ্রেসে থাকি।

আমি আজ মেদিনীপুরে যাব। ফিরে এসে এখানকার সব ব্যবস্থা ক
সুরাটে যাব। হয়তো 15th বা 16th-ই যাওয়া হইবে। জানুয়ারি ২রা তারিখে
ফিরিয়া আসিব। তো—

একদিন আগেই ৬ই ডিসেম্বর পশ্চিম বাংলার ছোট লাট এনড্রু জ ফ্রেজারের ট্রে
বোমা দিয়ে উডিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু বোমা যদি বা ফাটল, ট্রেন উড়ল ন

বাংলার বিপ্লবীদের এই প্রথম সশস্ত্র উত্থান। আগে একবার পূর্ববঙ্গের ছো
লাট ফুলারকে বধ করবার পরিকল্পনা হয়েছিল, কিন্তু সেটা রূপায়িত হতে
পারেনি।

সমস্ত পরিকল্পনা তৈরি হয় মানিকতলার বাগানে, যার 'হেড মালী' হচ্ছে
বারীন ঘোষ। বারীন ঘোষই ছেলে যোগাড করে, শিক্ষায়-দীক্ষায় তাদে
মজবুত করে তোলে, অস্ত্র ও অর্থ যোগাড করার ভারও তার উপর। তৈ
অস্ত্র না পাওয়া যায়, দেশী বোমা আছে। বোমা তৈরির ভার হেমচন্দ্রের উপর
উল্লাসকর তার সহকারী।

সমস্ত রূপরেখার পিছনে অরবিন্দের প্রেরণা, অরবিন্দের মস্তিষ্ক। খণ্ড-খণ্ড
সাহসিক কাণ্ড থেকেই দেশ সামগ্রিক বিপ্লবে বিস্ফারিত হবে। অরবিন্দ থেকে

ন, তিনি সমগ্রের। তাঁকে বাগানে যেতে হয় না, তিনি নেপথ্যে অবস্থান করেন। তিনিই সার্থক নেপথ্য-নায়ক।

শুধু ফ্রেজারকে নয়, ঠিক হল কিংসফোর্ডকেও সরাতে হবে। একজন গভর্নর, আরেকজন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট। একজন আইন বানাচ্ছে আরেকজন জেল দিচ্ছে। নতুন আবার আইন করেছে সভা করতে হলে আগে থেকে পুলিসের অনুমতি নিতে হবে। এদিকে পত্রিকার বিরুদ্ধে কথায় না-কথায় রাজদ্রোহের মামলা—'যুগান্তর' আবার অভিযুক্ত হয়েছে—সম্বল ছিল শুধু বক্তৃতায় অগ্নিবর্ষণ—তাও, তার উপর শর্ত-আরোপ। বিপ্লবীদের কাছে অসহ্য ঠেকল। বারীন বললে, বাক্যব্যয়ে আর শক্তিক্ষয় নয়। এবার হাতে-কলমে দেখাতে হবে।

ছয়ুই ডিসেম্বর ফ্রেজার স্পেশ্যাল ট্রেনে রাঁচি থেকে ফিরছে কলকাতায়। ঠিক হল রাত্রে খড়্গপুরের দশ-বারো মাইল দূরে নারায়ণগড স্টেশনের কাছাকাছি বোমা পুঁতে রাখতে হবে—লাটের স্পেশ্যালের আগে আর ট্রেন নেই। বিভূতিকে ভার দেওয়া হয়েছিল, সে একের পর এক ঠিক-ঠিক বোমা পুঁতল। কিন্তু ফল হল না। রেল-লাইন বেঁকে গেল, এঞ্জিনও জখম হল কিন্তু ফ্রেজারকে ছোঁয়া গেল না।

এ কার কাজ! পুলিস ভেবেও পেল না এর পিছনে বিপ্লববাদীদের অস্তিত্ব আছে। তাই মানিকতলা বাগানের ছেলেরা কেউ ধরা পড়ল না। দোষ কোথাও চাপাতে হয় তাই উদ্যোগী পুলিস রেলের কটা কুলিকে ধরলে। সাড়ম্বরে তাদের শাস্তি দিল ম্যাজিস্ট্রেট।

খবরটা অরবিন্দের কানে কোন না পৌঁছুল, কিন্তু তখন তিনি প্রকাশ্যে সম্মিলন নিয়ে ব্যস্ত, ওদিকে চোখ ফেরালেন না। 'হেড-মালী' বারীনই ও সব ঝাট পোয়াবে।

কিন্তু মেদিনীপুরে এ কী হতে যাচ্ছে! মডারেটরা জোট বাঁধল, জাতীয়তাবাদীদের কিছুতেই জিততে দেবে না। এমন কি তারা পুলিসকেও উসকে দিল পক্ষের কয়েকজনকে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে নিবৃত্ত করা হোক। সব চেয়ে চরম হল মান মঞ্চের উপর পুলিস সুপারইণ্টেণ্ডেণ্টকে বসিয়ে সুরেন্দ্রনাথ সভা করলেন। আদৌ জাতীয় সম্মিলন নয়, মডারেটদের ঘরোয়া বৈঠক—জাতীয়তাবাদীরা সভা ত্যাগ করল সদলে।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই পুরনো কথাই সম্বল করল মডারেটরা—সেই আপোস, সেই বিনয়বশ্যতা, সেই স্বায়ত্তশাসন। জাতীয়তাবাদীরা পাল্টা সভা করল—

তাদের বক্তব্য বিপ্লব, লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা। স্বাধীনতার বিকল্প নেই। ওখানে আর যাই চলুক, গোঁজামিল চলে না।

কেউ-কেউ বললে, মডারেটদের বাদ দিয়েই আমরা পাল্টা প্রতিষ্ঠান গড়ব না, সেটা ঠিক হবে না, কেউ-কেউ বিপরীত যুক্তি দেখাল। উচিত হবে কংগ্রেস বর্জন করা নয়, মডারেটদের হাত থেকে কংগ্রেসকে উদ্ধার করা।

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে সুরাটে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হচ্ছে—সেখানে এবার বিরাট পরীক্ষা হবে কে জেতে—মডারেট না ন্যাশন্যালিস্ট—আপোস না বিপ্লব, স্বায়ত্তশাসন না সাবিক স্বাধীনতা!

মডারেটদের হাত থেকে কংগ্রেসকে শুধু ছিনিয়ে নেওয়া নয়, কংগ্রেস থেকে মডারেটদের একেবারে মুছে ফেলাই হবে বিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপ।

মঞ্চে পুলিস বসিয়ে যারা সভা করে তাদের ইতিহাস ক্ষমা করে না।

মেদিনীপুর থেকে কলকাতা ফিরে এসে বিডন স্কোয়ারে সভা ডাকলেন অরবিন্দ। বক্তা তিনি একা—বক্তব্য সেই এক। সেই চার প্রস্থ প্রস্তাব—স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট আর জাতীয় শিক্ষা—যা জাতীয়তাবাদীরা প্রচার করে এসেছে, তাই আবার সমর্থিত হল। হ্যাঁ, স্বরাজ—মনে রেখো বিদেশের পুলিসের প্রশ্রয়চ্ছায়ায় বসে রাজ্যচালনা নয়, নিজ সামর্থ্যের উপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সর্বত্র ভ্রাতৃত্ব-স্থাপন।

সভায় গৃহীত প্রস্তাব সুরাট কংগ্রেসে পাঠিয়ে দেওয়া হল। আপোস নয় বিপ্লব—সুরাটকে আগে থেকেই তাতিয়ে রাখা ভালো।

অরবিন্দ রওনা হলেন বিশে ডিসেম্বর, থার্ড ক্লাসে, সঙ্গে একই কামরায় বারীন আর শ্যামসুন্দর। বন্দেমাতরম-এর মামলার পর অরবিন্দ তখন জনবরেণ্য হয়ে উঠেছেন, তাঁকে দেখবার জন্যে প্রত্যেক স্টেশনেই প্রচণ্ড ভিড় হতে লাগল, কারু হাতে ফুলের মালা, কারু হাতে বা মণ্ডা-মেঠাই। কিন্তু অরবিন্দ কোথায়? জনতা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাতেই অরবিন্দকে খুঁজে বেড়ায়, কেউ কল্পনাও করতে পারে না এত বড় এক গণ্যমান্য ব্যক্তি নিরীহ থার্ড ক্লাসে যেতে পারে। আর অরবিন্দ তো এমন নন যে অভিনন্দনের গন্ধ পেয়ে আনন্দে মুখ বাড়াবেন বা দাঁড়াবেন দরজা খুলে। তিনি যেমন নীরব তেমনি নির্লিপ্ত।

ঐ যে—ঐ যে—কেউ বুঝি আভাস পেয়ে থার্ড ক্লাসের কামরার দিকে ধাওয়া করল। ততক্ষণে গার্ড সিটি দিয়েছে, দুলিয়েছে সবুজ নিশান। দু-এক পলক ফেলতে-না-ফেলতেই ট্রেন ছেড়ে দিল। প্রাণভরে দেখা হল না।

বাইশে ডিসেম্বর নাগপুরে সদলবলে নামলেন অরবিন্দ। থাকলেন দু দিন। উন্মুক্ত উদ্বেল লোকসমুদ্রের পারে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলেন। 'আমার রসনার চেয়ে আমার লেখনী বেশি বলবান—'

কলকাতা ছাড়বার আগে বন্দেমাতরম্-এ তিনি যা লিখেছিলেন তারই পুনরাবৃত্তি করলেন। 'আমরা তীর্থযাত্রী হয়ে চলেছি মায়ের মন্দিরে। আমাদের বিরাট কাজ সম্পন্ন করতে হবে, আমাদের অযত্নশীল ও অর্ধান্তরিক হলে চলবে না। নিশ্চিত জেনো উনিশশো সাত সাল আমাদের ভাগ্যপরিবর্তনের কাল, আর এ কখনো মনে কোরো না যে সুরাট কংগ্রেস অন্যান্য বছরের কংগ্রেসের মতই সহজ হবে। সকলে লক্ষ্য রেখো ভবিষ্যতে আমরা আমাদের মায়ের বসবাসের জন্যে যে বাড়ি তৈরি করতে চাইছি, মায়ের বাড় মানেই স্বরাজ-সদন, আমাদের মুক্তির নিলয়, সেই আনন্দধামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবার সুযোগ যেন আমরা আমাদের অনুপস্থিতি ও অনবধানতাবশতঃ না হারাই।'

আর যাই হোক, স্বরাজের অর্থসঙ্কোচ সহ্য করব না।

মডারেট আর জাতীয়তাবাদী দুই দলই শক্তিবৃদ্ধির আয়োজনে তৎপর হল। মডারেট দলে ফিরোজ শা মেহতা, গোখলে, সুরেন্দ্রনাথ আর জাতীয়তাবাদীদের দলে তিলক, অরবিন্দ, মুঞ্জে আর চিদম্বরম পিলে। কংগ্রেস নাগপুরে হবারই কথা ছিল, মেহতার আগ্রহে স্থান পরিবর্তিত হল সুরাটে। আর সদ্যকারামুক্ত লাজপত রায় অসম্মত হবার দরুন সভাপতি নির্বাচিত হল রাসবিহারী ঘোষ।

গুজরাট মডারেটদের আস্তানা, তাই সুরাট কংগ্রেসে তাদেরই জয়জয়কার হবে সেই আনন্দে নরমপন্থীরা তপ্ত হয়ে উঠল।

বাঙালী ডেলিগেটরা বললে, সুরাটে নয়, নাগপুরেই আমরা আলাদা কংগ্রেস বসাব। মুঞ্জে আর পিলে এ প্রস্তাব সমর্থন করল কিন্তু তিলক বাদ সাধলেন, টেলিগ্রাম করলেন : ঈশ্বরের দোহাই, বিভেদ সৃষ্টি করবেন না।

মেনে নিলেন অরবিন্দ। চলো তবে সুরাট চলো।

অধিবেশনের আগের দিন সুরেন্দ্রনাথ বাঙালী ডেলিগেটদের ডেকে সভা করলেন। একটা আপোসনামার খসড়া তৈরি করেছেন, সবাইকে বললেন তাই মেনে নিতে। ডেলিগেট সত্যেন বোস খসড়াটা কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলল টুকরো টুকরো করে। সভা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হল আচমকা।

দু দলই তোড়জোড় চালিয়েছে কে কত ভোট আদায় করতে পারে। রণকৌশল কোথায় কী হবে তাও খুঁটিয়ে দেখতে লাগল উভয়ে। ঘরোয়া বৈঠকে।

জাতীয়তাবাদীদের বৈঠকে সভাপতি অরবিন্দ। নির্বাক, গম্ভীর, বিনিশ্চল। দৃষ্টি সুদূরে প্রসারিত, যেন অতল ভবিষ্যতে তা অবগাহন করছে। যা বলবার বলছেন তিলক, সোজাসুজি স্পষ্ট ভাষায়, বাক্যে বিদ্যুৎ নেই গর্জন নেই—তবু লোক খাড়া কানে শুনছে, উঠে যাচ্ছে না। বলছেন তো বলছেনই তিলক—দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা হল, আকাশে তারা ফুটল, কে একজন লণ্ঠন জ্বেলে টেবিলের উপর রাখলে, তবুও তিলক বলে যাচ্ছেন, বুঝিয়ে যাচ্ছেন।

অরবিন্দ আর তিলক। একজন অধ্যাপক আরেকজন আইনজ্ঞ। একজন কবি আরেকজন গাণিতিক। একজন স্বপ্নবিহারী আরেকজন যুক্তিনিষ্ঠ। একজন অধ্যাত্মজিজ্ঞাসু আরেকজন বাস্তবপন্থী। কিন্তু এক জায়গায় দুজনের মিল, দুজনেই বিপ্লববাদী—প্রকাশ্যে অহিংস রাজনীতি করলেও গোপনে দুজনেই সশস্ত্র বিদ্রোহের সহায়ক।

দুজনেই আয়াসকঠিন, সঙ্কল্প-উদযাপনে বদ্ধপরিকর।

জাতীয়তাবাদীরা বুঝতে পারছিল মডারেটরা এখানেও মেদিনীপুরের খেলা খেলবে। অর্থাৎ স্বরাজের সংজ্ঞাটা পর্যাপ্ত অর্থে জীবন্ত রাখবে না, অর্থের হ্রাস ঘটিয়ে সংজ্ঞাটাকে স্তিমিত করে আনবে। অসম্ভব। কিন্তু ভোটে জাতীয়তাবাদীদের আশা কই? মডারেট ডেলিগেটদের মোট সংখ্যা ১৩০০ কিন্তু জাতীয়তাবাদীরা ১১০০, সাকুল্যে দুশো কম। কোন দলের জয়লাভ হবে তা অঙ্ক না কষেও বলা যায়।

অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ উঠলেন অবশেষে রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি করার প্রস্তাব নিয়ে। তৎক্ষণাৎ তিলক উঠলেন, পাল্টা প্রস্তাব নিয়ে—লাজপত রায়কে সভাপতি করা হোক। চেয়ারম্যান মালভি তিলককে নিরস্ত করতে চাইলেন, আপনার এখন বলবার কোনো এক্তিয়ার নেই। নিশ্চয় আছে—ডেলিগেট হিসেবে আমার বলবার অধিকার কেউ কাড়তে পারে না। তিলক দাঁড়ালেন যেন দৃঢ় লৌহমানব।

তুমুল হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। গুজরাটী ভলানটিয়াররা চেয়ার তুলল তিলককে মারবার জন্যে। সঙ্গে সঙ্গে মারাঠীরাও আগুন হয়ে উঠল। তারা মঞ্চের উপর জুতো ছুঁড়ে মারল। একটা লাল চামড়ার তৈরি মারাঠী চটি, তলাটা আগাগোড়া শিসে দিয়ে মোড়া—রাসবিহারীর উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত হল। জুতোটা এসে পড়ল সুরেন্দ্রনাথের কাঁধে, সেখান থেকে ছিটকে একেবারে মেহতার কোলে। তুলকালাম কাণ্ড। শুধু জুতো ছুঁড়েই ক্ষান্ত হল না মারাঠীরা, তারা

মঞ্চের উপর উঠে এসে হামলা চালাল। মডারেটরা চেয়ার ফেলে পালাল উর্ধ্বশ্বাসে।

ভেঙে গেল কংগ্রেস—আবেদন-নিবেদনের কাতর কীর্তন।

এতটা বুঝি তিলকেরও অভাবনীয় ছিল। হ্যাঁ, তাঁর পরামর্শ নেবার সময় হয়নি—অরবিন্দ নিজের দায়িত্বে নিজের পরিচালনায় কংগ্রেস ভেঙে দিলেন।

এইই ইতিহাসের সঙ্কেত। বললেন অরবিন্দ, এইই ঈশ্বরের ইচ্ছা।

॥ চৌদ্দ ॥

চারদিকে প্রচণ্ড তাণ্ডব—কিন্তু অরবিন্দ বসে আছেন প্রশান্তির প্রতিমূর্তি। নির্বাক, নির্বিকার। নীরবতার সমুদ্রে প্রস্ফুট অরবিন্দ।

নীরবতাই সমস্ত—Silence is all—তাঁরই কবিতার প্রাঞ্জল পূর্বাভাস।

'নীরবতা সর্বাঙ্গীণ—এই কথা বলে মহাজন,
নিঃশব্দ-ই সাক্ষীরূপে যুগান্তের কর্মকাণ্ড করে নিরীক্ষণ,
নিঃশব্দের গ্রন্থে লেখে মহালিপিকার তার বিশ্ব-পৃষ্ঠার লিখন—
আদ্যোপান্ত নীরবতা—এই বাক্য বলে মহাজন॥'

এবার, যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, নেমে আসুক প্রবল উৎপীড়ন, দারুণ দহন দুঃসহ যন্ত্রণা—এক কথায়, ঈশ্বরের হাতুড়ির ঘা, সেই আঘাতেই আমাদের মায়ের শৃঙ্খল ছিন্ন হয়ে যাবে। আমরা ঋজু হব, বলিষ্ঠ হব, পূর্ণে প্রকাশিত হব। আমাদের লাঞ্ছনা ঈশ্বরেরই বাঞ্ছিত।

সুরাটেই মারাঠী যোগী শাখারে বাবার সঙ্গে অরবিন্দের আলাপ হল। নীরবে শাখারে বাবা অরবিন্দকে মনে করিয়ে দিলেন তুমি রাজনীতিতে মেতে গিয়ে তোমার যোগসাধনায় শৈথিল্য করছ।

অন্তরে ঠিক ডাক দিল। সত্যি তাই। রাজনীতি ও পত্রিকা তাঁর নিত্যকার প্রাণায়ামকেও অনিয়মিত করে তুলেছে। না, অমনোযোগী হলে চলবে না। আসনে ও আদর্শে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হতে হবে।

যোগই সমস্ত শক্তি ও শান্তির উৎস। যোগেই সমস্ত কর্মের উদ্যোগ।

বারীনকে বললেন, 'কলকাতায় ফিরব না। বরোদায় যাব। বরোদায় কোনো যোগীর সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দে।'

যোগী বিষ্ণু ভাস্কর লেলে-র কথা জানত বারীন। শুনল তিনি গোয়ালিয়রে

আছেন। বারীন তাঁকে টেলিগ্রাম করল, দয়া করে একবার বরোদায় আসুন।

কেন আসুন, সে কথা টেলিগ্রামে কিছু বলা নেই। তবু কেন কে জানে লেলে মহারাজ টেলিগ্রাম পেয়ে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তাঁর অনুভব হল কোনো শক্তিশালী আধারকে তাঁর দীক্ষা দিতে হবে।

অরবিন্দের পৌঁছুবার আগেই লেলে হাজির হলেন বরোদায়।

প্রাণায়ামে অনেক ফল পাচ্ছিলেন অরবিন্দ। সেই ১৯০৫ সালে ব্রহ্মানন্দের শিষ্য ইঞ্জিনিয়র দেওধরের কাছ থেকে শেখা। প্রাণায়াম না করলে যোগ হবে না। যোগের প্রথম সোপানই হচ্ছে প্রাণায়াম।

প্রাণায়াম মানে কী? আয়াম অর্থ বিস্তার। বিস্তার এখানে বৃহতের ভাবনা। চিত্তের সাত্বিক উদ্ভাসন। প্রাণবায়ু চিত্তভূমির মধ্যে দিয়ে আমাদের এই আধ্যাত্মিক উদ্ভাসনে নিয়ে যায়। প্রাণায়াম হচ্ছে তাই প্রাণের নিয়মন, প্রাণের নিরূপণ, স্তম্ভনবৃত্তির সাহায্যে উদ্ভাসনে স্থিরতা-সঞ্চার। সোজা কথায়, লণ্ঠনের শিখাকে ঘিরে চিমনি পরানো।

প্রাণায়াম শুধু শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া নয়, প্রাণবায়ুকে আয়ত্ত করবার জন্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের সংযম বা স্তম্ভন। প্রকৃতির ইচ্ছাধীন না হয়ে প্রকৃতিকে ইচ্ছাধীন করা। স্বয়ং সৎ-স্বরূপকে গিয়ে ধরা। জগতের সমস্ত শক্তি এক প্রাণরূপে সাধারণ শক্তিতে পর্যবসিত। সুতরাং যে প্রাণকে ধরেছে সে জগতে যত কিছু মানসিক বা দৈহিক শক্তি আছে সব কিছুকেই ধরেছে। যে প্রাণকে জয় করেছে সে শুধু নিজের মন নয়, সকলের মন জয় করেছে। তখন তার কাছে অনন্ত শক্তির দ্বার উন্মুক্ত, ক্ষুদ্রতম পরমাণু থেকে বৃহত্তম সূর্য পর্যন্ত তার বশীভূত।

প্রবল ইচ্ছাশক্তি লাভ করাই প্রাণায়াম সাধনের লক্ষ্য। এক কথায় কুণ্ডলিনীর জাগরণ ঘটানো। কুণ্ডলিনী জাগলেই তবে জ্ঞানাতীত অনুভূতি বা আত্মানুভূতি সম্ভব হবে।

এই সংসার অতিক্রম করে আমি ভগবানের কাছে পৌঁছুব—এর কম হলে আমার চলবে না। এই পৌঁছুনোর জন্যেই যোগ। বিবেকানন্দ বলেছেন, যোগ মানে Yoke—জুড়ে দেওয়া। জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলনস্থাপন।

আর রাজযোগ বা অষ্টাঙ্গ যোগ পরিপূর্ণ বিজ্ঞান।

অষ্টাঙ্গ অর্থ আটটি পরিচ্ছেদ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি।

যম অর্থ সংযম—দেহে-মনে-কথায় হিংসা না করা, লোভ না করা, পবিত্র

থাকা, সত্যনিষ্ঠ হওয়া ও বৃথা দানগ্রহণ না করা বা অপরিগ্রহে অচল থাকা। নিয়ম অর্থ শরীরের যত্ন, স্নান, পরিমিত আহার ও নিদ্রা। আসন, মেরুদণ্ডের উপর জোর না দিয়ে কটিদেশ স্কন্ধ ও মাথা ঋজুভাবে রেখে বসা। তারপরে প্রাণায়াম—প্রাণবায়ুকে আয়ত্ত করবার জন্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ।

প্রাণায়ামের তিন অঙ্গ। পূরক—শ্বাসগ্রহণ, কুম্ভক—শ্বাসরোধ আর রেচক—শ্বাসত্যাগ। নিয়মিত এইটুকু পরিশ্রমেই এত বড় উন্মোচন!

কোনো শক্তিই সৃষ্টি করা যায় না। তাকে শুধু ঈপ্সিত পথে চালনা করা যায়। 'যে বিরাট শক্তি এখনই আমাদের অধিকারে আছে' বলছেন বিবেকানন্দ, 'তাকে আয়ত্ত করতে শিখে প্রবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা তাকে পাশব হতে না দিয়ে আধ্যাত্মিক করে তুলতে হবে।' প্রসুপ্ত দেবত্বকে প্রকটিত করে তোলাই যোগসাধন।

তারপর প্রত্যাহার। প্রত্যাহার হচ্ছে মনকে গুটিয়ে এনে ঈপ্সিত বস্তুতে কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা। অর্থাৎ মনকে বহির্মুখ হতে না দিয়ে অন্তর্মুখ করে তোলা। তারপর ধারণা—ধারণা হচ্ছে কোনো এক বিষয়ে মনকে একাগ্র করা। তারপর ধ্যান—কোনো এক বিষয়ে মনের নিরবচ্ছিন্ন চিন্তা। সর্বশেষে সমাধি। সেইখানেই প্রজ্ঞালোক।

অরবিন্দের প্রাণায়ামে ব্যাঘাত হচ্ছিল, ছন্দ কেটে যাচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত ঘোরতর অসুখ হয়ে পড়ল। না, আর অবহেলা নয়, আবার প্রাণায়ামে ফিরে যাব।

এতদিনের প্রাণায়ামে কী ফল পেলেন অরবিন্দ?

অরবিন্দ বলছেন, 'দেখলাম আমার স্বাস্থ্য ভালো হচ্ছে, ওজন বাড়ছে, আমি মোটা হচ্ছি, আমার গায়ের রঙ ফর্সা হচ্ছে। আমি আমার চারপাশে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ দেখতে লাগলাম—দেখতে পেলাম ছোট-ছোট আকারের মানুষ নড়াচড়া করছে। দেখা কিন্তু মুদ্রিত চোখে নয়, জাগ্রত চোখে। সব চেয়ে বেশি যেটা অনুভব করলাম সেটা হচ্ছে শরীরে বিপুল কর্মবেগের চাঞ্চল্য। খুব দ্রুতগতিতে কবিতা লিখতে লেগে গেলাম। আগে কী কষ্টসাধ্য ছিল কবিতা লেখা, একবার উৎসটা একটু খুলত, আবার শুকিয়ে যেত। এবার যেন দু-কূল ছাপিয়ে বান ডাকল—গদ্য-পদ্য দুইই প্রবল বেগে লিখতে লাগলাম। সেই বেগ আর থামেনি কোনোদিন। পরে যদি কখনো না লিখে থাকি, বুঝতে হবে আমি তখন অন্য কাজে ব্যাপৃত, কিন্তু যখনই লিখতে বসেছি তখনই সেই স্রোত নেমে আসত।

একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করতাম, এমনিতে কী ভীষণ মশা, কিন্তু প্রাণায়ামে বসলে পর একটা মশাও কামড়াত না। আরো একটা অভিনব অভিজ্ঞতা হত —লালাতে একটা অদ্ভুত রসের আস্বাদ পেতাম। এ নাকি এক ধরনের অমৃত। এ অমৃত নাকি মস্তিষ্ক থেকে ঝরে পড়ে আর এর ফলে নাকি অমরত্ব লাভ হয়।'

একটি সাধুর কথা উঠল। সে এই অমৃতরস পাবার আশায় বারে বারে নিজের জিভ কাটত। পরিণামে একদিন সে পাগল হয়ে গেল।

অরবিন্দ বললেন, 'ওটা খেচরী মুদ্রা। সাধু বোধ হয় ভুল রসটা পেয়ে থাকবে।' এমনি আরেক সাধুর পাল্লায় পড়েছিল বারীন। সে বারীনকে কত প্রতিশ্রুতি দিল প্রলোভন দেখাল—জিব কেটে ফেল, অমৃতরস পাবে। বারীন রুখে উঠল: কথনো না। সাধু নাছোড়বান্দা। সে কাকুতি-মিনতি শুরু করল। তাতেও বারীন অটল তখন সাধু ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা বললে, 'ব্যাটা ভীরু বাঙালী।' বারীন বললে, 'বাঙালী হই কি অবাঙালী হই কিছুতেই আমি জিভ কাটছি না বাবা।'

বলে হাসলেন অরবিন্দ।

'দেশের কাজে যখন বাংলায় গেলাম, প্রাণায়ামে মহা অনিয়ম ঘটতে লাগল।' আবার বললেন অরবিন্দ, 'ফলে মরণাপন্ন অসুখ হল, প্রায় শেষ অবস্থা। এবার হালে পানি না পেয়ে যখন নির্দেশ খুঁজে বেড়াচ্ছি তখন লেলে-র সঙ্গে দেখা হল। সর্দার মজুমদায়ের বাড়িতে, উপরের তলায়।'

সুরাট কংগ্রেসের পর অরবিন্দ বরোদায়, তাঁর পুরনো কর্মস্থলে, ফিরে আসছেন এ খবর পেয়ে সারা শহর মেতে উঠল। বরোদা কলেজের অধ্যক্ষ আদেশ জারি করলেন, যেহেতু অরবিন্দ রাজনৈতিক আন্দোলনে লিপ্ত, তাঁকে যেন কলেজের ছাত্ররা কোনো সম্বর্ধনা না জানায়। ছাত্ররা নির্দেশ মানল না। অরবিন্দের গাড়ি কলেজের কাছে আসতেই ছেলেরা দলে দলে বেরিয়ে এল, গাড়ির ঘোড়া খুলে দিয়ে নিজেরাই গাড়ি টানতে লাগল। ইনি কে—কাকে নিয়ে চলেছ?

ইনি আমাদের প্রাক্তন অধ্যাপক।

এই শীতে গায়ে শুধু একটা সাধারণ শার্ট, একটা গরম আলোয়ান পর্যন্ত নেই, কে এই কৃচ্ছ্রসাধক? হ্যাঁ, মাছ-মাংস পর্যন্ত খান না। ট্রেনে থার্ড ক্লাসে এসেছেন। সঙ্গে একটা বিছানার নামগন্ধও নেই। বেঞ্চির কাঠের উপর শুয়ে ঘুমোন।

বালিশ? বাহুই তাঁর স্বাভাবিক উপাধান।

সর্দার মজুমদার অরবিন্দকে একটি পশমি শাল উপহার দিলেন। মন্দ কি! শাল গায়ে দিলেন অরবিন্দ।

বরোদা তাঁকে বক্তৃতা না দিইয়ে ছাড়বে না। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে অরবিন্দ তিন-তিনটি বক্তৃতা দিলেন, সমস্ত বরোদা ভেঙে পড়ল। গুজরাট থেকে ছোটলাল পুরানী এল নিভৃতে দেখা করতে। অরবিন্দ সাদা কাগজে পেনসিলে নকশা কেটে তাকে তাঁর বিপ্লব-কর্মের রীতি-পদ্ধতি বোঝালেন। বললেন, বারীনের সঙ্গে কথা বলো। সে ব্যাপারটা আরো বিশদ করে দেবে।

গুজরাট যে বিপ্লবভাবনায় তেজোজ্জ্বল হয়েছিল তার মূলে অরবিন্দ—অরবিন্দের প্রেরণা।

সমস্ত বিপ্লবমন্ত্রের উদ্গাতাই অরবিন্দ।

মানুষের ঈশ্বর হয়ে ওঠা, মর্ত্য পৃথিবীকে স্বর্গরাজ্যে রূপান্তরিত করাই বৃহত্তম বিপ্লব।

লেলের সঙ্গে দেখা হল দণ্ডিয়া বাজারে কাশীরাও যাদবের বাড়িতে। মাত্র আধ-ঘণ্টার জন্যে। অরবিন্দ ব্যস্ত মানুষ, নানা দিকে তাঁর ডাক। লেলে বললে, কয়েকদিনের জন্যে ও-সব হট্টগোল বন্ধ করুন। আমার সঙ্গে কাটান চুপচাপ।

অরবিন্দ হঠাৎ সমস্ত কাজকর্মের থেকে ছুটি নিয়ে গা-ঢাকা দিলেন। সর্দার মজুমদারের দোতলায় একটি ছোট ঘরে লেলের সঙ্গে বন্দী হয়ে কাটালেন তিন দিন।

'শান্ত হয়ে বোসো।' লেলে বললেন স্নিগ্ধকণ্ঠে।

অরবিন্দ স্তব্ধ হয়ে বসলেন।

'মনকে শূন্য করো।' বললেন লেলে, 'দেখবে বাইরে থেকে চিন্তা এসে উঁকি-ঝুঁকি মারছে, তোমার মনের ঘরে ঢুকতে চাইছে। ওদের কিছুতেই ঢুকতে দিয়ো না। ঢোকবার আগেই ওদের তাড়িয়ে দাও, ছুঁড়ে ফেলে দাও বাইরে।'

আশ্চর্য, অরবিন্দ শান্ত হয়ে বসতেই আবিষ্কার করলেন, সত্যিই তো, চিন্তাগুলি আকার ধরে আবির্ভূত হচ্ছে, ঢুকতে চাইছে মাথার মধ্য দিয়ে। অরবিন্দ সজাগ রইলেন। সবলে চিন্তাগুলোকে ঠেলে ঠেলে ফেলে দিলেন বাইরে। চিন্তা আসতে চায়, প্রত্যাঘাতের প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে পালিয়ে যায়, মিলিয়ে যায়। রণক্ষেত্র ফাঁকা হতে থাকে। অবশেষে শত্রুদল নিশ্চিহ্ন। আর কোনো উৎপাত নেই।

তিন দিনও লাগল না—এক দিনেই অরবিন্দ মনকে শূন্য করে তুললেন।

শূন্য অর্থই তো নীরবতার পূর্ণতা। আর নীরবতাই তো ব্রহ্মের অনুভূতি।

মনের থেকে চিন্তার দাগগুলি মুছে ফেল, যত সব অহংবুদ্ধির হিজিবিজি, মনকে একেবারে পরিচ্ছন্ন শুভ্র করে তোলো, তবেই না তাতে ব্রাহ্মী লিপি মুদ্রিত হবে। তবেই না সে মন বিশ্ব-মন হয়ে উঠবে।

শুধু একটিমাত্র ইঙ্গিত, তার থেকেই বিরাটের উদ্বোধন। একটিমাত্র বীজ, তার থেকেই মহান মহীরুহ। একটিমাত্র স্ফুলিঙ্গ তার থেকেই অনন্ত আকাশ-জ্যোত।

শুধু মনকে শূন্য করো। 'লেলের কাছে এই আমার মহাঋণ,' বলেছেন অরবিন্দ, 'তিনি আমাকে মনঃশূন্য হতে শেখালেন।'

ভক্তিবাদের মানুষ লেলে, অদ্বৈতানুভূতি তাঁর কাছে অকল্পনীয়। কিন্তু মনঃশূন্যতায় অরবিন্দের নির্বিশেষ ব্রহ্মের অনুভূতি হল। কে শেখায় কী শেখে!

অরবিন্দ উপলব্ধি করলেন এক অনির্বচনীয় ব্রহ্মই বিরাজমান। এ বিশ্ব সেই ব্রহ্মেরই প্রতিমূর্তি। ব্রহ্ম ছাড়া অন্যতর কিছু নেই, অসম্পৃক্ত কিছু নেই। সমস্তই ব্রহ্মের ইচ্ছাধীন। তাঁর দেহ চলছে বলছে কাজ করছে—সব যেন অচেতন যন্ত্রের চলা বলা কাজ করা। কোথাও অহংকর্তৃত্ব নেই, সমস্তই ব্রহ্মস্ফুরণ। আর সেই কারণে সর্বত্র আনন্দ—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ।

এ অভিজ্ঞতার জন্য অরবিন্দ প্রস্তুত ছিলেন না। আর এ লেলেরও ধারণাতীত! এ যেন কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ল।

অরবিন্দ ইংরেজি কবিতা 'নির্বাণ'-এ লিখলেন:

'সব কিছু বিবর্জিত, জাগে একা নিঃশব্দ নিশ্চিত,
ভাবনাবিমুক্ত মন দুঃখ থেকে বিমুক্ত হৃদয়।
অনস্তিত্ব অস্তিমান বিশ্বাস-অতীত
না আছে অহংবোধ না প্রকৃতি
শুধু এক পরিচিতি অজানা বিস্ময়॥'

অরবিন্দের যোগ তো নিষ্ক্রিয় নীরবতায় ধ্যানাসনে বসে থাকা নয়। ধ্যান তো তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে ফিরছে আর নীরবতা তো অন্তরের অতলে—তবু তাঁকে তো প্রত্যক্ষে কাজ করতে হবে, দেশকে স্বাধীন করতে হবে, করতে হবে বিপ্লব-বিস্তার। তিনি যে গোড়ায় যোগে আকৃষ্ট হয়েছিলেন সে তো প্রবলতর কর্মশক্তির জন্যে। কিন্তু শূন্য মন নিয়ে কর্ম করবেন কী!

না, আবার আমার কর্মের জগতে ফিরে যাই। দেখি অচঞ্চল থেকে অবিকৃত থেকে কী করে কর্ম সমাধা হয়।

পুনা বম্বে ও অমরাবতীতে অরবিন্দের বক্তৃতা দেবার কথা। কিন্তু কী তিনি ভাষণ দেবেন কূল-কিনারা পাচ্ছেন না। মন যখন শূন্য শুভ্র তখন সেখানে বক্তব্য বিষয়ের চিন্তা আসে কী করে?

লেলে পুনা পর্যন্ত এসেছেন, তাঁর কাছে অরবিন্দ পরামর্শ চাইলেন। কী ক'রে কী হবে!

লেলে বললেন, 'বক্তৃতার আগে প্রার্থনা করে নেবে।'

অরবিন্দ তখন নীরব ব্রহ্মানুভূতিতে এত নিমজ্জিত যে আর প্রার্থনা আসে না। লেলেকে বললেন সে কথা: 'প্রার্থনা করবার অবস্থা নেই।'

লেলে বললেন, 'বেশ, প্রার্থনা আমি করব। তুমি শুধু মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে শ্রোতাদের নারায়ণজ্ঞানে নমস্কার করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে তারপর দেখবে অন্য কোনো স্বর তোমার মুখ দিয়ে অনর্গল কথা কইছে।'

আশ্চর্য, তাই হল। অরবিন্দ শুধু শ্রোতাদের নমস্কার করে দাঁড়ান আর তাঁর মনের উর্ব্ধতর স্তর থেকে অবিরাম কথা আসে।

বম্বেতে এক সভায় যাচ্ছেন। পথে একটি লোক তাঁকে একখানি খবরের কাগজ দিল। সভাস্থলে শ্রোতাদের নমস্কার করে দাঁড়িয়েছেন হঠাৎ খবরের কাগজের একটা হেড-লাইন চকিতে তাঁর চোখের সামনে জ্বলে উঠল, আর কে একজন তাঁর হয়ে বক্তৃতা শুরু করল। এতটুকু কোথাও ঠেকল না।

লেলের কাছ থেকে পাওয়া অরবিন্দের এই দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা।

কলকাতা ফেরবার আগে অরবিন্দ লেলেকে বললেন, 'সাধন সম্পর্কে কিছু উপদেশ করুন।'

লেলে কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। হয়তো অন্তর থেকে কোনো বাণী শোনবার প্রতীক্ষায়। পরে বললেন, 'ঠিক একই সময়ে রোজ ধ্যান কোরো আর অন্তর থেকে বাণী শুনতে চেষ্টা কর।'

অরবিন্দ বললেন, 'আমার কাছে একটি মন্ত্র এসেছে।'

'এসেছে?' লেলে উৎফুল্ল হলেন, বললেন, 'যিনি মন্ত্র দিয়েছেন তাঁর উপর তুমি সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারো?'

'নিশ্চয় পারি।'

'তবে আর তোমাকে কিছু উপদেশ করবার নেই।'

লেলে বোধ হয় ভেবেছিলেন হৃদয় থেকে বাণী শুনতে শুরু করলেই অরবিন্দের এই অদ্বৈত অবস্থা কেটে যাবে। অরবিন্দ তখন সোজা ভক্তি-পথের পথিক হবেন।

কিন্তু অরবিন্দ যে বাণী শুনছেন মন্ত্র পাচ্ছেন সে অন্তর থেকে নয়, অধিমানস চেতনার স্তর থেকে। তাঁর ধ্যানেরও আর দরকার হল না, কেননা সর্বদাই তাঁ ধ্যানাবস্থা।

পরের ফেব্রুয়ারিতে কলকাতায় এলেন লেলে। অরবিন্দের যোগসাধ কেমন হচ্ছে খোঁজ নিতে এলেন।

অরবিন্দ বললেন, 'আমি আগের মত আর ধ্যানে বসি না।'

'সে কী!' লেলে বিস্মিত হলেন: 'ধ্যান করা ছেড়ে দিয়েছ?'

'ধ্যানের আর দরকার বুঝি না। আমার মধ্যে সব সময়েই ধ্যান চলছে।'

'এই রে!' লেলে আঁতকে উঠলেন: 'তোমাকে নিশ্চয়ই শয়তানে পেয়েছে

নম্রমুখে হাসলেন অরবিন্দ। বললেন, 'উপায় নেই। আমি ঐ শয়তানকে মেনে চলব।'

'না, না, আমি তোমাকে নতুন সব উপদেশ দিচ্ছি।'

বিনীত ভঙ্গিতে শুনলেন সব অরবিন্দ। প্রতিবাদ করলেন না। ওঁর বলবার বলুন। ওঁকে অপমান করা সাজে না।

কেননা তার আগেই তাঁর কাছে অশরীরী বাণী এসে পৌঁচেছে—তোমা আর মানুষ গুরুতে প্রয়োজন নেই।

ঐ বুঝি সেই শয়তান!

॥ পনের ॥

বরোদা থেকে কলকাতায় ফেরার পথে বোম্বাইয়ে নামলেন অরবিন্দ। সেখা কার ন্যাশনাল ইউনিয়নের উদ্যোগে এক জনসভার আয়োজন হয়েছে। বক্ত অরবিন্দ।

কী বলবেন? বক্তৃতার বিষয় কী? বাস্তবভূমিতে দাঁড়াতে হবে তো অন্তরের গভীর স্তব্ধতাই একমাত্র বাস্তবভূমি।

অদৃশ্য মহাশক্তি যা বলায় তাই বলব।

উনিশশো আট সনের উনিশে জানুয়ারি। সভামঞ্চে দাঁড়ালেন অরবিন্দ

লেলের কথামত সম্মুখীন জনতাকে নমস্কার করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে উর্ধ্ব থেকে কথার নির্ঝর নেমে এল।

'জাতীয়তা কী? জাতীয়তাবাদ কোনো রাজনৈতিক কর্মপন্থা নয়। শুধু স্বরাজ ও স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষাতেই তা সীমাবদ্ধ থাকে না। জাতীয়তাবাদ ঢের বড় জিনিস। জাতীয়তাবাদ ধর্ম—ঈশ্বর নির্দিষ্ট। এ ধর্ম ঈশ্বর পাঠিয়েছেন, সুতরাং স্বয়ং ঈশ্বরেরই নির্দেশ বলে ভারতবাসীকে জাতীয়তাবাদ গ্রহণ করতে হবে। যখন কোনো ধর্ম প্রবর্তিত হয় তখন তাকে ধ্বংস করবার জন্যে কতকগুলি বিরুদ্ধ শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এ ভগবানেরই অভিপ্রেত। ভগবান যখন জাতির মধ্যে জন্ম নিতে যাচ্ছেন তখন শত বিরুদ্ধ শক্তি—যতই কেননা ভয়াবহ হোক—তাঁর জাগরণকে ব্যাহত করতে পারে না। ভগবানের শক্তিতেই জাতীয়তাবাদ পরাক্রান্ত। কোন অস্ত্র, কোন প্রহরণ রুখবে ঈশ্বরকে, কোন সংঘর্ষে পরাভূত করবে? জাতীয়তাবাদ অবিনশ্বর। যেহেতু ঈশ্বরের মৃত্যু নেই। ঈশ্বরকে জেল দেওয়া যায় না। তোলা যায় না ফাঁসিকাঠে।'

আরো বললেন অরবিন্দ :

'বিদেশী সরকার নির্যাতন করে জাতীয় আন্দোলন বন্ধ করতে চাইছে আর যেহেতু বাঙালী এই আন্দোলনের নেতা তারই উপর অকথ্য নিগ্রহ। কিন্তু বাঙালী দমবার পাত্র নয়। যেহেতু সে বিশ্বাস করে ঈশ্বর-প্রেরিত ঈশ্বর-চালিত।

'আগাগোড়া জাতীয়তাবাদীর এই তো সুদৃঢ় বিশ্বাস। তার মধ্য দিয়ে ভগবান তাঁর নিজের কাজ করে যাচ্ছেন। সে ঈশ্বরের হাতের যন্ত্রমাত্র—নিমিত্ত মাত্র। তাই শত আঘাতেও সে নির্বিচল, শত দুঃখেও সে প্রসাদ-পরিতৃপ্ত। তার ভয় নেই অবকাশ নেই। সর্বাবস্থায় সে অপরাজিত।

'তোমার যদি ঈশ্বরে জলন্ত বিশ্বাস থাকে তখন কাকে আর তোমার ভয় করবার আছে? মৃত্যুকে? তোমার মধ্যে যে তখন অমরত্বের অধিষ্ঠান, আনন্ত্যের উদয়ন। তখন আর কোনো অস্ত্র নেই যে তোমাকে বিদ্ধ করতে পারে, পাবক নেই যে দগ্ধ করতে পারে, সমুদ্র নেই যে পারে নিমজ্জিত করতে।

'জানি যুক্তিবাদীরা অন্য কথা বলবে, চাইবে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে। সে বিচারে জাতীয়তাবাদের পরিণতি হতাশা, নির্বোধ নৈষ্ফল্য। যেহেতু তোমার কাছে এমন কোনো পার্থিব শক্তি নেই যা প্রতিপক্ষকে পরাভূত করতে পারে, তোমার পক্ষে এ আন্দোলন মৃত্যুর শামিল। প্রতিপক্ষ তোমাকে এমন সুযোগ

দেবে না যে তুমি সেই পার্থিব শক্তি আহরণ করতে পারো। সুতরাং বুদ্ধিবাদীদের একমাত্র সিদ্ধান্ত এই যে এই অবস্থায় ভারতবর্ষের কিছুই করবার নেই। অনপনেয় অন্ধকারই ভারতবর্ষের একমাত্র ভবিষ্যৎ।

'কিন্তু যে জাতীয়তাবাদী সে শুধু বিচার-বুদ্ধিতে চালিত হয় না, সে চলে তার হৃদয়ের নির্দেশে, যেখানে জাগ্রত ঈশ্বর-সন্নিবেশ। ভগবানের বাণী শোনা যায় এই হৃদয়েই, বুদ্ধিতে নয়। ভগবান বিচারে নন, ভগবান বিশ্বাসে। যে বিশ্বাসী, সে এই বিশ্বাসের বলেই অসমসাহসী, যে ঈশ্বর-নিয়োজিত, সে এই নিযুক্তির বলেই স্বার্থশূন্য। আর যে নির্ভয় ও নিরাকাঙ্ক্ষ তার জয় ঈশ্বরের মতই অবধারিত।

'নেতা? তোমার কোনো নেতার দরকার নেই। তোমার নেতা তোমার অন্তরেই বাস করছেন। যদি সত্যি তাকে খুঁজে নাও, যদি তাঁর কণ্ঠস্বর একবার শোনো দেখবে তোমার কথায় সেই কণ্ঠস্বরের আভাস পেয়ে সবাই এক সুরে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে। তোমার কথাই তখন সকলের কথা।'

এ বক্তৃতায় কেউ-কেউ ভ্রূকুটি করলেন। বললেন, এ যেন মঞ্চে-দাঁড়ানো কোনো রাজনৈতিক নেতার ভাষণ নয়, এ যেন বেদীতে-বসা কোনো ধর্মপ্রচারকের উপদেশ। অরবিন্দ শেষে জাতীয়তাবাদকে ধর্ম করে ছাড়লেন! নেতা করলেন ঈশ্বরকে। আর কিনা বিচার-বুদ্ধির উপর জোর না দিয়ে জোর দিচ্ছেন হৃদয়ের উপর!

অরবিন্দ দমলেন না। বন্দেমাতরম-এ এর উত্তর দিলেন:

'যখন আমরা প্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষা পেলাম, বিজ্ঞানের আলোয় আমাদের দিগভ্রান্তি হল। বিজ্ঞান হচ্ছে সঙ্কীর্ণ ঘরে সীমিত আলো, যে আলোকে পৃথিবী উদ্ভাসিত হয় বিজ্ঞান সেই সূর্য নয়। বিজ্ঞানের ফল অপরা বিদ্যা, কিন্তু এর চেয়ে মহত্তর এক বিদ্যা আছে, আছে বলবত্তর এক শক্তি।…যে একবার নিজের মধ্যে ভগবানের মহিমা অনুভব করেছে সে আর কখনো বুদ্ধিকে সর্বাধিরাজ বলে বিশ্বাস করে না।…কোনো পরিকল্পনা করা নয়, শুধু জীবনের একটি অবিচাল্য উদ্দেশ্য স্থির করা। যদি সেই উদ্দেশ্যের সাধনে সংকল্প দৃঢ় থাকে তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থাই ঠিক পথের ইঙ্গিত দেবে, কিন্তু যদি পরিকল্পনা ফেঁদে এগুতে যাও অপ্রত্যাশিতের ধাক্কায় পরিকল্পনা বারে বারে বানচাল হতে বাধ্য।'

কিন্তু কেন, স্বাধীনতা সত্যি চাই কেন? সে কি শুধু একটা রাজনৈতিক অভীপ্সা? শুধুই স্বার্থপর সমৃদ্ধি-সম্ভোগ? না কি এখন যেমন উৎপীড়িত আছি,

াধীন হয়ে অন্যকে তেমনি উৎপীড়ন করা ?

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে শুধু নিজের স্বার্থে নয়, পৃথিবীর স্বার্থে। ভারত-উদ্ধারের প্রয়োজন যাতে ভারত সমগ্র বিশ্বকে উদ্ধার করতে পারে।

পরিপূর্ণ উদ্ধার ঈশ্বরের উপলব্ধিতে। সে উপলব্ধি ব্যক্তিতে, সমাজে, াতিতে। জাতীয়তা তাই পরিব্যাপ্ত ঈশ্বর-অনুভব।

বম্বে থেকে নাসিক। নাসিকে অরবিন্দ স্বরাজ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। ারাজ মানে কী? স্বরাজ মানে অমৃত। স্বরাজ মানে মুক্তি। আগে নিজের অন্তরের রাজা হও—পরে বাইরের রাজত্ব মিলবে। অন্তরের স্বাধীনতাই পরাধীনতার বন্ধন-মোচন ঘটাবে।

ক্ষত্রতেজের চেয়ে ব্রহ্মতেজ বড। আর আসল স্বরাজ লাভ এই ব্রহ্মতেজে।

পরদিন ধুলিয়া-তে বক্তৃতা দিলেন স্বদেশী আর বিলিতি-বর্জন নিয়ে। অরবিন্দ শুধু ধর্মের কথা বলেন না, কর্মের কথাও বলেন।

বলছেন অরবিন্দ :

'সফলতা অবশ্যম্ভাবী—কারণ ভারতের স্বাধীনতা, ভারতের ঐক্য, মহত্ত্ব ও পূর্ণ সিদ্ধি জগতের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। দেশসেবক কর্মযোগী যিনি, তিনি এই শ্রদ্ধা লইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, এই শ্রদ্ধাতেই নিরন্তর চলিবেন, বাধা-বিপত্তি যতই বিপুল, আপাত দৃষ্টিতে যতই দুর্লঙ্ঘ্য মনে হউক না কেন, কখনও তাহাতে বিচলিত হইবেন না। আমাদের বিশ্বাস, ভগবান আমাদের সাথে—এই বিশ্বাসের জোরেই আমরা জয়ী হইব। আমাদের বিশ্বাস, মানবজাতি আমাদিগকে চাহিতেছে—মানুষের জন্য, দেশের জন্য, জাতির জন্য, ধর্মের জন্য আমাদের অনুরাগ ও সেবা আমাদের চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া তুলিবে, আমাদের কর্মকে অনুপ্রাণিত করিয়া ধরিবে।

'আমরা যে কাজের ভার লইব তাহা একান্ত বাহিরের নয়, তাহা অন্তরের, তাহা আধ্যাত্মিক। আমাদের লক্ষ্য শাসন-যন্ত্রের কেবল রূপ-পরিবর্তন নয়, কিন্তু একটা নেশনকে গড়িয়া তোলা। এই কাজের একটা অঙ্গ রাজনীতি, সন্দেহ নাই, কিন্তু একটা অঙ্গ মাত্র। আমরা শুধু রাজনীতি লইয়া ব্যাপৃত থাকিব না, কিংবা সমাজ-সমস্যা সাধন-শাস্ত্র দর্শন সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতির মধ্যে কোনটিকে সর্বেসর্বা করিয়া লইয়া চলিব না। কিন্তু এইসবগুলির ধারাকে একটা বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করিয়া ধরিব—তাহার নাম "ধর্ম"—আমাদের দেশের ধর্ম, যে ধর্ম হইতেছে বিশ্বের ধর্ম। জীবন-গতির আছে যে একটা মহান ধারা, মানবজাতির ক্রমোন্নতির

আছে যে একটা গভীর তত্ত্ব, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ও উপলব্ধির আছে যে বিচিত্র রহস্য—ভারতবর্ষ তাহার রক্ষক, তাহার বিগ্রহ, তাহার প্রচারক। এই জিনিস-টিকেই বলা হইয়াছে "সনাতন ধর্ম"। বিদেশের পরধর্মের সহিত সংঘর্ষে ভারতবর্ষ তাহার সনাতন ধর্মের জাগ্রত প্রাণটি হারাইয়া প্রায় শুধু কাঠামোটি লইয়া বসিয়া আছে। কিন্তু ভারতের এই ধর্মকে জীবনে মূর্ত করিয়া যদি না চলা যায়, তাহার তবে কোনই অর্থ থাকে না। শুধু আবার জীবনে নয়, প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ করিতে হইবে। আমাদের সমাজ, আমাদের রাষ্ট্র, আমাদের সাহিত্য, আমাদের বিজ্ঞান, আমাদের ব্যক্তিগত প্রকৃতি ও প্রেরণা সকলের মধ্যে এই ধর্মের প্রতিভা প্রবেশ করিয়া সকলকে নূতন ছাঁচে গড়িয়া তুলিবে। এই ধর্মের মর্ম বুদ্ধি দিয়া অনুধাবন করা, সত্য বলিয়া উপলব্ধি করা, হৃদয়কে তাহার সমুচ্চ প্রেরণার ছন্দে তুলিয়া ধরা, জীবনে তাহাকে মূর্ত করিয়া ধরা—ইহারই নাম আমরা দিতে চাই কর্মযোগ। ভারতবর্ষ এই যোগকে মানবজীবনের লক্ষ্যরূপে স্থাপিত করিবে, তাই আমরা মনে করি আজ সে জাগিয়া উঠিতেছে। এই যোগের দ্বারাই ভারতবর্ষ তাহার স্বাধীনতা, ঐক্য, মহত্ত্ব অর্জন করিবার, রক্ষা করিবার শক্তি ও সামর্থ্য পাইবে।'

ধুলিয়া থেকে অমরাবতী। সভা শুরু হল 'বন্দেমাতরম' গান দিয়ে। অরবিন্দ বন্দেমাতরম-এর উপর বললেন।

বন্দেমাতরম শুধু জাতীয় সঙ্গীত নয়—বন্দেমাতরম এক উজ্জীবনী মন্ত্র। পবিত্র, প্রাণপ্রদ। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্যানে এই মন্ত্রের উদ্ভাসন। এর প্রতিটি শব্দে অপরিমিতের শক্তি। বঙ্কিমচন্দ্র স্বপ্ন দেখেছিলেন সমগ্র ভারত একদিন এই জাগর-মন্ত্রে মুখর হয়ে উঠবে আর ওর প্রতিধ্বনি বাজবে ভারতের আকাশে-বাতাসে, অরণ্যে-পর্বতে, নদীতে-সমুদ্রে, কূজনে-গুঞ্জনে। সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবায়িত হতে চলেছে। এই মন্ত্রবলে আমরা বুঝতে পারছি দেশ শুধু দেহ নয়, দেশ আত্মা, শুধু এক ভৌগোলিক সত্তা নয়, আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব।

অরবিন্দ লিখছেন :

'আমাদের একতার প্রধান অন্তরায় মাতৃদর্শনের অভাব। আমাদের রাজনীতিবিদ্‌গণ প্রায়ই মায়ের সম্পূর্ণ স্বরূপ দর্শন করিতে অসমর্থ ছিলেন। রণজিৎ সিংহ বা গুরুগোবিন্দ ভারতমাতা না দেখিয়া পঞ্চনদমাতা দেখিয়াছিলেন। আমরাও বঙ্গভঙ্গের সময়ে বঙ্গমাতার দর্শনলাভ করিয়াছিলাম—সেই দর্শন, অখণ্ড দর্শন, অতএব বঙ্গদেশের ভাবী একতা ও উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু ভারতমাতার

অখণ্ড মূর্তি এখনও প্রকাশ হয় নাই। কংগ্রেসে যে ভারতমাতার পূজা নানারূপ স্তবস্তোত্রে করিতাম, সে কল্পিত, ইংরাজের সহচারী ও প্রিয় দাসী, ম্লেচ্ছবেশভূষা সজ্জিত দানবী মায়া, সে আমাদের মা নহে, তাহার পশ্চাতে প্রকৃত মা নিবিড় অস্পষ্ট আলোকে লুক্কায়িত থাকিয়া আমাদের মন-প্রাণ আকর্ষণ করিতেন। যেদিন অখণ্ডস্বরূপ মাতৃমূর্তি দর্শন করিব, তাঁহার রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার কার্যে জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য উন্মত্ত হইব, সেদিন এ অন্তরায় তিরোহিত হইবে, ভারতের একতা, স্বাধীনতা ও উন্নতি সহজসাধ্য হইবে।'

চাই আত্মসমর্পণ, চাই সর্বস্বত্যাগ।

অরবিন্দ আবার ডাক দিলেন :

'ভারতের কাজ, জগতের কাজ, ভগবানের কাজ করিবার জন্য যে যুবকমণ্ডলী আজ জাগিয়া উঠিয়াছে তাহাদিগকে এবং প্রত্যেককেই আমরা বলি—এই আদর্শ তোমরা ধারণাও করিতে পারিবে না—তাহার সিদ্ধি তো দূরের কথা—যদি তোমাদের মনকে ইউরোপীয় ভাবের দাস করিয়া রাখ, যদি জীবনকে কেবল বাহিরের দৃষ্টি দিয়া দেখ—বাহিরের হিসাবে তোমরা কিছুই নও, কিন্তু অন্তরের অধ্যাত্মের হিসাবে তোমরা সবই। এক ভারতবাসীই সব বিশ্বাস করিতে পারে, সব দুঃসাহস করিতে পারে, সব বলি দিয়া দিতে পারে। সুতরাং সকলের আগে, হও ভারতবাসী। তোমার পিতৃপুরুষের সম্পদ উদ্ধার করো। উদ্ধার করো আর্যের চিন্তা, আর্যের সাধনা, আর্যের স্বভাব, আর্যের জীবনধারা। উদ্ধার কর বেদান্ত, গীতা, যোগ-দীক্ষা। এ সকল শুধু মস্তিষ্ক দিয়া, ভাবাবেগ দিয়া ফিরিয়া পাইলে চলিবে না, জাগ্রতজীবনে উহাদিগকে ফলাইয়া ধরিতে হইবে। জীবনক্ষেত্রে ঐ সকল বস্তু মূর্তিমান করিয়া তোল, তোমরা মহান, শক্তিমান, বীর, অজেয়, নির্ভীক হইয়া দাঁড়াইবে। জীবন বা মৃত্যু তোমাদিগকে কোন শঙ্কাই আনিয়া দিবে না। দুঃসাধ্য, অসম্ভব—এ সব কথা তোমাদের ভাষায় আর স্থান পাইবে না। অন্তরাত্মার যে শক্তি তাহাই অসীম অনন্ত—বাহিরের সাম্রাজ্য যদি ফিরিয়া পাইতে চাও, তবে আগে অন্তরের স্বরাজ ফিরিয়া পাও ; মায়ের আসন এইখানে, শক্তিসঞ্চার করিবেন বলিয়াই তিনি পূজার অপেক্ষায় রহিয়াছেন।'

বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অরবিন্দের কাছে দীক্ষা নিতে এসেছে। এই তার প্রথম আসা, প্রথম সাক্ষাৎকার। তাকে নিয়ে এসেছে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘটনার স্থান ২৩ স্কট লেন।

এই অমরেন্দ্র। উপেন্দ্রনাথ পরিচয় করিয়ে দিল।

আর ইনি—

কিছু বলবার দরকার হল না—দর্শনমাত্রই অমরেন্দ্রের দীক্ষা হয়ে গেল।

গীতা বা তরবারি লাগল না, না বা প্রার্থনা, না বা শপথ বাক্যের উচ্চারণ ঈক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই দীক্ষা।

পরে লিখছেন অমরেন্দ্র : 'কোনো মন্ত্র লাগল না, প্রথম দর্শনেই আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলাম। শুধু মুগ্ধ হলাম না, সমর্থ ও শক্তিশালী হয়ে গেলাম। প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলাম পলকের দর্শনেও দীক্ষা হতে পারে, মন্ত্র বা স্পর্শ লাগে না।'

'দেশের জন্যে কী করতে হবে, কোন কাজ, উপেন তোমাকে বলেছে আশা করি।' অরবিন্দ বললেন, 'আশা করি তোমার মনে কোনো ভয় বা সংশয় বা দ্বিধা নেই।'

'সবই উপেন বলবে, আপনি কিছু বলবেন না? আপনি কিছু বলুন,' অমরেন্দ্র অনুনয় করল : 'আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই। আচ্ছা, আমার সম্বন্ধে আপনি কিছু শুনেছেন?'

'শুনেছি।' বললেন অরবিন্দ, 'শুনেছি স্বদেশী আন্দোলনে তুমি অনেক টাকা দিয়েছ আর সেই টাকা দেশের সেবাতেই খরচ হয়েছে। কিন্তু এই নুন-চিনির রাজনীতিতে কি দেশ স্বাধীন হবে? যদি সত্যি আমরা দেশের স্বাধীনতা চাই তবে তার জন্যে আমাদের সর্বস্ব ত্যাগ করতে হবে—সর্বস্ব অর্থ আমাদের প্রাণ পর্যন্ত। মৃত্যুভয় জয় করতে পারলেই স্বাধীনতা।'

'কত জন তা পারবে বলুন।' অমরেন্দ্র বুঝি সন্দেহ প্রকাশ করল।

'কেন পারবে না? দেশ-মায়ের জন্যে আত্মাহুতি দেওয়া কি খুবই কঠিন? জীবনে তুচ্ছ সুখের জন্যে মানুষ কত না কষ্ট ভোগ করে। দেশের স্বাধীনতার জন্যে কোন কষ্ট কোন ত্যাগ কঠিন হবে? ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন না হয় পৃথিবীর মানুষও স্বাধীন হবে না। আর-আর দেশের লোক তাদের নিজের নিজের স্বার্থের কথা ভাবে, ভারতবাসী যখন ভারতের কথা ভাবে তখন সেই সঙ্গে সে সমস্ত পৃথিবীর কথা ভাবে।'

অমরেন্দ্র বললে, 'আত্মবলি দেবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে বলেছে আমাকে উপেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা তুলে আমি তাকে বলেছি, মরতে যখন একদিন হবে তখন আর তাকে ভয় কী। আমার ভয় অন্যত্র।'

'কী ভয়?'

'আমার ভয় আমি এই মহৎ ব্রতের উপযুক্ত নই। যোগ্য হবার উপায়

আছে কিছু ?'

'আছে। তুমি ঈশ্বরের কাছে সর্বাঙ্গীণ আত্মসমর্পণ করো আর জগন্মাতার নামে নির্দ্বিধায় দেশের কাজ করে যাও।' অরবিন্দ তাকালেন চোখ তুলে : 'তোমাকে এই আমার দীক্ষা।'

'এই দীক্ষাই আমাকে নতুন করে নির্মিত করল।' লিখছে অমরেন্দ্র : 'আমার ভয়ও থাকল না, আসক্তিও থাকল না।'

দলের যুবকদের ভরণপোষণের জন্যে যে টাকা দরকার তার আহরণের ভার অমরেন্দ্রের উপর।

ভগবানে আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পণ অর্থ নিষ্ক্রিয়তা নয়, নিষ্কামক্রিয়তা।

অরবিন্দ বলছেন :

'যিনি যত পরিমাণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে পারেন, তাঁহার শরীরে তত পরিমাণে ভগবদ্দত্ত শক্তি আসিয়া পরম মঙ্গলময়ের প্রসাদে পাপমুক্ত ও দেবভাবপ্রাপ্ত করে।...সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ মানুষের পক্ষে কঠিন, কিন্তু স্বল্পমাত্র চেষ্টা করিলে স্বয়ং ভগবান অভয় দানে গুরু, রক্ষক ও সুহৃদ হইয়া যোগপথে অগ্রসর করাইয়া দেন। স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। তিনি বলিয়াছেন এই ধর্ম আচরণ করা সহজ ও সুখপ্রদ। বাস্তবিকই তাহাই, অথচ সম্পূর্ণ আচরণের ফল অনির্বচনীয় আনন্দ, শুদ্ধি ও মুক্তিলাভ। মামেবৈষ্যসি অর্থাৎ আমাকে প্রাপ্ত হইবে, আমার সহিত বাস করিবে, আমার প্রকৃতি প্রাপ্ত হইবে। এই কথায় সাদৃশ্য, সালোক্য ও সাযুজ্য ফলপ্রাপ্তি ব্যক্ত হইয়াছে। যিনি গুণাতীত তিনিই ভগবানের সাদৃশ্যপ্রাপ্ত। তাঁহার কোনও আসক্তি নাই, অথচ তিনি কর্ম করেন, পাপমুক্ত হইয়া মহাশক্তির আধার হন ও সেই শক্তির সর্ব কার্যে আনন্দিত হন। সালোক্যও কেবল দেহপতনান্তর ব্রহ্মলোকগতি নয়, এই শরীরেও সালোক্য হয়। দেহযুক্ত জীব যখন তাঁহার অন্তরে পরমেশ্বরের সহিত ক্রীড়া করেন, মন তাঁহার দত্ত জ্ঞানে পুলকিত হয়, হৃদয় তাঁহার প্রেমস্পর্শে আনন্দপ্লুত হয়, বুদ্ধি মুহুর্মুহুঃ তাঁহার বাণী শ্রবণ করে ও প্রত্যেক চিন্তায় তাঁহারই প্রেরণা জ্ঞাত হয়, ইহাই মানবশরীরে ভগবানের সহিত সালোক্য। সাযুজ্যও এই শরীরে ঘটে। গীতায় তাঁহার মধ্যে নিবাস করার কথা পাওয়া যায়। যখন সর্বজীবে তিনি, এই উপলব্ধি স্থায়ী ভাবে থাকে, ইন্দ্রিয় সকল তাঁহাকেই দর্শন করে, শ্রবণ করে, আঘ্রাণ করে, আস্বাদন করে, স্পর্শ করে, জীব সর্বদা তাঁহার মধ্যে অংশভাবে থাকিতে অভ্যস্ত হয়, তখন এই শরীরেও সাযুজ্য হয়। এই

পরমগতি সম্পূর্ণ অনুশীলনের ফল। কিন্তু এই ধর্মের অল্প আচরণেও মহতী শক্তি, বিমল আনন্দ, পূর্ণ সুখ ও শুদ্ধতা লাভ হয়। এই ধর্ম বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন লোকের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। ভগবান বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, পুরুষ স্ত্রী পাপযোনি-প্রাপ্ত জীবসকল পর্যন্ত তাঁহাকে এই ধর্মদ্বারা প্রাপ্ত হইতে পারে। ঘোর পাপীও তাঁহার শরণ লইয়া অল্পদিনের মধ্যে বিশুদ্ধ হয়। অতএব এই ধর্ম সকলের আচরণীয়। জগন্নাথের মন্দিরে জাতি-বিচার নাই। অথচ ইহার পরম গতি কোনও ধর্ম-নির্দিষ্ট পরমাবস্থার ন্যূন নয়।'

অমরাবতী থেকে অরবিন্দ কানপুরে আসেন। তিন দিনে তিনটি বক্তৃতা দেন। রাজনৈতিক নেতার বক্তৃতা নয়, ঈশ্বরপ্রেরিত পরিত্রাতার আনন্দবার্তা।

ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই অরবিন্দ কলকাতা ফিরলেন।

মুরারিপুকুরে বা মাণিকতলার বাগানে বিপ্লবীদের আড্ডা তখন বেশ জমে উঠেছে। ভবানী মন্দির প্রতিষ্ঠা করা গেল না, স্থান নির্বাচন করতে গিয়ে পাহাড়ী জ্বর নিয়ে বারীনকে ফিরে আসতে হল। কিন্তু সে প্রতিনিবৃত্ত হল না। ঠিক করল ভবানী মন্দির না হোক, ঐ ধাঁচে একটা বিপ্লব-নিকেতন গড়ে তুলতে হবে। মুরারীপুকুর রোডে বারীনদের ছিল একটি পরিত্যক্ত বাগান, আয়তনে ছ-সাত বিঘে, তাতে বসবাসের জন্যে একটি বাড়ি, সংলগ্ন দুটি পুকুর—তাই মনোনীত করল। এই আমাদের আশ্রম, আমাদের সাধন-পীঠ।

সেটা উনিশশো সাতের গোড়ার দিকে। সেই আশ্রমের বাসিন্দের সংখ্যা প্রায় চোদ্দ—তার মধ্যে একজন নলিনীকান্ত গুপ্ত, বয়স মোটে কুড়ি।

নলিনীকান্তের দীক্ষা হয়েছিল অন্যত্র। এক মধ্যরাত্রে, কালীর পটের সামনে, বুকের রক্ত দিয়ে প্রতিজ্ঞাবাণী লিখে। সে বাণী বুকের রক্ত দিয়ে না লিখলে বুঝি অর্থ ধরে না। 'আমি প্রাণপণ করে দেশমাতার একনিষ্ঠ সেবক হব।' দেশের সেবক নয়, দেশমাতার সেবক। জগন্মাতাই দেশমাতা। আর একনিষ্ঠ সেবাই নির্বিকল্প সাধনা।

শ্রীঅরবিন্দ বলছেন: 'জীবনে আমি যা কিছু করেছি, যেটুকু দুঃখকষ্ট সহ্য করেছি তা সবই আমার মায়ের জন্য। স্বদেশকেই আমি মা বলে জানি, ভক্তি করি, পূজা করি।'

চারদিকে স্বাধীনতার ডামাডোল, চাই ইংরেজ-বিদায়, ইংরেজবিহীন নবীন ভারতবর্ষ। এক সন্ধ্যায় কলেজ-স্কোয়ারে বক্তৃতা দিতে এসেছেন অরবিন্দ—নলিনীকান্ত শুনতে এসেছে। অরবিন্দকে এই তার প্রথম দেখা। প্রথম চাক্ষুষ প্রণাম।

কী দেখল নলিনীকান্ত? দেখল আলোয়ান দিয়ে আপাদমস্তক ঢাকা—অরবিন্দ বক্তৃতা করছেন। কণ্ঠস্বর মৃদু কিন্তু উচ্চারণ স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ। ইংরেজিতে বলতে হচ্ছে বলে তিনি লজ্জিত কিন্তু তিনি অনুপায়, তাঁর শিক্ষা ও পরিবেশ এমনি ছিল যে ইংরেজির মাধ্যম ছাড়া অন্য ভাষায়, মাতৃভাষায় তিনি বলতে পাচ্ছেন না। জনতার কাছে তাই তিনি ক্ষমা চাইলেন।

জনতা তন্ময় হয়ে শুনছে। বুঝুক আর না বুঝুক, চারদিকে সূচী-পতন স্তব্ধতা। বাক্যের অতীত এক স্বর অর্থের অতীত এক তাৎপর্যে সবাই মুগ্ধ শুধু নয়, আনন্দিত—আলোকিত হয়ে উঠছে। বক্তব্যের চেয়েও বক্তা বড়। অরবিন্দ ঘোষ নিজেই এক মূর্তিমান বক্তব্য।

বাগানে নলিনীকে একদিন ডাকল বারীন। বললে, 'সেজদা বাগান দেখতে আসবেন। তুমি গিয়ে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এস।'

নলিনী তখুনি ট্রামে রওনা হল। অরবিন্দ তখন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে আছেন—নলিনীর পৌঁছুতে পৌঁছুতে বিকেল প্রায় চারটে। অরবিন্দ ও-বাড়িতে ঘোষ সাহেব বলে পরিচিত। নলিনী দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করল, 'ঘোষ সাহেব আছেন?'

'আছেন।'

'তাঁকে একটা খবর দাও।' নলিনী একটা চিরকুটে লিখল—মানিকতলার বাগান থেকে বারীনদা পাঠিয়েছেন। লিখে চিরকুটটা দারোয়ানের হাতে দিল।

দারোয়ান চলে গেল ভিতরে।

নীচের তলার ঘরে অপেক্ষা করছে নলিনী, অরবিন্দ নেমে এলেন। তাকালেন জিজ্ঞাসু চোখে।

নলিনী বললে, 'বারীনদার কাছ থেকে আসছি। আপনি আমার সঙ্গে এখন বাগানে যেতে পারবেন?'

বাংলাতেই উত্তর দিলেন অরবিন্দ। প্রত্যেকটি বর্ণ অতি আস্তে ও আলাদা করে-করে উচ্চারণ করলেন। বোঝা গেল অরবিন্দ মাতৃভাষায়, বাংলা ভাষায়, কথা বলতে শিখেছেন—যদিও পুরোপুরি এখনো অভ্যস্ত হতে পারেননি।

অরবিন্দ বললেন, 'বারীনকে গিয়ে বল আমার এখনো আহার হয়নি। এখন আর যাওয়া হয় না।'

নলিনী দ্বিরুক্তি করল না। পুণ্যদর্শন অরবিন্দকে নমস্কার করে প্রত্যাবর্তন করল।

বাগান তো নয়, নলিনীকান্তের ভাষায় 'জীবন্ত জঙ্গল'। পুকুর দুটিতে যেমনি পাঁক তেমনি শ্যাওলা আর মাছ যা আছে তার চেয়ে বেশি বুঝি ব্যাঙ আর সাপখোপ। আর বাড়ি যেটা আছে তা পরিত্যক্ত। কিন্তু কিছুতেই কিছু এসে যায় না। প্রাণে যখন নব জীবনের ঢেউ জেগেছে তখন কোথাও কিছুর ভয় নেই অভাব নেই আড়ষ্টতা নেই। ঐ পচা পুকুরেই স্নান, ঐ পোড়ো বাড়িতেই বসবাস। মাটির থালায় একবেলা খিচুড়ি খাওয়া। প্রাণ যখন প্রাচুর্যে ভরপুর, তখন স্নান আনন্দস্নান, ভোজন অমৃতভোজ, আর বসবাস কুণ্ঠাহীন বৈকুণ্ঠস্থিতি।

জায়গাটার সব চেয়ে বড আকর্ষণ নির্জনতা। তারপর গীতা পাঠ। সরবে গীতা পডতে পডতে দেহ মন যেন নতুন শক্তিতে, আরেক শক্তিতে মেতে ওঠে।

বারীন ঠিক করল লেলে মহারাজকে আসতে লিখি। তিনি এসে বিপ্লবী যুবকদের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত করে দিন।

ডাক শুনে লেলে চলে এলেন কলকাতায়। গেলেন বাগানে। বুঝলেন, যুবকদের এ কিসের আস্তানা, কিসের আন্দোলন। ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেলেন, বললেন, 'এর পরিণাম কী ভয়াবহ তা জান?'

যুবকেরা কেউ জানতে চাইল না। জানলেও তারা তাতে কর্ণপাত করতে রাজী নয়। অপরিমেয় জীবন পরিণামের কথা ভাবে না।

লেলে মহারাজ একটি ছেলেকে বাছলেন। বললেন, 'ঐ ছেলেটি আমাকে দাও।'

সবাই দেখল লেলে মহারাজ প্রফুল্ল চাকীকে নির্দেশ করছেন।

'কেন, কী ব্যাপার?' সবাই কৌতূহলী হল।

'আমি ওকে আমার সঙ্গে বম্বে নিয়ে যেতে চাই।'

'কেন? কিসের জন্যে?'

'সাধনার জন্যে। ওর মধ্যে বস্তু আছে দেখতে পাচ্ছি।'

বিষয়টা অরবিন্দকে জানানো হল। প্রফুল্ল লেলের সঙ্গে বম্বে যাবে?

অরবিন্দ বললেন, 'প্রফুল্ল যাবে কিনা তা প্রফুল্ল জানে।'

হ্যাঁ, প্রফুল্ল জানে বৈকি। সে দল ছেড়ে, অরবিন্দকে ছেড়ে কোথাও যাবে না। দেশমুক্তির সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা।

লেলে উদ্যোগ করে অরবিন্দের সঙ্গে দেখা করলেন। যে পথে অরবিন্দ চলেছেন তার থেকে নিবৃত্ত হতে বললেন। বললেন, "অন্তরের যে বাণী শুনে আপনি অগ্রসর হচ্ছেন বলছেন তা আসুরিক। আপনি ফিরুন, ফিরে আসুন।

নইলে আমি আর আপনার দায়িত্ব নিতে পারব না।'

'উপায় নেই।' বললেন অরবিন্দ, 'অন্তর্যামীই আমার গুরু। আমি তাঁর বাণীতেই চালিত হব।'

গুরুপদে ইস্তফা দিলেন লেলে। অন্তরপুরুষই এখন অরবিন্দের চালক বাহক পথপ্রদর্শক।

॥ ষোল ॥

উনিশশো আট সনের ১০ই এপ্রিল কলকাতা পান্তির মাঠে বিরাট সভা বসল। আলোচ্য বিষয় কী করে ভাঙা কংগ্রেসকে জোড়া দেওয়া যায়। প্রধান বক্তা অরবিন্দ।

যিনি ভেঙেছিলেন তিনিই আবার মেলাতে চাইলেন।

ভাঙবার দরকার ছিল। তা না হলে জাতীয়তাবাদের কী নীতি কী লক্ষ্য তা স্পষ্ট হয়ে উঠত না। আকৃষ্ট হত না দেশবাসী। তাই ব'লে মতি-গতি যাই হোক মডারেটদের একেবারে বাদ দেওয়া ঠিক হবে না। পদ্ধতি নিয়ে বিরোধ, ব্যক্তিত্ব নিয়ে নয়। কংগ্রেসের সৌধে ওরা এক কক্ষে কাজ করুক, আমরা জাতীয়তাবাদীরা আরেক কক্ষে। একযোগে যতটুকু সম্ভব ততটুকু একসঙ্গে, নয়তো যার-যার পৃথক-পৃথক এলেকায়। কক্ষ আলাদা হোক, ভবন যেন এক থাকে। ভবনের চূড়ার পতাকা যেন এক থাকে, যার একটাই মাত্র নাম—স্বাধীনতা।

দু দিন পরে ১২ই এপ্রিল বারুইপুরে বক্তৃতা দিতে উঠে অরবিন্দ উপনিষদের এক গাছে দুই পাখির উপমার উল্লেখ করলেন—দিলেন একটি মনোরম ব্যাখ্যা। স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যাটি অভিনব।

এক ফলবান বৃহৎ বৃক্ষ আছে দাঁড়িয়ে। তার উপর ডালে এক পাখি, নিচের ডালে আর এক। উপর ডালের পাখি নিরাসক্ত, কিছু খায় না চায় না, শুধু নিচের ডালের পাখির দিকে তাকিয়ে থাকে। নিচের ডালের পাখি ফল খায়, কূজন করে, উপর-ডালের পাখির দিকে চোখ তোলে না। যতক্ষণ মিষ্টি ফল খায়, মোহে-মায়ায় মশগুল হয়ে থাকে। কিন্তু গাছে তো শুধু মিষ্টি ফলই ধরে না, তেতো ফলও ধরে। আর পাখিকে যখন সেই তেতো ফল খেতে হয় তখন তার মায়া-মোহের ঘোর কাটে। তখন সে উপর ডালের পাখির দিকে

তাকায়, উপলব্ধি করে ঐ পাখি তার নিজেরই স্বরূপ, তারা আসলে অভিন্ন। সে হচ্ছে জীবাত্মা আর উপরের পাখি পরমাত্মা। তখন সে উপলব্ধিতে সে মায়ামুক্ত হয়।

তিক্ততা না পাওয়া পর্যন্ত তার পরিত্রাণ নেই। তিক্ততাতেই রিক্ততার নিরসন। কঠিন দুঃখেই আত্মোপলব্ধি।

বিদেশী শাসনের প্রভাব আমাদের উপর মায়া বিস্তার করে রয়েছে। ওদের সভ্যতার মোহে শক্তিমত্তার মোহে আমরা প্রায় অচৈতন্য। দাসত্বের শৃঙ্খল আমরা ছিন্ন করতে পারব না, ওরা আমাদের চেয়ে বলবান, বুদ্ধিমান—আমাদের এই হীনমন্যতাও মোহ ছাড়া কিছু নয়। শুধু তিক্ত ফলের আস্বাদনেই এই মোহ দূর হতে পারে। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গই এই তিক্ত ফল জুটিয়ে দিয়েছে। সেই তিক্ত ফল খেয়ে আমরা প্রবল ভাবে সচেতন হয়েছি। বলতে গেলে, বঙ্গভঙ্গেই আমাদের মোহভঙ্গ। আমরা চিনেছি নিজেদের, তাকিয়েছি উপরের দিকে, যেখানে সেই নিরাসক্ত পাখি, আমাদের অন্তরাত্মা, অপ্রতিহত মহিমায় বিরাজ করছে।

অন্তরে স্বরাজলাভই আসল স্বাধীনতা। অন্তরে যে স্বাধীন বাইরের পরাধীনতাকে নস্যাৎ করতে তার কতক্ষণ! যে অন্তরপুরুষকে চিনেছে সে আর কোন রাজপুরুষের কাছে মাথা নত করবে!

Free within is free without.

কদিন পরে ময়মনসিং জেলার কিশোরগঞ্জে অরবিন্দ পল্লীসংগঠন সম্বন্ধে বললেন, আর বললেন হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবোধের কথা।

সংগ্রামের ভিত্তি হচ্ছে সংগঠন। স্বাধীনতা-সংগ্রাম শুধু শহরে, শিক্ষিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, তা পল্লীতে সর্বসাধারণের স্তরে পরিব্যাপ্ত হবে। বিদেশী শাসনের লক্ষ্যই ছিল পল্লীকে উপেক্ষা করা। ম্রিয়মাণ পল্লীসমিতিগুলোকে তাই উজ্জীবিত করতে হবে। নিবিড় জনসংযোগ করে জনগণের মধ্যে জাগাতে হবে স্বাধীনতার স্পৃহা। জনগণ না জাগলে স্বাধীনতারও ঘুম ভাঙবে না। শুধু দ্বারপাল নয়, স্বাধীনতার রাজ্যপালও জনগণ।

আর হিন্দু-মুসলমানকে মিলতে হবে বিশুদ্ধ ভালোবাসায়, মহান মানবিক চেতনায়। মতের নয় মনের ঐক্যই আসল। শুধু ভাষায় এক হওয়া নয়, ভালোবাসায় এক হওয়া। বিদেশী শাসন আমাদের দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভালোবাসার অভাব ঘটিয়ে ফাটল ধরিয়েছে, যাতে সে তার প্রভুত্বকে আরো দৃঢ়

করতে পারে। আমরা পরস্পরকে সন্দেহ করি, হিংসে করি আর পরিত্রাণের জন্যে বৃটিশের দরবারে ধরনা দিই। মাকে ভুলে থাকি, সবাই যে আমরা একই মায়ের সন্তান তাও মনে রাখি না। একে অন্যের বিপদে এগিয়ে যাই না, বুক দিয়ে পড়ি না, যা দেখবার ইংরেজ দেখবে, যা করবার তা শুধু ইংরেজেরই করণীয়। আর ইংরেজ বিপদ কাটাতে গিয়ে বিরোধ বাধাচ্ছে আর বিরোধ মেটাতে গিয়ে বিপদ বাড়াচ্ছে। এ শুধু সম্ভব হচ্ছে আমাদের অন্তরে প্রেমের উৎস শুকিয়ে গিয়েছে বলে। সেই উৎসকে মানবিক মমত্ববোধের রসায়নে সঞ্জীবিত করে নিতে হবে। আমাদের এক মা, এক মাটি। মমতায় প্রেরিত হয়ে আমরা আমাদের ঘরোয়া সমস্যা নিজেরাই সমাধান করে নেব, বিদেশীকে সালিশি করতে ডাকব না। সুতরাং সর্বাগ্রে বিদেশী শাসনের অবসান চাই।

'বন্দেমাতরম'-এ লিখছেন অরবিন্দ :

বিপ্লবের প্রণেতা ঈশ্বর, আমরা শুধু তাঁর নির্বাচিত প্রতিনিধি মাত্র। বিপ্লব চলছে ঈশী ইচ্ছার শক্তিতে—তার গতিবিধি নির্ণয় করতে বা নিরোধ করতে পারে এমন কারু সাধ্য নেই। সে সমস্ত বিচার-বিতর্কের অতীত। সমুদ্রের ঢেউকে কে নিয়ন্ত্রিত করবে? কে বলবে এই পর্যন্ত, আর নয়! ঝড়ের গতিকে কে শাসন করবে? কে বলবে এই পথে নয়, ওই পথে ধাবিত হও! ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঝড় ছুটছে, ঢেউ জাগছে, কেউ উঠছে কেউ পড়ছে, কেউ বলি হচ্ছে, কেউ বা শহিদ। একমাত্র ঈশ্বর-ইচ্ছাই বলবত্তম।

ঈশ্বর-ইচ্ছায় ভারতবর্ষ পবিত্রতম অধ্যাত্ম-রসের চিরন্তন উৎস। এই প্রস্রবণ তিনি কখনোই শুকিয়ে যেতে দেবেন না। আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা চাই কেন? রাজনৈতিক স্বাধীনতা চাই যাতে আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে পারি। এই সাধুসন্তের দেশ আবার সেই পুরাকালীন যোগাগ্নিশিখায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠবে, দেশবাসীর সমস্ত ভাবনা উর্ধ্বান্বিত হয়ে শাশ্বত স্পর্শ করবে।

পৃথিবীর জন্যেই ভারতবর্ষকে প্রয়োজন। যাতে পৃথিবীকে সে আলো দিতে পারে, আশা দিতে পারে, দিতে পারে পথ-চলার পরম পাথেয়। তাই পৃথিবীর প্রয়োজনেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা।

উল্লাসকর দত্ত—নলিনীকান্ত সুন্দর বলেছেন : 'উল্লাসের অফুরন্ত আকর। সার্থকনামা পুরুষ।'

উনিশশো পাঁচ সালের কলকাতা। স্বদেশীর জোয়ারে সমস্ত শহর ভাসছে, উজ্জয়ন্ত তরুণেরা তুলে নিয়েছে বিপ্লবের পতাকা। সে রঙের ছোঁয়াচ প্রেসিডেন্সী কলেজেও এসে লেগেছে।

সুভাষ-ওটেনের ঘটনা ঘটেছিল ১৯১৬ সালে, দশ বছর আগে ১৯০৫-এ প্রথম সংঘর্ষ রাসেল আর উল্লাসকরের মধ্যে। সুভাষ ওটেনকে জুতোপেটা করেছিল তেমনি রাসেলকে জুতোপেটা করল উল্লাসকর।

সেই বাঙালীদের নিন্দা। বাঙালীদের দেশপ্রেম নিয়ে কটাক্ষ।

দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র উল্লাসকর। রাসেল লজিকের প্রফেসর।

এক ক্লাসের ঘণ্টার পর আরেক ক্লাসে চলেছে ছাত্ররা—হঠাৎ সমবেত কণ্ঠে উল্লাস-উদ্বেল ধ্বনি উঠল : বন্দেমাতরম—বন্দেমাতরম।

সবাই ছুটল এদিক-ওদিক। কী ব্যাপার ?

রাসেলকে জুতো মেরেছে।

কে মেরেছে ? প্রিন্সিপ্যাল ডক্টর পি কে রায় রাসেলকে নিয়ে ক্লাসে ঢুকলেন। বলো কে মেরেছে ? ছাত্ররা ধোয়া তুলসীপাতার মত মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল। কেউ মুখ খুললে না। প্রিন্সিপ্যাল রাসেলকে বললেন সনাক্ত করতে। লজ্জায় মুখ তুলতে পারে না রাসেল—কাকে সনাক্ত করবে ?

জুতো মেরেছে উল্লাসকর। থাকত ইডেন হিন্দু হস্টেলে, এক পাটি চটি কাগজে মুড়ে নিয়ে সে কলেজে এসেছিল। ক্লাস বদলের সময় ভিড়ের মধ্যে তাক বুঝে সে-জুতো সে রাসেলের গায়ে ছুঁড়ে মেরেছে।

উল্লাসকর মানিকতলার বাগানে বারীন ঘোষের সঙ্গে হাত মেলাল। বই পড়ে-পড়ে বোমা তৈরির কায়দাকানুন শিখতে লাগল। বাবা দ্বিজদাস দত্ত শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রফেসর, বাড়িতে ক্ষুদে একটি ল্যাবরেটরি করেছিলেন, সেখানে উল্লাসকর বসল মকসো করতে।

পুরোপুরি একটি বোমা তৈরি হল অবশেষে। ঠিক হল এটিকে ফাটিয়ে দেখতে হবে সৃষ্টিটা সফল হয়েছে কিনা। পরীক্ষাটা হবে কোথায় ? ঠিক হল লোকচক্ষুর বাইরে, পাহাড়ী অঞ্চলে। দেওঘরের কাছে দিঘিরিয়ায়।

রেল-লাইনের ওপারে গুমটি পার হয়ে ছোট যে একটি পাহাড়ের সার তাই দিঘিরিয়া। চূড়ায় যে একটা খাড়া পাথর দেখা যাচ্ছে তারই আড়াল থেকে বোমাটা ছোঁড়া হবে ঢালের দিকে। ছুঁড়েই বসে পড়া যাবে যাতে ফাটা বোমার টুকরো না উলটে কারু গায়ে লাগে।

দলে ছিল পাঁচজন। বারীন, উল্লাসকর, নলিনীকান্ত, বিভূতিভূষণ সরকার আর প্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্তী।

বোমাটা ছুঁড়বে কে?

আগের কোনো একটা বিপ্লবাত্মক কাজে নিয়ে যাওয়া হয়নি বলে প্রফুল্লর অভিমান ছিল। তার অভিমান এবার ভেঙে দেওয়া যাক। বারীন বললে, প্রফুল্লই ছুঁড়ুক। তারই হোক অগ্রণীর ভূমিকা।

বোমা হাতে নিয়ে দাঁড়াল প্রফুল্ল। তার পাশেই রইল উল্লাসকর, বোমার যে কারিগর। দূরে-দূরে সরে রইল বারীন আর বিভূতি। আর নলিনী উঠল কাছাকাছি একটা গাছের উপরে যাতে সমস্ত দৃশ্যটা তার চোখের সামনে ধরা থাকে।

প্রতীক্ষা-তীক্ষ্ণ নিস্তব্ধ মুহূর্ত।

হঠাৎ একটা আগুনের ফুলকি জ্বলে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গেই নিদারুণ শব্দে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ।

বোমা ফেটেছে! সাকসেসফুল! আনন্দধ্বনি করতে করতে নলিনী নেমে পড়ে ছুটে গেল সেই পাথরের কাছে। বারীন আর বিভূতিও দেরি করল না।

কিন্তু এ কী হৃদয়বিদারণ দৃশ্য! উল্লাসের দু বাহুর মধ্যে নিস্পন্দ প্রফুল্ল।

প্রফুল্ল আর নেই। তার কপাল ফেটে ঘিলু বেরিয়ে পড়েছে। সে এখন সমস্ত অভিমানের বাইরে।

বোমাটা নিচে পড়তে পায়নি, শূন্যে ছুঁড়ে মারতে শূন্যেই ফেটেছে, আচ্ছাদন নেবার অবকাশ পায়নি প্রফুল্ল। একটি মুহূর্তের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশেই সে লোপাট হয়ে গিয়েছে।

'কিন্তু উল্লাস?'

সে আহত—তাকে আজই কলকাতায় ফিরিয়ে নেওয়া দরকার।

আর প্রফুল্লকে?

'কী আর করা যাবে! ও এখানেই শুয়ে থাক।' বললে বারীন, 'এটা যুদ্ধক্ষেত্র। আর যুদ্ধক্ষেত্রে প্রফুল্ল আমাদের প্রথম সৈনিক। প্রথম শহিদ।'

উল্লাসকরকে কলকাতায় ডাক্তারের জিম্মায় রেখে পরদিন ফিরল বারীন। সঙ্গে উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়।

উপেন বললে, 'চলো, সেই তীর্থক্ষেত্র দেখে আসি।'

ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গেল প্রফুল্ল তেমনি শুয়ে আছে। মাথার উপরে

কোনো শকুন-চিল উড়ছে না। যেমনি কাপড়েচোপড়ে ঢাকা ছিল তেমনি আছে। কোথাও এতটুকু নড়চড় হয়নি। যেন নাম ধরে ডাক দিলেই উঠে পড়বে।

দেওঘর ছেড়ে যাবার আগে ঘটনায় তিন দিন পর শেষবার তীর্থদর্শনে এল বিপ্লবীরা। কিন্তু এ কী অভাবনীয়। প্রফুল্লর চিহ্নমাত্র নেই। তবে কি সে বন্য পশুর আহার্য হল? তাকে বন্য পশু যদি টেনে নেবে, তার কি তবে কোনো চিহ্ন থাকবে না? বন্ধুরা অনেক খুঁজল আশেপাশে, শরীরের অংশ দূরে থাক, এক তন্তু কাপড়ও কোথাও মিলল না। অন্তত একটা টানা-হেঁচড়ার দাগও তো থাকবে। তাও নেই। এ যে পরিষ্কার হাওয়া হয়ে যাওয়া।

এ অন্তর্ধানের সূত্র ধরে গুজব রটল কোনো সন্ন্যাসী নাকি পরিত্যক্ত প্রফুল্লকে বাঁচিয়ে তুলেছে আর কলকাতার রাস্তায় প্রফুল্লকে কেউ কেউ দেখেছে স্বচক্ষে।

কে দেখেছে? কোথায় প্রফুল্ল?

কে কোথায় দেখবে। চতুর্দিক যেমন নিঃশব্দ তেমনি নিশ্চিহ্ন।

অরবিন্দ ছাড়া এ সন্দেহের নিরসন আর কে করতে পারে? একদিন নলিনীকান্ত অরবিন্দকে জিজ্ঞেস করল নিভৃতে, 'প্রফুল্লর সত্যিকার খবরটা কী?'

অরবিন্দ বললেন, 'সত্যিকার খবর প্রফুল্ল মারা গিয়েছে।'

বারীন ঘোষ লিখছে: 'প্রফুল্ল চক্রবর্তী একটা কাজে যাইতে পায় নাই বলিয়া আমার উপর অভিমান করিয়াছিল, তাহার অভিমানও রণচণ্ডী রাখিলেন, মায়ের বরে সন্তান মরিয়া বাঁচিল। যে কাজে মরিবার কথাই নহে, তবু আমাদের সব চেয়ে মনস্বী, ধীর, মহৎ-চরিত্রের ছেলে প্রফুল্লই সে কাজে আচম্বিতে নির্জন পাহাড়ের শৃঙ্গে বোমা ফাটিয়া মরিল।'

আর উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখল. 'প্রফুল্লের মৃত্যুর সংবাদে একটা অন্ধ রাগ আর ক্ষোভে মনটা ভরিয়া গেল। মনটা শুধু আর্তনাদ করিতে-করিতে বলিতে লাগিল, সব চুলোয় যাক, সব চুলোয় যাক।'

বিপ্লবীরা তলপি-তলপা গুটিয়ে ম্লান মুখে ফিরে এল মুরারিপুকুরে।

তবে কি লেলে মহারাজের ভবিষ্যৎবাণীই সফল হবে? বিপ্লবী যুবকদের বলেছিলেন লেলে, 'ভারতের স্বাধীনতা অনিবার্য। তা একরকম বিনা রক্তপাতে এসে যাবে, বোমা-পিস্তলের দরকার হবে না। সুতরাং তোমরা এ হিংস্র পথ ছেড়ে দাও।'

বলে কী অবিশ্বাস্য কথা! বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা আসবে—আসে কখনো?

'আসবে। ভারতের বেলায় আসবে।' লেলে মহারাজ বললেন, 'ভগবানের আশীর্বাদের মত আকাশ থেকে এ স্বাধীনতার ধন তোমাদের হাতে এসে পড়বে —তোমরা শুধু ঠিকমত একে কাজে লাগাও। তোমাদের শাসনযন্ত্রটা শুধু ঠিকমত গড়ে নাও।'

কথাটা বিপ্লবীরা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল। ইংরেজ তার এই জমিদারী ছেড়ে অমনি-অমনি সরে পড়বে এ আজগুবীর চেয়েও আজগুবী। তা ছাড়া তারা সবাই মহামায়া অভয়ার সন্তান—দেশমাতৃকার পায়ে বলিপ্রদত্ত—তাদের ভয়ডর বলে কিছু নেই। তারা কারু স্তুতি বা শোকাশ্রুর কাঙাল নয়।

চন্দননগরের মধ্য দিয়ে বাইরে থেকে অস্ত্র আনত বিপ্লবীরা। টের পেয়ে সেখানকার মেয়র তার্দিভেল অস্ত্র-আমদানি বন্ধ করে দিল। তার্দিভেলকে শেষ করে দিতে চাইল। সে উদ্দেশ্যে বোমা ছুঁড়ল তার বাড়িতে। ছোট-লাট ফ্রেজারের উদ্দেশে ছোঁড়া বোমাটা তবু ফেটেছিল, এ বোমাটা ফাটলই না।

লেলে যাই বলুন, উদ্যোগ-পর্ব যতই দরিদ্র হোক—বিরাট-পর্বে নিশ্চয়ই মহৎ ফলোদয় হবে। এই ভগবানের অভিপ্রায়। সুতরাং ফিরে যাবার কথা আর ওঠে না। থেমে থাকবার কথাও অবান্তর।

বিপ্লবীরা বাগানের বাড়িতে বসে গীতাপাঠ শুরু করল।

গোড়াগুড়ি থেকেই চলছিল এ গীতাপাঠ। বাইরের মানুষ ভাবত এ বুঝি এক ব্রহ্মচারীদের আখড়া। ভিতরে যে বোমার আয়োজন চলছে এ ধারণা করে কার সাধ্য? কাঁদতে-কাঁদতে শোক, খেতে-খেতে খিদে, ডাকতে-ডাকতে অনুরাগ, তেমনি বার বার গীতা-গীতা বলতে-বলতে যে ব্রহ্মচারীরা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে উঠবে তাতে আর সন্দেহ কী!

গীতার অর্থ কী? বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ: দশবার বললে যা হয় তাই। 'গীতা' 'গীতা' দশবার বলতে গেলে 'ত্যাগী' 'ত্যাগী' হয়ে যায়। গীতার এই শিক্ষা—হে জীব, সব ত্যাগ করে ভগবানকে লাভ করবার চেষ্টা করো। সাধুই হোক সংসারীই হোক—মন থেকে আসক্তি ত্যাগ করতে হয়। আসক্তি-ত্যাগেই পরিপূর্ণতম আত্মসমর্পণ।

গীতাই জীবনের সব চেয়ে বড় বোমা। শুধু আলোড়িতই করে না, আলোকিত করে রাখে। অনন্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীবনলাভের পথ উন্মুক্ত করে দেয়।

স্থানীয় এক পুলিস-ইনস্পেক্টরের কী দুর্মতি হল, আখড়ায় এল গীতাপাঠ

শুনতে। গীতাপাঠ শুনে মুগ্ধ হয়ে গেল। মন্দ কী, দুষ্কর্ম তো কিছু কম করছি না—এদের ক্লাসে ভর্তি হয়ে যাই, যতদূর পারি চিত্তগ্লানি দূর করি।

পরে যখন সব জানাজানি হয়ে গেল এ আসলে ইংরেজ-মারার বোমার কারখানা তখন ইনস্পেক্টরের আত্মারাম প্রায় খাঁচাছাড়া। শেষ পর্যন্ত তার প্রাণ না যাক, কর্মবন্ধন—চাকরিটি গেল।

ঠিক হল ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে শেষ করতে হবে। সুশীল সেন নামে এক কিশোর বিপ্লবী ইংরেজ সার্জেন্টকে চড় মেরেছিল, সার্জেন্ট ভারতবর্ষের নিন্দে করেছে বলে। সুশীলকে ধরে নিয়ে কিংসফোর্ডের কোর্টে হাজির করানো হল। কিংসফোর্ড বেত্রাঘাতের আদেশ দিল। আর সে বেত মারা হল প্রকাশ্য আদালতে।

রক্তাক্ত দেহে অজ্ঞান হয়ে পড়ল সুশীল।

'আমায় বেত মেরে কি মা ভুলাবে
আমি কি মার সেই ছেলে?
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি
কে পালাবে মা ফেলে?
মা গো, যায় যেন জীবন চলে
শুধু জগৎমাঝে তোমার কাজে
বন্দেমাতরম ব'লে ॥'

এই বর্বর বিচারে সারা দেশ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। গভর্ণমেণ্ট কিংসফোর্ডকে কলকাতা থেকে সরিয়ে নিয়ে মজঃফরপুরে বহাল করলে। সেই মজঃফরপুরেই পাঠানো হল ক্ষুদিরাম বসু আর প্রফুল্ল চাকিকে।

তারিখটা ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল।

কিংসফোর্ডের গাড়ি ভুল করে অন্য একটা গাড়িতে বোমা ছোঁড়া হল। কিংসফোর্ড মরল না, তার বদলে মরল মিসেস কেনেডি ও তার মেয়ে।

ক্ষুদিরাম ধরা পড়ল। পালাল প্রফুল্ল (চাকি)।

পুলিস সাবইনস্পেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জি প্রফুল্লর সন্ধান পেয়েছে। মোকামাঘাট স্টেশনে রেলওয়ে পুলিসের সাহায্য নিয়ে তাকে ধরতে এল।

প্রফুল্ল পকেট থেকে রিভলভার বার করে দেখল তাতে তিনটে মাত্র গুলি আছে। একটা নন্দলালকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ল, লাগল না। আরেকটা? না, আর খরচ করা চলে না। নন্দলালকে উদ্দেশ করে শুধু বললে, 'আপনি বাঙালী

হয়ে আমাকে ধরবেন? কিন্তু কে আমাকে ধরে?' বলে রিভলভারের মুখটা নিজের হাঁ-করা মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে ঘোড়া টিপল।

প্রফুল্ল চাকি সম্পর্কে লিখছেন নলিনীকান্ত: 'রিভলভার হাতে নিয়ে সে বলত, ধরা পড়লে আমি কিন্তু বেঁচে থাকতে চাইব না, পুলিসের অত্যাচারও সহ্য করব না, কিংবা স্বীকারোক্তির প্রলোভনও কাছে আসতে দেব না—দেখ এই ভাবে দেব নিজেকে শেষ করে।' বলে হাঁ করে মুখের ভিতর পিস্তলের নলটা ঢুকিয়ে দিত আর ঘোড়া বা ট্রিগারটায় আঙুলের চাপ। আরও বলত: 'এই রকমটাই sure, অন্য রকমে অনেক সময় শুধু নিজেকে আহত করা ছাড়া বেশি বিপদ হয় না—কিন্তু আহত হয়ে বাঁচাই তো বেশি বিপদ!' প্রফুল্ল চাকি ঠিক যেমন প্র্যাকটিস করেছিল ঠিক সেই ভাবে আত্মহত্যা করে—আত্মহত্যা বলতে চাই না, জীবনদান করে।'

পরে বিপ্লবীরা প্রফুল্লর বদলা নিল। কলকাতার সার্পেন্টাইন লেনে নন্দলালকে গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করল।

মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা 'নবশক্তি' পত্রিকার মালিক, অফিস ৪৮ গ্রে স্ট্রীটে। এঁরই ছেলে চিত্তরঞ্জন, যে বরিশালে প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশনে পুলিসের লাঠির বাড়ি খেয়েও 'বন্দেমাতরম' বলা বন্ধ করেনি। বিপ্লবের রক্ত এদের শিরায়-শিরায়। বন্দোবস্ত হয়েছিল 'নবশক্তি' মানিকতলা বাগানের বিপ্লবীদেরও মুখপত্র হবে। সেই উপলক্ষে অরবিন্দ তাঁর স্কট লেনের বাড়ি ছেড়ে গ্রে স্ট্রীটের এই গৃহে এসে উঠেছেন। নিচের তলায় 'নবশক্তি', দোতলায় পিছন দিকে অরবিন্দের এলাকা। অরবিন্দের সঙ্গে আছেন তাঁর স্ত্রী আর বোন—মৃণালিনী আর সরোজিনী।

বিপ্লবী দলের অবিনাশ ভট্টাচার্য দলের হয়ে পত্রিকার তদারকি করে আর অরবিন্দের ঘর-সংসার দেখে-শোনে। তার হেপাজতে তিনটি রাইফেল আছে আর তারা আছে ঐ গ্রে স্ট্রীটের বাড়িতে।

পয়লা মে থেকেই পুলিস চঞ্চল হয়ে উঠেছে আর বাগানের ছেলেদের অনুসরণ করছে। বোঝা গেল ব্যাপার সঙ্গিন, বাগানে পুলিসী হামলার বুঝি আর দেরি নেই। বিকেলে দৈবপ্রেরিতের মত অবিনাশ এসে হাজির, তার সঙ্গে একখানা দৈনিক 'এম্পায়ার'। তাতে মজঃফরপুরে বোমার কথা উল্লেখ করে লেখা হয়েছে—কাদের দ্বারা এ কাণ্ড ঘটেছে পুলিস তা জানে। শিগগিরই এর কূল-কিনারা হবে।'

ঠিক হল তড়িঘড়ি সব লুকিয়ে ফেলতে হবে, পুড়িয়ে ফেলতে হবে, তারপরেই সকলে ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে। গ্রে স্ট্রীটের বাড়ি থেকে অবিনাশ তার হেপাজতি মাল এখানে সামিল করে দিক। অরবিন্দ না প্রত্যক্ষে জড়িয়ে পড়েন!

সন্ধ্যের দিকে কটা পথহারা লণ্ঠন যেন চলাফেরা করছে মনে হল। প্রশ্ন করা হল দূর থেকে: 'তোমরা কে?'

'আমরা ব্রহ্মচারীর দল।'

'কী কর এখানে?'

'যোগাভ্যাস করি।'

'আচ্ছা।' নতুন কণ্ঠস্বরে কে আরেকজন বললে মিত্রের মত, 'আজ থাক, কাল সকালে এসে দেখে যাব।'

বিপ্লবী যুবকদের মনের মধ্যে ডাক দিয়ে উঠল—এ কি ছদ্মবেশী কোন হিতৈষী প্রভাত হবার আগেই তাদের পালিয়ে যেতে বললে না?

উপেন্দ্রেরও তাই ইচ্ছে ছিল, তক্ষুনি সবাই কেটে পড়ে। যাক সব চুলোয়।

কিন্তু তা কী করে সম্ভব? সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র, বোমার সাজ-সরঞ্জাম লোহার পাত দিয়ে তৈরি দুটো বাক্সের মধ্যে পুরে মাটির তলায় পুঁতে ফেলতে হবে এমন নিখুঁত করে কবর দিতে হবে একটি ঘাসও না টের পায়। তারপর রাশীভূত কাগজপত্র নামঠিকানা প্ল্যান-চার্ট মেনিফেস্টো সব অগ্নিতে আহুতি দিতে হবে। এ কি চাট্টিখানি কথা? বলামাত্র এক্ষুনি-এক্ষুনি কি সমাধা করা যায়?

সব কাজ মোটামুটি নিষ্পন্ন করতে রাত প্রায় নিঃশেষ। এখনো বেশ অন্ধকার আছে, পাখিপাখাল এখনো নিঃসাড়, এই একটুখানি গড়িয়ে নিই। অত কঠিন পরিশ্রমের পর গা-হাত-পা মেলতে কার না ইচ্ছে করে? ভয় নেই ভোরের আলো ফোটবার আগেই যে যার দিকে ছুট দেব।

কিন্তু আলো ফোটবার অনেক আগেই পুলিস মুরারিপুকুর বাগান ঘেরাও করল।

বারীন দেখল তার চোখের সামনে রিভলভার হাতে সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে।

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করল সার্জেন্ট।

'আমি এই বাগানের মালিক।'

'নাম কী?'

'বারীন্দ্রকুমার ঘোষ।'

'কী বললে? অরবিন্দ ঘোষ?'

'না। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ।'

'সে পরে দেখা যাবে। তুমি গ্রেপ্তার হলে। এই, বাঁধো ইসকো।'

পুলিস বারীনের কোমরে দড়ি বাঁধল।

পুলিস খুব আশা করেছিল, নাটের গুরু অরবিন্দ ঘোষকে মুরারিপুকুরের বাগানে একই জালে পারবে ধরতে। না পেয়ে হতাশ হল পুলিস। আর হতাশাই হঠকারিতাকে ডেকে আনে।

অরবিন্দকে ধরতে হল আলাদা করে, নিরিবিলি, সংসার-আলয়ে।

মেঝেতে বিছানা পাতা, অরবিন্দ ঘুমুচ্ছিলেন নিশ্চিন্ত হয়ে। হঠাৎ সরোজিনীর ত্রস্ত ডাকে জেগে উঠলেন। বাড়িতে কারা সব এসেছে!

সশস্ত্র পুলিস সদলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। খোদ সুপারইন্টেণ্ডেণ্ট ক্রেগান, ২৪ পরগণার ভারপ্রাপ্ত ক্লার্ক, আর দেশী পুলিস-কর্তা বিনোদ গুপ্তের পরিচালনায় একটি লাল পাগড়ির বাহিনী।

অরবিন্দ নির্বিকার। বিছানায় বসে আছেন তো বসেই আছেন।

ক্রেগান রুক্ষস্বরে জিজ্ঞেস করলে, 'অরবিন্দ ঘোষ কে?'

অরবিন্দ শান্তমুখে বললেন, 'আমিই অরবিন্দ ঘোষ।'

॥ সতেরো ॥

ক্রেগান গর্জে উঠল: একে অ্যারেস্ট করো।

অরবিন্দ ওয়ারেণ্ট দেখতে চাইলেন। ওয়ারেণ্ট পড়ে স্থিরহস্তে সই করলেন। দেখলেন খুনের চার্জ। বোমা সহযোগে খুন। কিন্তু এ বাড়িতে বোমা কোথায়?

ক্রেগান বিদেশী শাসনের বর্বরতার প্রতিমূর্তি। কনস্টেবলকে হুকুম করল: আসামীর হাতে হাতকড়া লাগাও, কোমরে দড়ি।

কারাকাহিনীতে লিখছেন অরবিন্দ: 'ক্রেগানের হুকুমে আমার হাতে হাতকড়ি, কোমরে দড়ি দেওয়া হইল। একজন হিন্দুস্থানী কনস্টেবল দড়ি ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সেই সময়েই শ্রীযুক্ত অবিনাশ ভট্টাচার্য ও শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র বসুকে পুলিস উপরে আনে, তাহাদেরও হাতে হাতকড়ি, কোমরে দড়ি।'

ক্রেগানের আচরণই অশিষ্ট নয়, কথাবার্তাও অভদ্র। কী একটা কদর্য মন্তব্য করতেই তীব্র প্রতিবাদ করলেন অরবিন্দ। শুরু হল বিতণ্ডা।

বিনোদ গুপ্ত ক্রেগানের কানে-কানে বললে, 'বি-এ পাস।'

'আপনি বি-এ পাস করেছেন!' ক্রেগান চমকে উঠল: 'আপনি শিক্ষিত তাহলে এই কাটখোট্টা ঘরে মেঝেতে শোন কী করে? আপনার লজ্জা করে না?

অরবিন্দ বললেন, 'আমি গরিব, গরিবের মতই থাকি।'

'তাহলে কি আপনি বড়লোক হবার মতলবেই এই সব কাণ্ড করছেন?'

অরবিন্দ স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

লিখছেন কারাকাহিনীতে: 'দেশ-হিতৈষিতা স্বার্থত্যাগ বা দারিদ্র্য ব্রতে মাহাত্ম্য এই স্থূলবুদ্ধি ইংরেজকে বোঝানো দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া আমি সে চেষ্ট করিলাম না।'

বিনোদ গুপ্তের ভারি অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল, সে ক্রেগানকে বললে, হাতকড়াট খুলে নিতে। ক্রেগানের মেজাজ তখন কিছুটা নরম হয়েছে, সে কনস্টেবলকে বললে, খুলে দাও হাতকড়া।

কী ঘোর বিক্রমে চলল খানাতল্লাসি! যেখানে যা কিছু কাগজের টুকরে পায়, তাতে যদি কিছু লেখা থাকে, তা ইংরেজি-বাংলা গদ্য-পদ্য নাটক-কবিতা যা হোক না কেন, পুলিস তাই কবজা করে। আর যদি চিঠি হয়, বিনোদ গু উল্লাসে গম্ভীর হয়ে ওঠে, কী না জানি মূল্যবান প্রমাণ হস্তগত হল!

কিন্তু ও-সবে অরবিন্দের বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। তিনি জানেন তাঁ বাড়িতে বোমা-তৈরি করার বা এ নিয়ে কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার দলিল থাক অসম্ভব।

কিন্তু ইংরেজের পুলিসের পক্ষে অঘটন ঘটানো অসম্ভব কি?

খুঁজতে খুঁজতে একটা কার্ডবোর্ডের বাক্সে কিছু মাটি পাওয়া গেল।

'এ কী?' চমকে উঠল ক্লার্ক।

নিশ্চয়ই কোনো তেজস্কর ভয়ঙ্কর পদার্থ। ভীত-সন্দিগ্ধ চোখে দেখতে লাগ বার-বার। জিজ্ঞেস করল: 'কি এটা?'

অরবিন্দ বললেন, 'মাটি।'

ক্লার্ক আশ্বস্ত হতে পারছে না—নিশ্চয়ই কোনো বিস্ফোরক মশলা। জিজ্ঞে করল, 'কোথাকার মাটি?'

অরবিন্দ বললেন, 'দক্ষিণেশ্বরের।'

ক্লার্কের সন্দেহ ভিত্তিহীন নয়—এ মাটিতে বিস্ফোরণের মন্ত্র আছে।

কিন্তু মাটিকে বিশুদ্ধ মাটি বলে চিনতেও ক্লার্কের মত মানুষদের দেরি হয় প্রথমে মনে করা হল একে রাসায়নিক গবেষণাগারে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা কর

উচিত। দেখা উচিত সত্যি এর মধ্যে কী শক্তি নিহিত আছে! কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাটিই নিজেকে মাটি বলে সাব্যস্ত করালে। সত্যি, দরকার নেই নিয়ে গিয়ে, অন্ত কী শক্তি নির্গত হয় তার ঠিক কী।

মাটি ছেড়ে দিল।

রামকৃষ্ণ মিশনের অনুরাগী এক ভক্ত যুবক এই মাটি এনে দিয়েছিল অরবিন্দকে। মৃণালিনী দেবীই তা কার্ডবোর্ডের বাক্সে রেখে দিয়েছিলেন।

কার্ডবোর্ডের বাক্স ছেড়ে দিল পুলিস, কিন্তু '-বশক্তি'-র লোহার সিন্দুকটা তুলে নিয়ে চলল। যেহেতু ডালাটা খোলা গেল না, সিন্দুকটাই সমূলে উৎপাটন করে নিয়ে চলো। আর নিয়ে গেল একটা সাইকেল। যেহেতু সাইকেলের রেলওয়ে-লেবেলে কুষ্টিয়ার নাম আছে আর যেহেতু কুষ্টিয়ায় এক সাহেবকে গুলি করা হয়েছে তখন সন্দেহ কি, এই সাইকেল এক চলন্ত প্রমাণ!

ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে শুরু করে বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত এই লঙ্কাকাণ্ড। পরে এবার ধৃতদের নিয়ে থানায় যাত্রা করো।

ফটকের বাইরে এসে অরবিন্দ দেখলেন ভূপেন্দ্রনাথ বসু এসেছেন। ভূপেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের মডারেট দলের নেতা ও সম্পর্কে অরবিন্দের মেসোমশাই। কিন্তু ভূপেন্দ্রনাথ অবাক—অরবিন্দের এ কী সাজ!

বিনোদ গুপ্তের উপর তম্বি করে উঠলেন: 'এ কী অসভ্যতা! কোমরে দড়ি দিয়েছেন কেন?'

'না, না,—হাতকড়া তো আমিই খুলিয়ে নিয়েছি, না ন', দড়িও খুলে নাও।' বিনোদ গুপ্ত নিজেই উদ্যোগ করে এগিয়ে এল। ক্রেগান আপত্তি করল না—ধৃত ব্যক্তিদের থানায় নিয়ে যাবার ভার বিনোদের উপর।

ভূপেন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'চার্জটা কী?'

বিনোদ গুপ্ত মুখ গম্ভীর করে বললে, 'খুন। ৩০২ ধারা।'

ভূপেন্দ্রনাথ থ হয়ে রইলেন।

অবিনাশ ও শৈলেন-সহ অরবিন্দকে থানায় নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে স্নানাহারের পর লালবাজার। লালবাজারে দু-তিন ঘণ্টা বসিয়ে রাখার পর রয়েড স্ট্রীটে ডিটেকটিভদের আড্ডায়। সেখানে ডিটেকটিভ-প্রধান মৌলবী শামসুল আলম অরবিন্দকে ধর্মশিক্ষা দিতে বসলেন।

'কি বলেন, সত্যবাদিতা ধর্মের একটি প্রধান সোপান।' অনেক কথার পর বললেন মৌলবী সাহেব, 'সাহেবরা বলে, অরবিন্দ ঘোষ হত্যাকারী দলের নেতা—

ভারতবর্ষের পক্ষে এ বড় দুঃখ ও লজ্জার কথা। তবে সত্যবাদিতা মেনে চললে situation saved হয়।' বলে ফোড়ন দিলেন: 'আমি বিশ্বাস করি বিপিন পাল আর অরবিন্দ ঘোষের মত চরিত্রবান ব্যক্তি নিশ্চয়ই মিথ্যার আশ্রয় নেবেন না, যাই করে থাকুন না কেন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবেন।'

অরবিন্দ মনে করলেন মুক্তকণ্ঠ না হয়ে মৌনে থাকাই প্রশস্ত।

কতক্ষণ পরে মৌলবী সাহেব টিপ্পনী কাটলেন: 'আপনি যে আপনার ছোট ভাইকে বোমা তৈরি করবার জন্যে বাগান ছেড়ে দিয়ে এলেন সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি।'

অরবিন্দ মৃদু হাসলেন, বললেন, 'বাগান যেমন আমার তেমনি আমার ভাইয়ের। বাগান তাকে ছেড়ে দেবার কোনো মানে হয় না। আর যদি ছেড়ে দিয়েও থাকি, তা বোমা তৈরি করার জন্যে, এ আপনাকে কে বললে?'

মৌলবী সাহেব থমকে গেলেন, বললেন, 'না, না, আমি বলছি যদি তা দিয়ে থাকেন—'

অরবিন্দ কথা বাড়ালেন না।

সাত-পাঁচ বহুতর ধর্মকথা শোনাতে শোনাতে মৌলবী সাহেব বললেন, 'জানেন আমার সব কিছুর উন্নতির মূলে আমার বাবার একটি অমূল্য উপদেশ কাজ করেছে। সেটি হচ্ছে, সম্মুখের অন্ন কখনো ছাড়বে না।'

বলে এমন তীব্র দৃষ্টিতে অরবিন্দের দিকে তাকালেন যে অরবিন্দের মনে হল তিনিই বুঝি সম্মুখের অন্ন!

ঝড়জল শুরু হল অকস্মাৎ। আর সেই ঝড়জলের মধ্যেই অরবিন্দ আর শৈলেনকে লালবাজার হাজতে চালান দেওয়া হল।

দোতলায় একটা বড় ঘরে জায়গা হল দুজনের। আহার্য এল নামমাত্র জলখাবার।

তারপর ঘরে ঢুকল স্বয়ং পুলিস কমিশনার, দুর্ধর্ষ হ্যালিডে।

দুজনকে একসঙ্গে এক ঘরে রাখা হয়েছে দেখে সার্জেন্টের উপর দারুণ ক্রুদ্ধ হল। শৈলেনকে দেখিয়ে বললে, 'একে আরেক ঘরে নিয়ে যাও।' তারপর অরবিন্দের দিকে ইঙ্গিত করে বললে, 'দেখো কেউ যেন এর সঙ্গে না থাকে, কেউ না কথা বলে।'

ঘর ফাঁকা হয়ে যেতেই হ্যালিডে পুরোপুরি অরবিন্দের সম্মুখীন হল। জিজ্ঞেস করলে, 'এই কাপুরুষোচিত দুষ্কর্মে লিপ্ত ছিলেন বলে আপনার কি লজ্জা

হয় না ?'

অরবিন্দ দৃঢ়স্বরে বললেন, 'আমি লিপ্ত ছিলাম এমনি অনুমান করবার আপনার কী অধিকার ?'

ঘাবড়ে গেল হ্যালিডে। বললে, 'অনুমান নয়, আমি সব জানি।'

'আপনি কী জানেন তা আপনারই জানা।' অরবিন্দের স্বর দৃঢ়তর হল : 'এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে বিন্দুতম সম্পর্কও আমি সর্বতোভাবে অস্বীকার করি।'

হ্যালিডে চুপ করে গেল।

তবু রাত ভরে চলে শুধু পুলিসের আনাগোনা। এটা নয় সেটা, এখানকার নয় অন্য-কোথাকার নানান ধরনের প্রশ্ন—অরবিন্দ বিরক্ত বা বিচলিত হন না, যথাযথ উত্তর দিয়ে যান। সর্বসময়ে এই প্রত্যয়ে স্থির থাকেন যে ভগবান তাঁকে রক্ষা করবেনই করবেন—অকূলে ভাসিয়ে দেবেন না।

নাটকের শুরু এই যে শনিবার ভোরে, রবিবারও অরবিন্দকে হাজত-বাস করতে হয়। রবিবার সকালে দেখলেন কটি অল্পবয়স্ক ছেলে সিঁড়ি দিয়ে নামছে। কারো মুখ চেনেন না, শুধু আন্দাজে বুঝলেন এরা মানিকতলা বাগানের ছেলে—জালে ধরা পড়েছে।

নলিনীকান্ত লিখছেন : আমরা সদলে ধরা পড়ে গেলাম—লাইন করে আমাদের দাঁড় করিয়ে রাখা হল সশস্ত্র পুলিসের কড়া নজরে। সমস্ত দিন প্রায় দাঁড়িয়েছিলাম, একরকম বিনা আহারে—বিকেলের দিকে দু-একখানা সিঙ্গাড়া কচুরি এনে দিয়েছিল পুলিসরা দয়া করে। শুষ্ক কণ্ঠ তখন, মনে হয় আমাদের সেই বিখ্যাত পুকুরের জলেই গলা ভিজিয়ে নিই। সন্ধ্যার সময়ে হুকুম হল, 'চলো।' কোথায় ? আমার তখন ধারণা হয়েছিল এই শেষ —'শেষের সে দিন মন কর রে স্মরণ।' আমাদের যে একটা কেস হবে, আদালত বসবে, উকীল ব্যারিস্টার আসবে, কল্পনাও করতে পারিনি। মনে হয়েছিল সরাসরি কোর্টে নিয়ে গিয়ে দমাদম গুলি করে মেরে ফেলবে—প্রস্তুত করছিলাম সেজন্য নিজেকে। কিন্তু দেখা গেল তা নয়—ব্রিটিশ সরকার দয়ালু। আমাদের নিয়ে গেলেন লালবাজার থানায়, গারদখানায়। সেখানে ছিলাম প্রায় দুদিন। ঐ দুদিন হয়তো ছিল সব চেয়ে কষ্টকর—স্নান নেই, আহার নেই, নিদ্রা নেই—পশুর মত একটি ঘরের মধ্যে এতগুলো লোক আবদ্ধ।

রবিবার সকালে অরবিন্দকে নিচে নিয়ে যাওয়া হল হাত-মুখ ধোবার জন্যে। কিন্তু স্নান ? স্নানের কোনো ব্যবস্থা নেই। আহার বলতে ডাল ভাত

সেদ্ধ কয়েক গ্রাস জোর করে উদরস্থ করা। বিকেলবেলা মুড়ি। তিন দিন টানা এই অবস্থা। শুধু সোমবার সকালে সার্জেণ্ট কেন যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে চা আর রুটি খেতে দিল তা কে বলবে?

সোমবার কমিশনারের কাছে অরবিন্দকে হাজির করানো হল।

'কী বলতে চাও?'

অরবিন্দ বললেন, 'কিছুই না।'

অবিনাশ ও শৈলেনকেও আলাদা-আলাদা জিজ্ঞেস করা হল। কী বলবার আছে? তাদের কে সুমতি দিল, তারাও চুপ করে রইল।

কিন্তু এদিকে বারীন ঘোষ ও আরো কয়েকজন স্বীকার করে বসল। স্বীকারোক্তির উদ্দেশ্য, যদি কয়েকজনের আত্মবলির বিনিময়ে সমগ্র দলটিকে বাঁচানো যায়। যদি আর-সকলে নির্দোষ বলে প্রমাণিত হয়।

আত্মকাহিনীতে লিখছেন বারীন্দ্রকুমার: আমার ঐ এক কথা—উপেন, উল্লাস, হেমচন্দ্র, বিভূতি, ইন্দু সবাইকে আনো, পরামর্শ করি, তাহার পর বলিব। কিন্তু যতটুকু প্রচারের জন্য দরকার, নির্দোষকে বাঁচাইতে দরকার, নিজের নিজের কীর্তিকলাপ দেশকে শুনাইতে দরকার তাহাই বলিব, বেশী বলিব না। অগত্যা পরদিন সকালে উপেন ও উল্লাস আসিল, তর্ক-বিতর্কের পর তাহারা রাজী হইল। আমি বলিলাম, আমরা তো মরিয়াছিই, একবার এসো শেষ প্রচার করিয়া যাই, দেশকে শুনাই যে কেমন করিয়া এ পন্থা ধরিতে হয়, এ সাধনা সাধিতে হয়, এ ব্যূহ গড়িতে হয়। আরো দেখাও কেমন করিয়া আপন মৃত্যু আপনি ডাকিয়া মরিতে হয়, ইংরাজের রাজদ্বারে, কারাগারে, বধ্যমঞ্চে নিঃশঙ্ক নির্ভীক থাকিতে হয়। এই কথায় সবাই ভিজিল, কারণ সবাই-ই সমান অগ্নিমূর্তি, সমান বেপরোয়া, সমান পাগল।'

মঙ্গলবার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট থর্নহিলের কোর্টে অরবিন্দকে নিয়ে আসা হল। সেখানে অরবিন্দের এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা। তাকে বললেন অরবিন্দ, 'বাড়িতে বোলো কোনো ভয় যেন না করে, আমার নির্দোষিতা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হবে।'

লিখছেন অরবিন্দ: আমার মনে তখন হইতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে ইহা হইবেই। প্রথম নির্জন কারাবাসে মন একটু বিচলিত হয় কিন্তু তিনদিন প্রার্থনা ও ধ্যানে কাটানোর ফলে নিশ্চলা শান্তি ও অবিচলিত বিশ্বাস পুনঃ প্রাণকে অভিভূত করে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'ধ্যানের অবস্থা কি রকম জানো? মনটি হয়ে যায় তৈলধারার মত। এক চিন্তা ঈশ্বরের—অন্য কোনো চিন্তা আর ভিতরে আসবে না।' আর প্রার্থনা? বলছেন, 'প্রার্থনা করো। পরমাত্মার সঙ্গে সব জীবেরই যোগ হতে পারে।'

শ্রীঅরবিন্দের বাণী: যোগের পথে ধ্যান ও প্রার্থনা অনেকখানি। কিন্তু প্রার্থনা হবে অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত বা আস্পৃহা। ধ্যান ও জপ হবে অন্তঃস্থ এক আলোকের ও আনন্দের বেগ।'

আর অপরূপা শ্রীমা বলছেন: 'কত ঘণ্টা ধ্যানে অতিবাহিত কর তার উপর আধ্যাত্মিক উন্নতি নির্ভর করে না। তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতি সূচিত করবে যখন ধ্যানের জন্যে আর তোমাকে কোনো চেষ্টাই করতে হবে না। বরং ধ্যান থেকে উঠে আসার জন্যেই তোমাকে চেষ্টা করতে হবে। ধ্যান না করে তখন থাকা যায় না। ভগবানের চিন্তা না করলে তখন কষ্ট হয়, সাধারণ চেতনায় নেমে আসাই তখন কষ্ট...। এমন যদি হয় তাহলে তোমার উন্নতি সম্বন্ধে তুমি নিঃসন্দেহ হতে পারো। ভগবানের মধ্যে চিত্তকে একাগ্র করে ধরা যদি তোমার জীবনে অতি আবশ্যক হয়ে ওঠে, যদি তা না করে তুমি থাকতে পার না, দিবারাত্র মন যদি আপনার থেকেই এই ভাবমুখে থাকে, তাহলে জানবে তোমার সত্যকার উন্নতি হয়েছে। তুমি ধ্যানেই বসে থাকো আর কাজকর্ম করেই বেড়াও, একমাত্র যা প্রয়োজন তা হল তোমার চেতনা—সর্বক্ষণ ভগবানে সচেতন হয়ে থাকা।'

মানিকতলা বাগান চব্বিশ পরগণার সদর আলিপুর কোর্টের এলাকার মধ্যে পড়ে, তাই থর্নহিল আসামীদের আলিপুরে পাঠিয়ে দিল। সেইখানেই তাদের বিচার হবে।

আর বারীনকে নিয়ে যাওয়া হল বার্লি সাহেবের কোর্টে তার স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করাবার জন্যে। সাহেব বারীনকে সতর্ক করে দিল যেন সে মনে রাখে যে সে স্বেচ্ছায় কারু চাপে না পড়ে সজ্ঞানে এই বিবৃতি দিচ্ছে। বিপরীত কিছু বলতে গেলে অমঙ্গল হতে পারে।

বারীন্দ্রকুমার লিখছে: 'সাহেব আমায় বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিলেন তাঁহার তুল্য বিগ্রহধারী পেনাল কোডের কাছে কোন কথা বলিলে তাহা আমার সমূহ অমঙ্গল ঘটাইতে পারে, সুতরাং বুঝিয়া-সুঝিয়া সজ্ঞানে বাহাল-তবিয়তে আমি যেন তাঁহার প্রেমাঙ্ক আশ্রয় করি। আমি বলিলাম, আমি তাহা ভাল রকমই জানি—তবু আজ তাঁহাকে কষ্ট করিয়া এ অভাগার কর্মকথা শুনিতে

হইবে; আজ সেরেফ পাথরের দেয়ালকে শ্রোতারূপে পাইলেও আমি বক্তৃতা না দিয়া ছাড়িব না। তাহার পর আমার তথাকরণ ও ঘাড় গুঁজিয়া সাহেবের তাহা লিপিবদ্ধকরণ। সে আইনের খাস কামরায় তখন মাত্র কয়েকজন কাগজের রিপোর্টার, দুই-একটি ছিন্ন-শামলা out at-elbow উকিল ও যথারীতি দারোগা সি. আই. ডি'র পাল উপস্থিত। মনে বড় দুঃখ হইল এই ভাবিয়া যে, এ অভাগা দেশে আজ আমার এমন আরব্য-উপন্যাসের পালা শুনিবার মত একঘর শ্রোতাও জুটিল না রে! একে একে আমরা আপনার মাথা আইনের হাড়িকাঠে আপনি রাখিয়া স্বহস্তে কাটিলাম; এই ছিন্নমস্তাই পালার পর প্রায় সন্ধ্যার মুখে যাত্রা করিলাম শ্বশুরালয়ের রাজকীয় সংস্করণ আলিপুর জেল অভিমুখে। এত কাণ্ডের পর তখন প্রাণটা একটু দমিয়া যাইবার হুকুম চাহিল, বলিল, 'এ পালার সবটা ভাল, এইটা ছাড়া।' ধরা পড়ার চেয়ে দাঁড়াইয়া মরা কত সহজ, তাহা ভাবিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বেশ দীর্ঘ রকমেরই পড়িল। কিন্তু জেলখানার বিরাট ফটক দেখিয়া আমার ফেরারী সাহস আবার ফিরিল। ভাবিলাম, প্রহসনটা শেষ অবধি দেখিয়া মরিতে ক্ষতি কি? আজ আমিই না হয় এর গোড়া, প্রথম বলি; এতদিন তো সবার ভাগ্যেই এই দড়ি, এই খোঁটা, এই ঘাসজল আর তাহার পর অন্তিমে শ্রীদুর্গা বলিয়া ঝুলিয়া পড়াই আছে। দেখাই যাক না কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।'

আলিপুরের ম্যাজিস্ট্রেট আসামীদের জেল-হাজতে রাখবার হুকুম দিল।

হঠাৎ একটি অচেনা লোক অরবিন্দের কাছে এসে বললে, 'শুনছি আপনাকে নির্জন কারাবাসে রাখবার হুকুম হয়েছে। এখন যদি বাড়িতে কিছু খবর দেবার থাকে তো দিন, আমি তা পৌঁছিয়ে দেব।'

তাঁর প্রতি দেশের লোকের এই অযাচিত মমতায় মুগ্ধ হলেন অরবিন্দ। স্নিগ্ধকণ্ঠে ধন্যবাদ জানিয়ে অরবিন্দ বললেন, 'বাড়িতে যা জানাবার ছিল তা আরেকজনকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছি। আর কিছু বলবার নেই।'

জেলে ঢোকবার আগে আসামীদের স্নান করানো হল। অরবিন্দ লিখছেন: 'চারদিন পরে স্নান করিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিলাম।' আর জেলে প্রথম গরম ভাত খেতে পেয়ে নলিনীকান্তের মনে হল যেন 'স্বর্গরাজ্যে পৌঁছে গিয়েছি।'

আসামীদের জেলের পোশাক পরানো হল। এবার যাদের জন্যে যেমন ঘর নির্দিষ্ট হয়েছে তেমনি সবাই সামিল হও।

অরবিন্দের জন্যে নির্দিষ্ট হল একটি নির্জন কারাগার। দৈর্ঘ্যে নয় ফুট, প্রস্থে

পাঁচ-ছয়—একটি ক্ষুদ্র লৌহপিঞ্জর।

কিন্তু জ্যোতির বিহঙ্গকে কে বন্দী করে?

এক অদ্বিতীয় দেবতা সর্বভূতে আছেন প্রচ্ছন্ন হয়ে, তিনি সর্বব্যাপী ও সর্বভূতের অন্তরাত্মা, তিনিই কর্মাধ্যক্ষ, সর্বভূতের নিবাসস্থান, সর্বদ্রষ্টা সাক্ষী। তিনিই চেতয়িতা, চৈতন্যদাতা, নির্গুণ ও নিরুপাধি। তিনিই বহু নিষ্ক্রিয়ের বশীশ্বর, একটি বীজকেই বহু রূপে প্রকাশিত করে চলেছেন। তাঁকে যারা নিজের মধ্যে নিজ স্বরূপে দর্শন করে তারা, সেই আত্মবিদরাই শাশ্বত সুখের অধিকারী।

আমাকে অনস্তিত্ব থেকে মহাস্তিত্বে নিয়ে যাও, অন্ধকার হতে নিয়ে যাও জ্যোতিতে, মৃত্যু হতে অনন্ত মৃত্যু-হীনতায়। জড়ের আধারে জীবজন্মের মানে কী? মানে মৃন্ময় পাত্রে চিন্ময়ী দ্যুতির উজ্জ্বলনের আয়োজন। আমাকে প্রকাশিত করো উন্মীলিত করো। আমি অতিমানবতার অতিমানস জ্যোতির্লোকে উত্তীর্ণ হই।

। আঠারো ।

নির্জন কারাবাস।

সে না-জানি কী ভয়ঙ্কর অবস্থা!

গ্রেপ্তার হবার পর অরবিন্দকে যখন লালবাজার হাজতে নিয়ে যাওয়া হল তখন ক্ষণকালের জন্যে তাঁর বিশ্বাস টলে গিয়েছিল—ভগবান, তুমি এ কী করলে? তবে কি তুমি নেই?

আছি। হৃদয়ে ব'সে কে বললে।

আছ তো আমার এ দশা কেন? আমার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ কেন?

অন্তর থেকে আবার কে কথা কয়ে উঠল: অপেক্ষা করো। কী হয় দেখ।

কী আর দেখব! ভেবেছিলাম দেশহিতের জন্যে আমি যে কাজে ব্রতী হয়েছি তা সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তুমি আমাকে রক্ষা করবে। কিন্তু এ কেমনতরো হল?

শান্ত হও। অপেক্ষা করো।

অরবিন্দ শান্ত হলেন। অপেক্ষা করতে লাগলেন।

তাঁকে লালবাজার থেকে আলিপুরে নিয়ে যাওয়া হল। সমস্ত মনুষ্যজগৎ

থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যাওয়া হল একটি নিঃশব্দ নির্জন গোপন কারাকক্ষে।

কিছুদিন আগে অরবিন্দের কাছে আহ্বান এসেছিল, সমস্ত কর্ম ছেড়ে দাও, ছেড়ে দিয়ে নির্জনে গিয়ে বাস করো, অন্তরের মধ্যে ভগবানের সন্ধান করো আর সাধন করো যেন ভগবানের সঙ্গে সতত যোগযুক্ত থাকো।

কিন্তু কাজ ছাড়া কি সহজ? বিশেষত যে কাজ প্রিয়, যে কাজ সুখকর? তা ছাড়া প্রিয়ত্ববোধের অহঙ্কারে অরবিন্দ মনে করেছিলেন তিনি না থাকলে সে কাজের সমূহ ক্ষতি হবে, চাই কি, সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই কাজ ছাড়া অরবিন্দের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

তাই, আবার অন্তঃস্থ পুরুষের বাণী শুনলেন অরবিন্দ : 'তাই যে-বন্ধন ছিন্ন করবার শক্তি তোমার ছিল না, আমি তোমার হয়ে তা ছিন্ন করে দিয়েছি। আমার এ ইচ্ছে নয় যে তুমি এই কাজ নিয়ে থাকো। তোমার জন্যে আমি অন্য কাজ ঠিক করে রেখেছি আর তার জন্যেই এখানে এনেছি তোমাকে। তুমি নিজে যা শিখতে পারোনি তাই তোমাকে শিখিয়ে দেব আর আমারই কাজের জন্যে তৈরি করে তুলব।'

নির্জন কারাবাস!

ছ হাত লম্বা চার হাত চওড়া এই কুঠুরি না কোটর, গহ্বর না গুহা। এর কোনো জানলা নেই, সামনে লোহার গরাদের মধ্যে দিয়ে যেটুকু পারো চোখ পাঠাও বাইরে। বাইরে ছোট একটি বাঁধানো উঠোন, তার সামনে কাঠের দরজা। দরজার উপর-দিকে দুটি রন্ধ্র, যাতে চোখ রেখে টহলরত সান্ত্রী দেখতে পায় ভিতরে আসামী কী করছে, ঘুমুচ্ছে না বসে আছে চুপচাপ।

একটা ছোট খাঁচায় একই সঙ্গে শোবার ঘর, খাবার ঘর আর পায়খানা। বাসনের মধ্যে একটা মাত্র থালা আর বাটি, আর সেই বাটি করে জল নিয়ে মুখ ধোয়া, স্নান করা, শৌচ করা—খাবার সময় সেই বাটিতেই ডাল ও তরকারি ধরা, জল খাওয়া আর আহারান্তে সেই বাটির সাহায্যেই আচমন করা। জল থাকে বালতিতে, উঠোনে, আর এই এক বালতি জলেই সর্বপ্রকার শৌচ স্নান মার্জন প্রক্ষালন। খাবার জল টিনের বালতিতে, গায়ে নল বসানো, সেই নল গলিয়ে গলায় জল ঢালো। কিন্তু জল তো নয়, তরল অনল। তখন গ্রীষ্মকাল, ঘরে হাওয়া না ঢুকলেও রোদ আসে অবাধে। আর সেই রোদে সমস্ত ঘর একটা জলজ্যান্ত উনুন হয়ে ওঠে।

তবু তৃষ্ণায় অরবিন্দকে সেই টিনের গরম জলই খেতে হয়। এ তো পিপাসার

নিবারণ নয়, পিপাসার বিবৃদ্ধি। কিছুকাল সংগ্রাম করে অরবিন্দ তৃষ্ণা জয় করলেন। আগে ঘৃণা জয় করে নির্ঘৃণ হয়েছেন, এখন তৃষ্ণা জয় করে নিস্তৃষ্ণ।

রোদে-জলে শীতে-উষ্ণে শুক্লে-কৃষ্ণে সমবুদ্ধি, স্থিরবুদ্ধি—সেই নির্দ্বন্দ্ব হওয়ার সাধনারই কি এই আয়োজন নয়? এই কি নয় সেই নিত্যসত্বস্থ হবার ভূমিকা?

তাই জেলের ডাক্তার যখন দয়াপরবশ হয়ে জমাদারকে দিয়ে একটি মাটির কলসী যোগাড় করলেন তখন অরবিন্দের আর সেই ঠাণ্ডা জলের স্পৃহা নেই।

তবু মাঝে-মধ্যে যে ঘরের মেঝেয় গা ঢেলে শোবেন তার সাধ্য কী! এ তো শীতল মাটি নয়, এ পাষাণ—এবড়ো-খেবড়ো—তাই ঘুম চায় না আসতে। এসে-এসে ফিরে-ফিরে যায়। তাই কম্বল বিছিয়েই শুতে হয়। সম্বলের মধ্যে দুটি কম্বল। একটিতে শয্যা, আরেকটিতে উপাধান। দুয়ে মিলে গ্রীষ্ম-তপস্যা। নিদ্রা কই?

কিন্তু যেদিন বৃষ্টি আসে সেদিন মন আনন্দে উতলা হয়ে ওঠে। লাঞ্ছনা অনেক জোটে তাতে সন্দেহই নেই, প্রথমত ঝড়ের তাণ্ডবে ধুলোয় আবর্জনায় ঘর ভরে যায়, তারপর বৃষ্টির ছাঁটে রীতিমত একটি প্লাবনের সৃষ্টি হয়, ভিজে কম্বল নিয়ে ঘরের কোন কোণে পালাবেন অরবিন্দ পথ পান না, তবু এ তো বৃষ্টি, এ তো বাহিরের বিপুলের স্পর্শ, মন যেন প্রাচুর্যের আস্বাদে তন্ময় হতে চায়। কতক্ষণে মেঝে শুকোবে কে জানে, ঘুমের ছুটি হয়ে গিয়েছে। তখন জিতনিদ্র অরবিন্দ কার আশ্রয়ে যান? যান ধ্যানের আশ্রয়ে।

'যথা দীপো নিবাতস্থো'—যোগীর একাগ্রীভূত চিত্ত নিষ্কম্প দীপশিখার মত নিশ্চলে অবস্থান করে।

দোষী প্রমাণ হওয়া দূরস্থান, মামলাই এখনো শুরু হয়নি, তবু এই ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের প্রতি ইংরেজ সরকার এমন ব্যবহার করছে যেন এরা সাধারণ চোর-ডাকাতেরই সমগোত্র। হয়তো এইখানেও ভগবানেরই অমোঘ ইঙ্গিত।

অরবিন্দ লিখছেন:

'সাধারণ দৃষ্টিতে আমাদের সহিত এইরূপ ব্যবহার করা তাহাদের পক্ষে অতিশয় অনুদার ও নিন্দনীয়। আমরা সকলে ভদ্রলোকের সন্তান, অনেকে জমিদারের ছেলে, কয়েকজন বংশে, বিদ্যায়, গুণে, চরিত্রে ইংলণ্ডের শীর্ষস্থানীয় লোকের সমকক্ষ। আমরা যে অভিযোগে ধৃত, তাহাও সামান্য খুন চুরি ডাকাতি নয়; দেশের জন্য বিদেশী রাজপুরুষের সঙ্গে যুদ্ধ-চেষ্টা করা বা সমরোদ্যোগের

ষড়যন্ত্র। তাহাতেও অনেকের দোষের সম্বন্ধে প্রমাণের নিতান্ত অভাব, পুলিসের সন্দেহই তাহাদের ধৃত হইবার একমাত্র কারণ। এইরূপ স্থলে সামান্য চোর-ডাকাতের মত রাখা—চোর-ডাকাত কেন, পশুর ন্যায় পিঞ্জরে রাখিয়া পশুর অখাদ্য আহার খাওয়ানো, জলকষ্ট, ক্ষুৎপিপাসা, রৌদ্র, বৃষ্টি, শীত সহ্য করানো—ইহাতে বৃটিশ রাজপুরুষদের ও বৃটিশ জাতির গৌরব বৃদ্ধি হয় না। ইহা কিন্তু তাহাদের জাতীয় চরিত্রগত দোষ। ইংরাজদের দেহে ক্ষত্রিয়োচিত গুণ থাকিলেও শত্রু ও বিরুদ্ধাচরণকারীর সঙ্গে ব্যবহার করিবার সময় তাহারা ষোল আনা বেনে। আমার কিন্তু তখন বিরক্তিভাব মনে স্থান পায় নাই বরং আমার ও দেশের সাধারণ অশিক্ষিত লোকের মধ্যে কোনো প্রভেদ করা হয় নাই দেখিয়া একটু আনন্দিত হইয়াছিলাম, অধিকন্তু এই ব্যবস্থা মাতৃভক্তির প্রেমভাবে আহুতি দান করিল। একে বুঝিলাম যোগশিক্ষা ও দ্বন্দ্বজয়ে অপূর্ব উপকরণ ও অনুকূল অবস্থা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে আমি চরমপন্থী দলের একজন, যাহাদের মতে প্রজাতন্ত্র এবং ধনী-দরিদ্রে সাম্য জাতীয়-ভাবের একটি অঙ্গ। মনে পড়িল সেই মতকে কার্যে পরিণত করা কর্তব্য বলিয়া সুরাট যাত্রার সময় সকলে একসঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী হইয়াছিলাম, ক্যাম্পে নেতারা নিজেদের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত না করিয়া সকলের সঙ্গে এক ভাবে এক ঘরে শুইতাম। ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, বাঙ্গালী, মারাঠা, পাঞ্জাবী, গুজরাটী দিব্য ভ্রাতৃভাবে একসঙ্গে থাকিতাম, শুইতাম, খাইতাম। মাটিতে শয্যা, ডাল ভাত-দহিই আহার, সর্ব বিষয়ে স্বদেশী ধরনের পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল। কলিকাতা ও বোম্বে শহরের বিলাত-ফেরত ও মাদ্রাজের তিলক-কাটা ব্রাহ্মণসন্তান একসঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন। এই আলিপুর জেলে বাসকালীন আমার দেশের কয়েদী, আমার দেশের চাষা, লোহার, কুমার, ডোম-বাগ্দীর সমান আহার, সমান থাকা, সমান কষ্ট, সমান মানমর্যাদা লাভ করিয়া বুঝিলাম সর্বশরীরবাসী নারায়ণ এই সাম্যবাদ এই একতা, এই দেশব্যাপী ভ্রাতৃভাবে সম্মত হইয়া যেন আমার জীবনব্রতে স্বাক্ষর দিয়াছেন। যেদিন জন্মভূমিরূপিণী জগজ্জননীর পবিত্র মণ্ডপে দেশের সর্বশ্রেণী ভ্রাতৃভাবে এক-প্রাণ হইয়া জগতের সম্মুখে উন্নত মস্তকে দাঁড়াইবেন, সহবাসী আসামী ও কয়েদীদের প্রেমপূর্ণ আচরণে এবং রাজপুরুষদের এই সাম্যভাবে এই কারাবাসে হৃদয়ের মধ্যে সেই শুভদিনের পূর্বাভাস লাভ করিয়া কত বার হর্ষান্বিত ও পুলকিত হইতাম।'

'সর্বত্র সমদর্শনঃ।' গীতা প্রথমে বলেছে, যোগযুক্তাত্মা সমদর্শী হয়ে আত্মাকে

সর্বভূতে, আবার সর্বভূতকে আত্মাতে অবস্থিত দেখেন।

গীতা পরে আরো একটু এগিয়ে এল। বললে, শুধু আত্মাকে দেখেন না, আমাকে দেখেন। অর্থাৎ বাসুদেবকে দেখেন। যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।

সকালে প্রায় সাড়ে চারটেয় জেলের প্রথম ঘণ্টা বাজে। কয়েদীদের জাগাবার ঘণ্টা। কয়েদীরা ফাইল করে বাইরে আসে, হাতমুখ ধুয়ে লপসি খেয়ে কাজে লাগে। নির্জন কারাবাসী অরবিন্দেরও প্রায় সেই দশা। উঠোনে হাতমুখ ধোয়ার পর আবার তাঁকে ঘরে ফিরে যেতে হয়। তাঁরও জন্যে সেই লপসি, সফেন সিদ্ধ বা গলা ভাত, দরজার কাছে রেখে যায়। সাধ্য কী তা মুখে তোলো! অরবিন্দ লিখছেন: তাহার যেরূপ স্বাদ তাহা কেবল ক্ষুধার চোটে খাওয়া যায়, তাহাও জোর করিয়া মনকে কত বুঝাইয়া তবে খাইতে হয়।

খাওয়ার পর অরবিন্দের কাজ কী। কাজ শুধু ধ্যান আর প্রার্থনা।

তারপর দুপুরের কাছাকাছি স্নান। স্নান উঠোনেই, বালতির জলে। অরবিন্দের কারাকক্ষের পাশেই গোয়ালঘর, তারই এক কয়েদী, কী জানি কেন, দয়াপরবশ হয়ে অরবিন্দের বালতিতে তাঁরই খুশিমত তুলে দেয় আর সেই জলে অরবিন্দ তৃপ্তি করে স্নান করেন। জেলের তপস্যার মধ্যে লিখছেন অরবিন্দ, 'প্রত্যহ স্নানের সময়েই গৃহস্থের বিলাসবৃত্তি ও সুখপ্রিয়তাকে তৃপ্ত করিবার অবসর। অপর আসামীদের ভাগ্যে ইহাও ঘটে নাই, এক বালতি জলেই তাহাদিগকে শৌচক্রিয়া, বাসন-মাজা ও স্নান সম্পন্ন করিতে হইত।'

কিন্তু ধুতি তো একখানা, স্নানের পর সে ভেজা ধুতি শুকোবেন কী করে? ভগবানের দয়া, গোয়ালা ঘরের বৃদ্ধ কয়েদী এগিয়ে এল। কোত্থেকে কে জানে একটি দেড় হাত চওড়া এণ্ডির কাপড় যোগাড় করে এনে অরবিন্দকে দিল। সেই এণ্ডির টুকরোটা পরে অরবিন্দ বসে থাকেন, অপেক্ষা করেন যতক্ষণ না তাঁর ধুতি শুকোয়—তাঁর একমাত্র ধুতি।

তারপরে মধ্যাহ্নভোজন। ঘরের মধ্যে পায়খানার চুপড়ি, তার সান্নিধ্য পরিহার করে অরবিন্দ উঠোনে রোদে বসেই খান—কে জানে কেন, সান্ত্রী বাধা দেয় না। কিন্তু ভোজ্য বস্তু কী? ভাত ডাল তরকারি। মোটা ভাত, তাতে খোলা, কাঁকর, পোকা, চুল—নানান ময়লার মশলা, ডাল বলতে খানিকটা বিবর্ণ জল আর তরকারি মানে একটা ঘাস-পাতার জঞ্জাল।

অরবিন্দ লিখছেন: 'মানুষের আহার যে এত স্বাদহীন নিঃসার হইতে পারে

তাহা আমি আগে জানিতাম না। এই শাকের বিমর্ষ গাঢ় কৃষ্ণমূর্তি দেখিয়াই ভয় পাইলাম, দুই গ্রাস খাইয়া তাহাকে ভক্তিপূর্ণ নমস্কার করিয়া বর্জন করিলাম। সকল কয়েদীর ভাগ্যে একই তরকারি জোটে, এবং একবার কোন প্রকার তরকারি আরম্ভ হইলে তাহা অনন্তকাল চলিতে থাকে। এই সময় শাকের রাজত্ব ছিল। দিন যায়, পক্ষ যায়, মাস যায়, কিন্তু দুবেলা শাকের তরকারি, ঐ ডাল, ঐ ভাত। জিনিসটা বদলানো দূরের কথা, চেহারারও লেশমাত্র পরিবর্তন হয় নাই, তাহার ঐ নিত্য সনাতন অনাদ্যনন্ত অপরিণামাতীত অদ্বিতীয় রূপ।'

কিন্তু কেন কে জানে অরবিন্দের উপর ভাগ্য কিছুটা প্রসন্ন। জেলের ডাক্তারবাবু তাঁর জন্যে হাসপাতাল থেকে দুধের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। রেহাই দিয়েছেন শাক দিয়ে খিদে ঢাকার যন্ত্রণা থেকে।

রাতের খাওয়া বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। তারপরেই ফটক বন্ধ। জেলের শেষ ঘণ্টা পড়ে সন্ধে সাতটায়, ওয়ার্ডাররা যে যার পাহারায় গিয়ে সামিল হয়। নানা বাধা-বিঘ্ন দমন ক'রে, অগ্রাহ্য ক'রে শ্রান্ত কারাবাসী যে সুখনিদ্রার শরণ নেবে তারও সাধ্য নেই। তার আরেক বিপত্তি ওয়ার্ডার। পাহারা বদলের সময় ওয়ার্ডার হাঁকডাক করে ঘুমন্ত কয়েদীকে জাগিয়ে দেয়, কয়েদীর সাড়া না পাওয়া পর্যন্ত নড়ে না। এই নিয়ম, এই ব্রিটিশের জেল-কোড।

'বাবু, ভালো আছেন?' মধ্যরাতে ওয়ার্ডার হঠাৎ অরবিন্দকে সচকিত করে দেয়।

এ কী পরিহাস! অরবিন্দ বোঝেন সরল-অর্থে নিয়ম পালনের জন্যেই ওয়ার্ডার এই রূঢ়তা দেখাচ্ছে, তাই বিরক্ত হলেও প্রথম কদিন তিনি নীরবে সহ্য করলেন। কিন্তু তাঁর নিদ্রা বা ধ্যান—তাঁর প্রশান্তিকে তো অক্ষুন্ন রাখতে হবে। তাই তিনি একদিন ওয়ার্ডারকে ধমক দিলেন: এ কী দুর্ব্যবহার! দেখতে পাচ্ছ না ঘরে বন্ধ আছি, জ্যান্ত আছি—তবে?

দু-চার বার ধমক দিতেই ফল ফলল। রাতে কুশল জিজ্ঞাসার প্রথা উঠে গেল জেল থেকে।

সমস্ত জেলে প্রায় তিন হাজার কয়েদী। রাতের অন্ধকারে আচ্ছন্ন নিঃশব্দ জেলখানা।

এখানে কে কী করে? কেউ ঘুমোয়। কেউ কাঁদে। কেউ প্রার্থনা ও ধ্যান করে।

লিখছেন অরবিন্দ: 'শ্রান্ত কয়েদী নিদ্রার শরণ লইয়া জেলের সেই একমাত্র

:খ অনুভব করে। এই সময় দুর্বলচেতা নিজের দুর্ভাগ্য বা ভবিষ্যৎ জেলদুঃখ
াবিয়া কাঁদে। ভগবদ্ভক্ত নীরব রাত্রিতে ঈশ্বরসান্নিধ্য অনুভব করিয়া প্রার্থনায়
া ধ্যানে আনন্দ ভোগ করেন। রাত্রিতে এই দুর্ভাগ্য পতিত সমাজ-পীড়িত তিন
াহস্র ঈশ্বরসৃষ্ট প্রাণীর সেই আলিপুর জেলস্বরূপ প্রকাণ্ড যন্ত্রণাগৃহ বিশাল নীরবতায়
মগ্ন হয়।'

প্রথম চার-পাঁচদিন এক বস্ত্রেই থাকতে হল অরবিন্দকে। বাড়ি থেকে যেমন এসেছিলেন সেই অবস্থায়। কিন্তু কেন কে জানে তাঁর উপর জেলের সুপারইনটেণ্ডেণ্ট এমার্সনের নজর পড়ল। দয়া জাগল হৃদয়ে। অরবিন্দকে 'জজ্ঞেস করলেন, কী অসুবিধে হচ্ছে? কী চাই বলুন?

অরবিন্দ বললেন, খান দুই বই। আর ধুতি-জামা।

তথাস্তু। দয়াবান এমার্সন প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন।

জেলের কর্মচারীরা অরবিন্দকে কালি কলম আর জেলের ছাপানো চিঠির কাগজ এনে দিল। তিনি তাঁর মেসোমশাই, সঞ্জীবনী-সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রকে চিঠি লিখলেন: দয়া করে দুখানা বই পাঠাবেন—গীতা আর উপনিষদ। আর ধুতি-জামা।

দু-চারদিনের মধ্যেই প্রার্থিত বস্তু এসে পৌঁছুল অরবিন্দের হাতে।

অরবিন্দ প্রত্যক্ষ করলেন স্বয়ং ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণই তাঁর হাতে গীতা তুলে দিলেন। আর ভগবৎশক্তি তাঁর মধ্যে প্রবেশ করল।

উত্তরপাড়া অভিভাষণে অরবিন্দ বলছেন: 'তারপর তিনি আমার হাতে গীতা দিলেন। তাঁর শক্তি আমার মধ্যে প্রবেশ করল এবং আমি গীতার সাধনা অনুসরণ করতে সক্ষম হলাম। আমাকে শুধু বুদ্ধি দিয়েই বুঝতে হয়নি, পরন্তু অনুভূতি উপলব্ধির ভিতর দিয়ে জানতে হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কাছ থেকে কি চেয়েছিলেন, যারা তাঁর কাজ করবার আকাঙ্ক্ষা করে তাদের কাছ থেকে তিনি কি চান—রাগ দ্বেষ থেকে মুক্ত হতে হবে, ফলাকাঙ্ক্ষা না রেখে তাঁর জন্যে কর্ম করতে হবে, নিজের ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে হবে, ভগবানের হাতে নির্বিরোধ ও বিশ্বস্ত যন্ত্র হতে হবে, উচ্চ নীচ শত্রু মিত্র জয় পরাজয় সবের প্রতি সমভাবাপন্ন হতে হবে অথচ তাঁর কাজে শৈথিল্য করা চলবে না।'

উপনিষৎ গাভী, গীতামৃতই দুগ্ধ। দোহনকর্তা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। বৎস অর্জুন আর পিপাসিত সুধীজনই ভোক্তা।

বিবেকানন্দ বলছেন, 'উপনিষৎ থেকে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কুসুম চয়ন করে

গীতামাল্য গ্রথিত হয়েছে।'

মহাভারতে সকল বেদের সারার্থ সংগৃহীত। সমগ্র মহাভারতের সারাং গীতায় বর্তমান। সেই জন্যে গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী। সর্বশাস্ত্রসুন্দরী।

উপনিষৎ বলছে, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। আর গীতা বলছে, বাসুদেবঃ সর্বমিতি

শ্রীঅরবিন্দকে ভক্ত জিজ্ঞেস করছে, 'আমরা শুনেছি শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে সাহায্য করেছেন, পথ দেখিয়েছেন। কিন্তু কোন কৃষ্ণ, বৃন্দাবনের কৃষ্ণ, ন কুরুক্ষেত্রের ?

শ্রীঅরবিন্দ বললেন, 'আমার তো মনে হয় কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ। আলিপুর জেলে আমার কৃষ্ণ-কালীর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সে কী তেজোদৃপ্ত দর্শন।

কিন্তু নির্জন কারাবাসের কৃচ্ছ্র এড়াবেন কেমন করে ?

নির্জন কারাবাসের যেমন ক্রুরতা আছে তেমনি আছে আবার মহত্ত্ব। যেম তা কাউকে উন্মাদ করে দেয় তেমনি আবার কাউকে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হতে প্রেরিত করে। যেমন কেউ মানুষের নিষ্ঠুরতা দেখে অস্থির হয়ে ওঠে তেমনি আবার কেউ ভগবানের দয়া দেখে প্রশান্ত হয়ে যায়।

অরবিন্দ ভগবানের দয়া দেখলেন—অসীম দয়া। নির্জন কারাবার ভগ বানেরই স্বহস্তের রচনা, এইখানে এই অবস্থায় তাঁর সঙ্গে যুক্ত হবার কী যে দুর্ল সুবিধে তা বুঝতে পেলেন অরবিন্দ। মনে হয় ঘরের দেয়াল যেন ব্রহ্মময় হ তাঁকে আলিঙ্গন করতে এগিয়ে আসছে। ভগবান যেন ইচ্ছে করেই উঠোনে দরজাটা খুলে রেখেছেন যাতে গরাদের ধারে বসে অরবিন্দ দেয়ালের গায়ে গাছটিকে দেখতে পান, তার স্নিগ্ধ শ্যামলিমায় জুড়োতে পারেন প্রাণমন। যাতে ছয় ডিগ্রির ছয়টি ঘরের সমুখ দিয়ে সান্ত্রী যে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে শুনতে পা তার পদশব্দ। যাতে অনুভব করতে পারেন এ যেন তাঁরই কোনো পরিচিত বন্ধু ঘোরাফেরা। পাশের গোয়ালঘরের কয়েদীরা গরু চরাতে নিয়ে যায়, দরজা খোলা আছে বলেই তো তিনি দেখেন গোপাল ও গাভীকুল।

'আলিপুরের নির্জন কারাবাসে অপূর্ব প্রেমশিক্ষা পাইলাম।' লিখছে অরবিন্দ : 'এইখানে আসিবার আগে মানুষের মধ্যেও আমার ব্যক্তিগত ভালবাসা অতিশয় ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল এবং পশু-পক্ষীর উপর রুদ্ধ প্রেমস্রোত প্র বহিত না। মনে আছে রবিবাবুর একটি কবিতায় মহিষের উপর গ্রাম্য বালকে গভীর ভালবাসা বড় সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে, সেই কবিতা প্রথম পড়িয়া কিছুতে তাহা আমার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, ভাবের বর্ণনায় অতিশয়োক্তি ও অস্বাভাবিক

দোষ দেখিয়াছিলাম। এখন পড়িলে তাহা অন্য চক্ষে দেখিতাম। আলিপুরে আসিয়া বুঝিতে পারিলাম, সর্বপ্রকার জীবের উপর মানুষের প্রাণে কি গভীর ভালোবাসা স্থান পাইতে পারে, গরু পাখী পিপীলিকা পর্যন্ত দেখিয়া কি তীব্র আনন্দস্ফুরণে মানুষের প্রাণ অস্থির হইতে পারে!'

কিন্তু সহস্র-পথ-ধাবিত চঞ্চল মনকে ধ্যানে নিবিষ্ট ও তন্ময় রাখা কি সহজ কাজ? কারাবাসের আগে অরবিন্দের ধ্যানের অভ্যাস ছিল সকালে এক ঘণ্টা ও সন্ধ্যায় এক ঘণ্টা। এখন নির্জন কারাকক্ষে ধ্যানের সময় বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু একভাবে একাসনে দেড় ঘণ্টা দু ঘণ্টার বেশি থাকতে পারেন না, মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, দেহ এলিয়ে পড়ে। ভগবান এ কী খেলা খেলছেন তা কে জানে কে বোঝে! অস্পষ্ট চিন্তাগুলি মনের কাছাকাছি ঘোরে, ঢুকতে পায় না, যদি দুয়েকটা বা ঢোকে নীরবতায় ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। কোথাও যেন স্থৈর্য নেই শান্তি নেই, একটা মানসিক অনিশ্চয়তায় আক্রান্ত হয়ে কষ্ট পেতে লাগলেন। তাকান বাইরে যেখানে সেই শ্যামল তরু, খণ্ডিত আকাশের নীল চিলতেটুকু চোখে পড়ে, কিন্তু হাত বাড়িয়ে মন কোনো আশ্রয় পায় না। ঘরের মধ্যে চোখ এনে দেয়ালের দিকে তাকান, দেয়ালগুলি যেন ভয়াবহরূপে সাদা, প্রাণহীন। মন নিরুপায় যন্ত্রণায় ছটফট করে। ধ্যান যেন দাহ, স্তব্ধতা যেন অবসাদ।

হঠাৎ অরবিন্দের নজরে পড়ে কতগুলি পিঁপড়ে মেঝের উপর হেঁটে চলেছে। অরবিন্দ তাদের গতিবিধি চেষ্টাচরিত্র নিরীক্ষণ করতে বসেন। তারপর দেখেন আরো একদল পিঁপড়ে বেরিয়েছে মিছিল নিয়ে। আগের দল কালো, পরের দল লাল। লালেতে কালোতে ঝগড়া, কালো লালকে দংশন করে বধ করছে। অত্যাচারিত লাল পিঁপড়ের উপর অরবিন্দের মমতা জাগে, তিনি কালোগুলোকে তাড়িয়ে লালগুলিকে বাঁচাতে থাকেন। এ এক মন্দ কাজ নয়, পিপীলিকার মমতায় দিব্যি সময় কাটে, শুধু এক-আধদিন নয়, দিব্যি কয়েকদিন।

কিন্তু মনের হাহাকার ঘোচে কই? নিজের অবস্থায় নিজেই আশ্চর্য হন অরবিন্দ। মনে হয় স্বপ্নে এক শত্রু যেন তাঁর গলা টিপে ধরেছে অথচ তাঁর হাত-পা নাড়বার ক্ষমতা নেই। নিষ্পেষণে চূর্ণ হয়ে যাচ্ছেন।

'সত্য বটে আমি কখনো অকর্মণ্য বা নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে ভালোবাসি নাই,' লিখছেন অরবিন্দ: 'তবে কতবার একাকী থাকিয়া চিন্তায় কালযাপন করিয়াছি, এক্ষণে এতই কি মনের দুর্বলতা হইয়াছে যে অল্পদিনের নির্জনতায় এত আকুল হইয়া পড়িতেছি? ভাবিতে লাগিলাম হয়তো সেই স্বেচ্ছাপ্রাপ্ত

নির্জনতা ও এই পরেচ্ছাপ্রাপ্ত নির্জনতায় অনেক প্রভেদ আছে। বাড়িতে বসিয় একাকী থাকা এক কথা, আর পরের ইচ্ছায় কারাগৃহে এই নির্জনবাস স্বতন্ত্র কথা যেখানে যখন ইচ্ছা হয় মানুষের আশ্রয় লইতে পারি, পুস্তকগত জ্ঞান ও ভাষা- লালিত্যে, বন্ধু-বান্ধবের প্রিয়সম্ভাষণে, রাস্তার কোলাহলে জগতের বিবিধ দৃশ্যে মনের তৃপ্তি সাধন করিয়া প্রাণকে শীতল করিতে পারি। কিন্তু এখানে কঠিন নিয়মে আবদ্ধ হইয়া পরের ইচ্ছায় সর্বসংস্রব রহিত হইয়া থাকিতে হইবে। কথা আছে, যে নির্জনতা সহ্য করিতে পারে সে হয় দেবতা নয় পশু, এই সংযম মানুষের সাধ্যাতীত। সেই কথায় আমি আগে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতাম না, তখন বুঝিলাম সত্যসত্যই যোগাভ্যস্ত সাধকেরও এই সংযম সহজসাধ্য নয়।'

এখন কী করা!

মনের নিশ্চেষ্টতায় পীড়িত হয়ে কয়েকদিন ঘোর কষ্টে কাটালেন অরবিন্দ ভয় হল উন্মাদ হয়ে যাবেন বোধ হয়। প্রাণপণে ভগবানকে ডাকতে লাগলেন আমার বুদ্ধিভ্রংশ নিবারণ করো, আমাকে পথ দেখাও।

অন্তরপুরুষ ধীরে-ধীরে উচ্চারিত হলেন।

ভগবান তোমার সঙ্গে খেলা করছেন, ক্রীড়াচ্ছলে শিক্ষা দিচ্ছেন তোমাকে তিনটি শিক্ষা। প্রথম, নির্জন কারাবাসের ক্রূরতা, ব্যর্থতা ও সংশোধনের প্রয়ো জনীয়তা বোঝানো। এটা অবশ্য এখুনি কার্যকর হবে না, তবে ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হবে স্বাধিকার পাবে তখন তার সংবিধানে বিদেশী সভ্যতার এই নারকীয় পরিচ্ছেদ যেন গৃহীত না হয় তারই জন্যে সচেষ্ট থাকা। দ্বিতীয়, তোমার দুর্বল- তাকে শাসন করা—যে যোগাবস্থার প্রার্থী তার পক্ষে জনতা ও নির্জনতা সমান হওয়া বিধেয়। আর তৃতীয়, যোগাভ্যাস তোমার নিজের চেষ্টায় হবে না, শ্রদ্ধা ও সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণই সিদ্ধিলাভের পথ। প্রসন্ন হয়ে ভগবান তোমাকে যে শক্তি সিদ্ধি বা আনন্দ দেবেন তা দিয়ে তাঁরই কাজ সম্পন্ন করা তোমার যোগলিপ্সা উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

আর দ্বিধা নয়, কুণ্ঠা নয়, কষ্ট-ক্লেশ নয়, নব বলে বলীয়ান হলেন অরবিন্দ অন্তরাত্মার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন কারাসংস্কারের জন্যে তিনি প্রচারে প্রবৃত্ত হবেন। আর দুর্বলতা? কয়েক দিনের মধ্যেই দুর্বলতা তিরোহিত হল, মনে হল বিশ বছর একাকী থাকলেও তাঁর মন আর বিচলিত হবে না। আর আত্মসমর্পণ প্রাণঢালা প্রার্থনায় নিজেকে বিলুপ্ত করে দিলেন।

'মঙ্গলময় শ্রীহরির আশ্চর্য অনন্ত মঙ্গলস্বরূপত্ব উপলব্ধি করিতেছি।' লিখছেন

অরবিন্দ: 'এমন ঘটনা নাই,—সেই ঘটনা মহান হোক বা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম হোক—যাহার দ্বারা কোনও মঙ্গল সম্পাদিত হয় না। প্রায়ই তিনি এক কার্য দ্বারা দুই চারি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন। আমরা জগতে অনেকবার অন্ধ শক্তির খেলা দেখি, অপব্যয়ই প্রকৃতির নিয়ম বলিয়া ভগবানের সর্বজ্ঞতাকে অস্বীকার করিয়া ঐশ্বরিক বুদ্ধির দোষ দিই। সে অভিযোগ অমূলক। ঐশী শক্তি কখনও অন্ধ ভাবে কার্য করেন না, তাঁহার শক্তির বিন্দুমাত্র অপব্যয় হইতে পারে না, বরং তিনি এমন সংযত ভাবে অল্প ব্যয়ে বহু ফল উৎপাদন করেন যে তাহা মানুষের কল্পনার অতীত।'

অরবিন্দের সমস্ত অন্তঃকরণ শীতল হয়ে গেল। এমন সুখময় অবস্থা তিনি আগে আর কোনো দিন অনুভব করেননি। শিশু যেমন নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে মা'র কোলে শুয়ে থাকে, অরবিন্দের মনে হল তিনিও তেমনি বিশ্বজননীর কোলে শুয়ে আছেন।

আর তাঁর কারাবাসের কষ্ট থাকল না।

যদি দুঃখ কষ্ট আসেও তারা আনন্দ আর শক্তি পৌঁছে দিয়ে নিজেরা প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে যায়, এতটুকু চিহ্নও রেখে যায় না। অরবিন্দের মনে হল বইয়েরও আর প্রয়োজন নেই। বই ছাড়াও তিনি থাকতে পারেন আনন্দে—সামর্থ্যে—জগতের প্রতি মমত্ববোধের বিশালতায়।

যোগ—প্রার্থনাযোগ। প্রার্থনার অসাধারণ শক্তি ও সাফল্য উপলব্ধি করলেন অরবিন্দ।

॥ উনিশ ॥

কেন কে জানে জেলের ডাক্তার ডেলী সাহেব অরবিন্দকে বললেন, 'তুমি সারা দিন একটা ছোট ঘরে বন্ধ হয়ে আছ এ আমার ভালো লাগে না।'

অরবিন্দ কৌতূহলী হয়ে তাকালেন।

'আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে দিয়ে বলিয়ে বড়সাহেবকে রাজী করিয়েছি তুমি সকালে-বিকেলে তোমার সেলের সামনে বেড়াতে পারবে। একটানা সেলে বন্ধ হয়ে থাকলে তোমার শরীর ভালো থাকবে না। আমি বলে দিয়েছি খোলা জায়গায় তোমার কিছুটা বেড়ানো দরকার।'

ভগবান মঙ্গলময়, সমস্তই তাঁর ইচ্ছায়—অরবিন্দ মেনে নিলেন।

সকালে এক ঘণ্টা বিকেলে দশ-পনেরো মিনিট—সেলের সামনে খোলা জায়গায় অরবিন্দ বেড়াতে লাগলেন। ক্রমে সময়ের গণ্ডি শিথিল হল, সকালে দু ঘণ্টা ও বিকেলে কুড়ি মিনিট পর্যন্ত অবাধ পাইচারি।

অরবিন্দ লিখছেন:

'এই সময় বড় ভাল লাগিত। একদিকে জেলের কারখানা, অপরদিকে গোয়ালঘর—আমার স্বাধীন রাজ্যের এই দুই সীমা ছিল। কারখানা হইতে গোয়ালঘর, গোয়ালঘর হইতে কারখানা, ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে হয় উপনিষদের গভীর ভাবোদ্দীপক অক্ষয় শক্তিদায়ক মন্ত্রসকল আবৃত্তি করিতাম, না হয় কয়েদীদের কার্যকলাপ ও যাতায়াত লক্ষ্য করিয়া সর্বঘটে নারায়ণ এই মূল সত্য উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতাম। বৃক্ষে, গৃহে, প্রাচীরে, মনুষ্যে, পশুতে, পক্ষীতে, ধাতুতে, মৃত্তিকায় সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম মনে মনে এই মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্বক সর্বভূতে সেই উপলব্ধি আরোপ করিতাম। এইরূপ করিতে করিতে এমন ভাব হইয়া যাইত যে, কারাগার আর কারাগারই বোধ হইত না। সেই উচ্চ প্রাচীর, সেই লোহার গরাদ, সেই সাদা দেওয়াল, সেই সূর্যরশ্মিদীপ্ত নীলপত্রশোভিত বৃক্ষ, সেই সামান্য জিনিসপত্র যেন আর অচেতন নহে, যেন সর্বব্যাপী চৈতন্যপূর্ণ হইয়া সজীব হইয়াছে, তাহারা আমাকে ভালবাসে, আমাকে আলিঙ্গন করিতে চায় এইরূপ বোধ হইত। মনুষ্য, গাভী, পিপীলিকা, বিহঙ্গ চলিতেছে, উড়িতেছে, গাহিতেছে, কথা বলিতেছে, অথচ সবই প্রকৃতির ক্রীড়া; ভিতরে এক মহান নির্মল নির্লিপ্ত আত্মা শান্তিময় আনন্দে নিমগ্ন হইযা রহিয়াছেন। এক একবার এমন বোধ হইত যেন ভগবান সেই বৃক্ষতলে আনন্দের বংশী বাজাইতে দাঁড়াইয়াছেন এবং সেই মাধুর্যে আমার হৃদয় টানিয়া বাহির করিতেছেন। সর্বদা বোধ হইতে লাগিল, যেন কে আমাকে আলিঙ্গন করিতেছে, কে আমাকে কোলে করিয়া রহিয়াছে। এই ভাব বিকাশে আমার সমস্ত মনপ্রাণ অধিকার করিয়া কি এক নির্মল মহতী শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল তাহার বর্ণনা করা যায় না। প্রাণের কঠিন আবরণ খুলিয়া গেল এবং সর্বজীবের উপর প্রেমের স্রোত বহিতে থাকিল। প্রেমের সহিত দয়া, করুণা, অহিংসা ইত্যাদি সাত্ত্বিক ভাব আমার রজঃপ্রধান স্বভাবকে অভিভূত করিয়া বিশেষ বিকাশলাভ করিতে লাগিল। আর যতই বিকাশ পাইতে লাগিল, ততই আনন্দ বৃদ্ধি হইল এবং নির্মল শান্তিভাব গভীর হইল। মোকদ্দমার দুশ্চিন্তা প্রথম হইতে দূর হইয়া গিয়াছিল, এখন বিপরীত ভাব মনে স্থান পাইল। ভগবান মঙ্গলময়, আমার মঙ্গলের জন্যই আমাকে কারা-

গৃহে আনিয়াছেন, নিশ্চয় কারামুক্তি ও অভিযোগ খণ্ডন হইবে, এই দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া গেল।'

কারামুক্তির পর উত্তরপাড়া অভিভাষণে অরবিন্দ বলছেন :

'ভগবান আমার রক্ষীদের হৃদয় আমার দিকে ফিরিয়ে দিলেন, তারা জেলের কর্তা ইংরেজ অফিসারকে বললে, উনি বন্দী অবস্থায় বড় কষ্ট পাচ্ছেন, অন্ততঃ তাঁকে সকাল-সন্ধ্যায় আধ ঘণ্টা করে তাঁর সেলের বাইরে বেড়াতে দেওয়া হোক। সেই ব্যবস্থাই হল এবং যখন আমি বেড়াতাম সেই সময় তাঁর শক্তি পুনরায় আমার মধ্যে প্রবেশ করল। যে-জেল আমাকে মানব-জগৎ থেকে আড়াল করে রেখেছে সেই দিকে আমি তাকালাম, কিন্তু দেখলাম আমি আর জেলের উচ্চ দেওয়ালের মধ্যে বন্দী নই, আমাকে ঘিরে রয়েছেন বাসুদেব। আমার সেলের সম্মুখবর্তী বৃক্ষের ছায়ার তলে আমি বেড়াতাম, কিন্তু আমি যা দেখলাম তা বৃক্ষ নয়, জানলাম তা বাসুদেব, দেখলাম শ্রীকৃষ্ণ সেখানে দণ্ডায়মান রয়েছেন এবং আমার উপর তাঁর ছায়া ধরে রয়েছেন। আমার সেলের দরজার গরাদের দিকে তাকালাম আবার বাসুদেবকে দেখতে পেলাম। নারায়ণ দাঁড়িয়ে থেকে আমার উপর পাহারা দিচ্ছিলেন। আমার পালঙ্ক স্বরূপ যে মোটা কম্বল আমাকে দেওয়া হয়েছিল তার উপর শুয়ে আমি উপলব্ধি করলাম শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বাহু দিয়ে জড়িয়ে রয়েছেন, সে বাহু আমার বন্ধুর, আমার প্রেমাস্পদের। তিনি আমার যে গভীরতর দৃষ্টি খুলে দিয়েছিলেন, এইটিই হয়েছিল তার প্রথম ফল। জেলের কয়েদীদের দিকে আমি তাকালাম—চোর, খুনী, জুয়াচোর এদের দিকে যেমন চাইলাম আমি বাসুদেবকেই দেখতে পেলাম, সেই সব তমসাচ্ছন্ন আত্মা ও অপব্যবহৃত দেহের মধ্যে আমি নারায়ণকেই দেখতে পেলাম। এই সব চোর ও ডাকাতদের মধ্যে অনেকেই এমন ছিল যারা তাদের সহানুভূতি, তাদের স্নেহের দ্বারা আমাকে লজ্জায় ফেলেছিল, এই সব প্রতিকূল অবস্থার উপর তাদের মানবতা জয়ী হয়েছিল। বিশেষ করে তাদের মধ্যে একজনকে দেখলাম, আমার মনে হল সে একজন সাধুপুরুষ, সে আমাদের দেশের একজন অক্ষরজ্ঞানবিহীন চাষা, ডাকাতির অভিযোগে তার দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল, আমাদের মিথ্যা শ্রেণীর গর্বে যাদের আমরা 'ছোটলোক' বলে কৃপা করি সে তাদেরই একজন। পুনরায় ভগবান আমাকে বললেন, দেখ কি সব লোকের মাঝে আমি তোমাকে পাঠিয়েছি, আমার একটু কাজ করবার জন্যে। যে-জাতকে আমি তুলতে চাই এই হচ্ছে তার স্বরূপ এবং এই কারণেই আমি তাদের তুলতে চাই।'

ম্যাজিস্ট্রেট বার্লির কোর্টে মামলা শুরু হল ১৯০৮ সালের ১৮ই মে। অরবিন্দের গ্রেপ্তার হবার পনেরো দিন পর।

বেলা একটার সময় কয়েদী-গাড়িতে করে প্রথম দফায় ছাব্বিশজন আসামীকে হাজির করানো হল। সঙ্গে য়ুরোপীয়ান সার্জেন্টের ছোটখাটো একটি পল্টন, সকলের কাছেই গুলিভরা পিস্তল, এমন কি সরকারী কৌঁসুলী নর্টন সাহেবের ব্রিফ কেসের মধ্যেও একটি সাত-ঘরী রিভলভার। এই সব বোমারু তরুণের দল কখন কী দুষ্কাণ্ড করে বসে ঠিক কী! তাই চারদিকে এত পুলিসের সমারোহ, এই রণসজ্জা।

'এই সাজসজ্জা দেখিয়া' অরবিন্দ লিখছেন: 'কোন কোন অনভিজ্ঞ দর্শক নিশ্চয় ভাবিয়াছিলেন যে, এই হাস্যপ্রিয় অল্পবয়স্ক বালকগণ না জানি কি দুঃসাহসিক বিখ্যাত মহাযোদ্ধার দল। না জানি তাহাদের প্রাণে ও শরীরে কত সাহস ও বল যে খালিহাতে শত পুলিস ও গোরার দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করিয়া পলায়ন করিতেও সক্ষম।'

আর তারই জন্যে বোধ হয় আসামীদের সসম্ভ্রমে নিয়ে গেল আদালতে।

এই ছাব্বিশজনের মধ্যে একজন অরবিন্দ। সন্দেহ কী, তিনিই মূল গায়েন। তিনিই অধ্যক্ষ পুরুষ।

সকলের হাতে হাতকড়া, হাতকড়ার ভিতর দিয়ে আবার শেকল বাঁধা।

অন্যতম আসামী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন:

'কোর্টে আসিবার ও যাইবার সময় আমাদের হাতকড়ার ভিতর দিয়ে শিকল বাঁধা থাকিত। দুপুরবেলা শৌচ-প্রস্রাব ত্যাগ করিতে গেলে সেই হাতকড়া পরানো অবস্থায় পুলিস আমাদের রাস্তা দিয়া টানিয়া লইয়া যাইত। আমাদের জন্য ততটা ভাবনা ছিল না, কেননা 'ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়।' যাহার মান নাই তাহার আবার মানহানি কি? কিন্তু অরবিন্দবাবুকে হাতকড়া পরাইয়া টানিয়া লইয়া যাইতে দেখিলে মনটার ভিতর একটা বিদ্রোহ জমাট হইয়া উঠিত। তিনি কিন্তু নিতান্ত নির্বিরোধ ভদ্রলোকের মত সমস্তই নীরব হইয়া সহ্য করিতেন।'

খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়ে দেবার সময় আসামীদের হাতকড়া খুলে নেওয়া হল। কিন্তু থাকতে হল দাঁড়িয়ে। ঠায় প্রায় পাঁচটা পর্যন্ত।

দুই সারিতে দাঁড়াল বন্দীরা। প্রথম সারির এক নম্বর বারীন, দ্বিতীয় সারির এক নম্বর অরবিন্দ। দুই ভায়েরই পরনে ধুতি, গায়ে টুইল শার্ট।

উল্লাসকরের পরনে গেরুয়া, গায়েও গেরুয়া চাদর। একজন লালরঙের তসরের ধুতি পরে এসেছে। আরেকজনের আবার গায়ে কোনো জামা নেই, ধুতির আধখানা দিয়েই বুক ঢাকা।

পনেরো-ষোল দিন পর সব আসামী এক গাড়িতে এক খাঁচায় একত্র হয়েছে —যেন আনন্দের হাট বসে গেল। সে কী কথার স্রোত, খুশির গুলতানি! সমস্ত উল্লাসের সর্দার উল্লাসকর। সে নিজে যেমন হাসে তেমনি অন্যকে হাসায়। হাসি থামলেও কোলাহল থামে না। বিচার-কক্ষে কী হচ্ছে না হচ্ছে তার কে বিচার করে!

প্রায় সবাই পরস্পর বাক্যালাপে মত্ত, কিন্তু দু ভাই, অরবিন্দ ও বারীন্দ্র, নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন, কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও কেউ কারো সঙ্গে কথা কইছেন না। শেষে এক সময় বারীন দেখল অরবিন্দ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই ঘুমুচ্ছেন। সন্ত্রস্ত হয়ে সেজদাকে জাগিয়ে দিল বারীন। কাঠগড়ার আসামী ঘুমুচ্ছে, আদালতের অবমাননা হবে না তো! অরবিন্দ মৃদু হাসলেন। দু ভায়ে সামান্য কথা হল।

কাঁহাতক দাঁড়িয়ে থাকা যায়। আদালতের অবমাননা হয় তো হোক, কেউ-কেউ সোজাসুজি বসে পড়ল মেঝের উপর।

অরবিন্দকে পরে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: বালির কোর্টে বিচারের সময় দিনের পর দিন প্রত্যহ আপনাদের দাঁড়িয়ে থাকতে হত?'

'হ্যাঁ, প্রথম-প্রথম তাই। ঠায় থাকতে হত দাঁড়িয়ে।' বললেন অরবিন্দ, কিন্তু মামলা তো দারুণ লম্বা হল, তাই বেশি দিন এই শারীরিক ক্লেশ বরদাস্ত করা গেল না। যখন-তখন আমরা বসে পড়তে লাগলাম। বালি কিছু বলত না বটে কিন্তু কাউকে কথা বলতে শুনলে তক্ষুনি ফের দাঁড় করিয়ে দিত।'

'বসে-বসে করতেন কী?'

'কেউ-কেউ বই পড়ত। বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, কেউ-কেউ বা গীতা উপনিষৎ। কিন্তু কয়েকদিন পরেই বালি বই পড়া বন্ধ করে দিল।'

'নির্জন কারাবাসের নীরবতা হইতে হঠাৎ বহির্জগতের কোলাহলের মধ্যে আনীত হইয়া প্রথম মন বড় বিচলিত হইল, সাধনার ধৈর্যভঙ্গ হইল এবং সেই পাঁচ ঘণ্টা কাল মোকদ্দমার নীরস ও বিরক্তিকর কথা শুনিতে মন কিছুতেই সম্মত হইল না। প্রথম আদালতে বসিয়া সাধন করিতে চেষ্টা করিতাম, কিন্তু অনভ্যস্ত মন প্রত্যেক শব্দ ও দৃশ্যের দিকে আকৃষ্ট হইত, গোলের মধ্যে সেই চেষ্টা ব্যর্থ

হইত, পরে ভাবের পরিবর্তন হয় এবং সমীপবর্তী শব্দ দৃশ্য মনের বহির্ভূত করিয়া সমস্ত চিন্তাশক্তি অন্তর্মুখী কবিরার শক্তি জন্মাইয়াছিল, কিন্তু মোকদ্দমার প্রথম অবস্থায় তাহা ঘটে নাই, তখন ধ্যানধারণার প্রকৃত ক্ষমতা ছিল না। সেই কারণে এই বৃথা চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া মধ্যে মধ্যে সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতাম, অবশিষ্ট সময় বিপদকালের সঙ্গীদের কথা ও তাহাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিতাম, অন্য চিন্তা করিতাম, অথবা কখনও নর্টন সাহেবের শ্রবণযোগ্য কথা বা সাক্ষীর সাক্ষ্যও শুনিতাম। দেখিতাম নির্জন কারাগৃহে যেমন সময় কাটানো সহজ ও সুখকর হইয়া উঠিয়াছে, জনতার মধ্যে এবং সেই গুরুতর মোকদ্দমার জীবনমরণের খেলার মধ্যে সময় কাটানো তেমন সহজ নয়।'

সরকার পক্ষের কৌঁসুলী ইয়ার্ডলি নর্টন, আগে মাদ্রাজে প্রাকটিস করত বলে তাকে সবাই বলে 'মাদ্রাজী সাহেব'।

নর্টন সম্বন্ধে লিখছেন অরবিন্দ :

'কৌন্সিলী নর্টন মাদ্রাজী সাহেব, সেই জন্য বোধ হয় বঙ্গদেশীয় ব্যারিস্টার-মণ্ডলীর প্রচলিত নীতি ও ভদ্রতায় অনভ্যস্ত ও অনভিজ্ঞ। তিনি একসময় জাতীয় মহাসভার একজন নেতা ছিলেন, সেই জন্য বোধ হয় বিরুদ্ধাচরণ বা প্রতিবাদ সহ্য করিতে অক্ষম এবং বিরুদ্ধচারীকে শাসন করিতে অভ্যস্ত। এইরূপ প্রকৃতিকে লোকে হিংস্রস্বভাব বলে। নর্টন সাহেব কখনও মাদ্রাজ কর্পোরেশনের সিংহ ছিলেন কিনা বলতে পারি না, তবে আলিপুর কোর্টের সিংহ ছিলেন বটে। তাঁহার আইন অভিজ্ঞতার গভীরতায় মুগ্ধ হওয়া কঠিন—সে যেন গ্রীষ্মকালের শীত। কিন্তু বক্তৃতার অনর্গল স্রোতে, কথার পারিপাট্যে, কথার চোটে লঘু সাক্ষ্যকে গুরু করার অদ্ভুত ক্ষমতায়, অমূলক বা অল্পমূলক উক্তির দুঃসাহসিকতায়, সাক্ষী ও জুনিয়র ব্যারিস্টারের উপর তম্বীতে এবং সাদাকে কালো করিবার মনোমোহিনী শক্তিতে নর্টন সাহেবের অতুলনীয় প্রতিভা দেখিলেই মুগ্ধ হইতে হইত।'

নর্টনের দৈনিক ফি এক হাজার টাকা। তার সহকারী ব্যারিস্টার বার্টন—তাকে আবার উপদেশ দিচ্ছে আপ্‌টন। দুয়ে মিলে এদের না কোন আরেক হাজার।

দুর্ধর্ষ মামলা। সরকার পক্ষের খরচও তাই দুর্ধর্ষ।

অরবিন্দের পক্ষে টিমটিমে এক উকিল, নীলকান্ত চক্রবর্তী।

সরোজিনী অরবিন্দের মামলার খরচের জন্যে জনসাধারণের কাছে অর্থ-সাহায্যের আবেদন করেছে :

আমার দেশবাসীরা জানেন আমার দাদা অরবিন্দ ঘোষ ঘোরতর অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি আর আমার ধারণার যুক্তি-যুক্ত কারণ আছে যে আমার দেশের লোকের বিরাটতম অংশই বিশ্বাস করেন যে তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ। আমি মনে করি যদি কোনো দক্ষ কৌসুলী তাঁর পক্ষে এসে দাঁড়ান, তিনি নিশ্চিত মুক্তি পাবেন। কিন্তু দেশমাতার সেবায় তিনি দারিদ্র্যব্রত অবলম্বন করেছেন বলে কোনো প্রখ্যাত ব্যারিস্টার নিযুক্ত করবার মত তাঁর অর্থসামর্থ্য নেই। তাই আমি তাঁর হয়ে আমার দেশবাসীর সদাশয়তা ও বদান্যতার কাছে সকাতর আবেদন করতে বাধ্য হচ্ছি। আমি জানি সমগ্র দেশবাসীই তাঁর রাজনৈতিক মতবাদে সম্মত নন। কিন্তু এ কথা বলতে আমি ঈষৎ কুণ্ঠানুভব করছি যে সম্ভবত কম ভারতীয়ই আছেন যিনি তাঁর বিরাট কীর্তি, তাঁর আত্মত্যাগ, দেশের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ ভালোবাসা, সর্বোপরি তাঁর উর্ধ্বস্পর্শী আধ্যাত্মিকতার প্রশংসা করবেন না। এই চেতনায় সাহসী হয়ে, আমি নারী, ভারতবর্ষের প্রতিটি ছেলে ও মেয়ের কাছে, আমার ভাইকে, তাদেরও ভাইকে, রক্ষা করবার জন্যে সাহায্য প্রার্থনায় উপনীত হয়েছি।

দান আমাকে কলকাতা ৬নং কলেজ স্কোয়ারে কিংবা আমার সলিসিটর মেসার্স মামাল অ্যাণ্ড আগরওয়ালা ৩নং হেস্টিংস স্ট্রীটে পাঠাবেন।

শুনানীর প্রথম দিনের বিকেলের দিকে আসামী পক্ষের এক উকিল ম্যাজি-স্ট্রেটের কাছে একটি প্রার্থনা জানাল। সামান্য প্রার্থনা। আসামীদের কিছু ফল খেতে দেওয়া হোক।

'ফল ? ফল দেবে কে ?' বার্লি হুঙ্কার করে উঠল।

'আসামীর আত্মীয়স্বজনেরা দেবে। দেবে উকিলের হাত দিয়ে।'

'কে সে-সব ফল পরীক্ষা করে দেখবে ?' বার্লি আবার গর্জাল।

উকিলও নাছোড়। বললে, 'বেশ তো, পুলিসের সামনেই দেওয়া হবে। পুলিস দেখবে।'

'কিন্তু সে সব ফল নিরাপদ কিনা তার কে বিচার করে ?'

'বেশ তো, পুলিসকে টাকা দেওয়া হচ্ছে, পুলিসই কিনে এনে দিক।'

'পুলিসের খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, আসামীর জন্যে বাজারে ফল কিনতে যাবে।' বার্লি যেমন কঠিন তেমনি কঠিন রইল।

'ছেলেগুলি ক্ষুধার্ত—হুজুর যদি একটু দয়া করেন—'

উকিলকে তবু মিনতি করতে দেখে আসামীরা সরোষে প্রতিবাদ করে উঠল : 'আমরা চাই না খেতে। আমাদের ফলে দরকার নেই।'

'কিন্তু জল? জল খেতে দিতে আপত্তি আছে?'

পাষাণ বোধ হয় একটু দ্রব হল। বিশুদ্ধ কলের জল খেতে দিতে আপত্তি করল না।

আসামীরা জল খেল পেট ভরে।

কিছু দিন গেলে কড়াকড়ি শিথিল হতে শুরু করল। আগে-আগে যেখানে পঁচিশ-ত্রিশজন সার্জেন্ট ছিল, ক্রমে চার-পাঁচজনে এসে দাঁড়িয়েছে। আগে-আগে আদালতে ঢোকবার ও বেরুবার সময় আসামীদের শরীর তল্লাসি করত, ক্রমে সেটাও বন্ধ হল। তাই আসামীরা রুটি চিনি বা অন্য কিছু নিয়ে যেতে লাগল, প্রথমে লুকিয়ে, শেষে প্রকাশ্যে। রক্ষীদের বোধ হয় ধারণা জন্মাল আসামীরা নিরীহ, বোমা বা পিস্তল নিয়ে আসবে না—পাবে কোথায়? কিন্তু জুতো? পায়ের জুতো? বোমা-পিস্তলকে ভিত্তিহীন মনে করলেও জুতোকে তো তা বলা যায় না—জুতোই তো দাঁড়াবার ভিত্তি। যদি কেউ সেই জুতো তুলে নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে নিক্ষেপ করে? সর্বনাশ। তাই জুতো বারণ হয়ে গেল। জুতো পরে আসামীরা কেউ আদালতে ঢুকতে পাবে না।

কিন্তু আসামীপক্ষে ব্যারিস্টারের টাকা কই? দোসরা জুলাই পর্যন্ত মোটে চার হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছে। সঞ্জীবনী লিখছে : অরবিন্দের বিপন্মুক্তি সমস্ত বাঙালীর কাম্য কিন্তু একজন সুদক্ষ ব্যারিস্টারের অভাবে তাঁর মামলা নষ্ট হয়ে গেলে তাদের কলঙ্কের একশেষ হবে।

কদিন পরে ১২ই জুলাই 'হিতবাদী' লিখছে : মুরারিপুকুরের সঙ্গে অরবিন্দ জড়িত আছেন এ কেউ বিশ্বাস করে না। কিন্তু মামলা এমন জটিল হয়ে উঠেছে যে শক্ত হাতে কোনো উকিল-ব্যারিস্টার এসে হাল না ধরলে ভরাডুবি থেকে অরবিন্দকে বাঁচানো যাবে না। এ মামলায় অরবিন্দকে তাই সকলের সাহায্য করা উচিত। উকিল-ব্যারিস্টাররাই বা বিনা-ফিতে অরবিন্দের পক্ষ নিতে কেন এগিয়ে আসছেন না?

পরদিন আবার লিখছে : আলিপুরের বোমার মামলা চলতি বছরে শেষ হবে এমন কোনো সম্ভাবনা নেই। নর্টন যত দিন পারে মজা-সে মামলা চালিয়ে যাবে—দিনে তার এক হাজার টাকা উপার্জন। তার মানে দেশের সমস্ত টাকা

সরকারের উকিল-ব্যারিস্টাররাই গিলে খাবে আর আমাদের জলাভাব, দুর্ভিক্ষ আর ম্যালেরিয়া থেকে পরিত্রাণের পথ থাকবে না।

ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দানে আট হাজার পাঁচ শো টাকা হল। দাতাদের মধ্যে একজন এক অন্ধ ভিক্ষুক আর একজন একটি স্কুলের ছাত্র। দিনের পর দিন টিফিনের দু পয়সা বাঁচিয়েই ছাত্রটির সঞ্চয় আর ভিক্ষুকের বিত্ত উদয়াস্ত এক দিনের রোজগার।

চাঁদার পরিমাণ তেরো হাজার টাকায় দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এ অতি সামান্য। আরো টাকা চাই—আরো দ্রুত। বইয়ে দেবার মত আর বেলা নেই।

ব্যারিস্টার ভুবন চ্যাটার্জিকে পাওয়া গেল আসামীর পক্ষে। পদে-পদে নর্টন প্রতিহত হতে লাগল। তার ইচ্ছেমতো অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপারকে প্রমাণ বলে চালাবার চেষ্টায় সর্বক্ষণ সে সফল হতে পারল না। তাতে তার কী ক্রোধ, কী বিরক্তি!

লিখছেন অরবিন্দ:

'নর্টন সাহেব এই নাটকের নায়করূপে আমাকেই পছন্দ করিয়াছিলেন দেখিয়া আমি সমধিক প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। যেমন মিল্টনের Paradise Lost-এর শয়তান, আমিও তেমনি নর্টন সাহেবের plot-এর কল্পনাপ্রসূত মহাবিদ্রোহের কেন্দ্রস্বরূপ অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ক্ষমতাবান ও প্রতাপশালী bold bad man। আমিই জাতীয় আন্দোলনের আদি ও অন্ত, স্রষ্টা ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের সংহারপ্রয়াসী। উৎকৃষ্ট ও তেজস্বী ইংরাজী লেখা দেখিবামাত্র নর্টন লাফাইয়া উঠিতেন ও উচ্চৈঃস্বরে বলিতেন, অরবিন্দ ঘোষ। আন্দোলনের বৈধ অবৈধ যত সুশৃঙ্খলিত অঙ্গ বা অপ্রত্যাশিত ফল সকলই অরবিন্দ ঘোষের সৃষ্টি, যখন অরবিন্দের সৃষ্টি তখন বৈধ হইলেও নিশ্চয় অবৈধ অভিসন্ধি গুপ্তভাবে তাহার মধ্যে নিহিত। তাঁহার বোধ হয় বিশ্বাস ছিল যে আমি ধরা না পড়িলে বোধ হয় দুই বৎসরের মধ্যে ইংরেজের ভারতসাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত। আমার নাম কোনও ছেঁড়া কাগজের টুকরায় পাইলে নর্টন মহা খুশি হইতেন, এবং সাদরে এই পরম মূল্যবান প্রমাণ ম্যাজিস্ট্রেটের শ্রীচরণে অর্পণ করিতেন। দুঃখের কথা, আমি অবতার হইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই, নচেৎ আমার প্রতি সেই সময়ের এত ভক্তি ও অনবরত আমার ধ্যানে নর্টন সাহেব নিশ্চয় তখনই মুক্তিলাভ করিতেন, তাহা হইলে আমাদের কারাবাসের সময় ও গবর্নমেন্টের অর্থব্যয় উভয়ই সঙ্কুচিত হইত।'

আর বার্লি সাহেব? সে যত না ম্যাজিস্ট্রেট তার চেয়ে বেশি সে সরকারী কর্মচারী। বিচারবুদ্ধি বিবর্জিত। ভাবখানা সে যেন এক স্কুল-মাস্টার। সে যেন শাসন করতে বসেছে, বিচার করতে নয়। আর সব সময়ই প্রসিকিউশনের পোঁ-ধরা। নর্টন যা বলবে তাতেই তার সায়। নর্টন যা বোঝাবে তাতেই তার সম্মতি। নর্টন হাসলে সে হাসে রাগলে সে রাগে, নর্টন যা নেবে না তাকে সেও সরাসরি অগ্রাহ্য করে দেয়।

এ কি বিচার না প্রহসন?

বার্লির সরস বর্ণনা দিচ্ছেন অরবিন্দ: 'বার্লি সাহেব বোধ হয় স্কচ জাতির গৌরব। তাঁহার চেহারা স্কটল্যাণ্ডের স্মারক চিহ্ন। অতি সাদা, অতি লম্বা, অতি রোগা, দীর্ঘ দেহযষ্টির উপর ক্ষুদ্র মস্তক দেখিয়া মনে হইত যেন অভ্রভেদী অকটারলোনী মনুমেন্টের উপর ক্ষুদ্র অকটারলোনী বসিয়া আছেন, বা ক্লিয়পাত্রার obelisk-এর চূড়ায় একটি পাকা নারিকেল বসানো রহিয়াছে। তাঁহার চুল ধূলার বর্ণ (sanpy haired) এবং স্কটল্যাণ্ডের সমস্ত হিম ও বরফ মুখের ভাবে জমিয়া রহিয়াছে। যাঁহার এত দীর্ঘ দেহ, তাঁহার বুদ্ধিও তদ্রূপ হওয়া চাই, নচেৎ প্রকৃতির মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হয়। কিন্তু এই বিষয়ে বার্লি-সৃষ্টির সময়ে প্রকৃতি-দেবী বোধ হয় একটু অমনোযোগী ও অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন। ইংরাজ কবি মারলো এই মিতব্যয়িতা infinite riches in a little room 'ক্ষুদ্র ভাণ্ডারে অসীম ধন' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু বার্লি-দর্শনে কবির বর্ণনার বিপরীত ভাব মনে উদয় হয় infinite rooms in little riches। বাস্তবিক এই দীর্ঘ দেহে এত অল্প বিদ্যাবুদ্ধি দেখিয়া দুঃখ হইত এবং এই ধরনের অল্পসংখ্যক শাসনকর্তা দ্বারা ত্রিশ কোটি ভারতবাসী শাসিত হইয়াছে স্মরণ করিয়া ইংরাজের মহিমা ও ব্রিটিশ শাসনপ্রণালীর উপর প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হইত।'

আসামীদের 'স্টেটমেণ্ট' নিচ্ছে বার্লি।

উপেনকে ডাকল। 'স্টেটমেণ্ট' নেবার পর বার্লি জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কি মনে করো তোমরা ভারতবর্ষ শাসন করতে পারো?'

কী বুদ্ধি! উপেন দেখল এ তো কোনো স্বাভাবিক মানুষ নয়, নিরেট একটি শাসনযন্ত্র, সাদা মার্বেল পাথর দিয়ে বাঁধানো। এত দুঃখের মধ্যে উপেন তবু না হেসে পারল না, বললে, 'সাহেব, দেড়শো বছর আগে তোমরা কি এ দেশ শাসন করতে? না কি তোমাদের দেশ থেকে আমরা শাসনকর্তা ধার করে আনতাম?'

উত্তরটা বেয়াড়া হয়ে গেল, বার্লির মনঃপূত হল না। তাড়াতাড়ি তাই খবরের

কাগজের রিপোর্টারদের বললে, এ কথোপকথনটা যেন ছাপানো না হয়। ছাপানো হলে মানুষে যে তার বুদ্ধিমত্তার সঠিক পরিচয় পেয়ে যাবে এটুকু বুদ্ধি বুঝি তার ঘটে অবশিষ্ট আছে ।

আসামীরা পরস্পর কথা কইছে, স্কুলমাস্টারের মত বার্লি ধমক দিয়ে উঠল। ধমকে কাজ হল না দেখে বার্লি হুমকে উঠল, উঠে দাঁড়াও। তাতেও কেউ কেউ আলস্য দেখাচ্ছে বলে বার্লি পুলিসকে বললে, ওদের দাঁড় করিয়ে দাও ।

ভুবন চ্যাটার্জির সঙ্গেও মাঝে মাঝে ঝগড়া বাধে। সেদিন তো চরমে উঠল। আসামীরা বলাবলি করল, এইবার বার্লি বুঝি চ্যাটার্জিকেও স্ট্যাণ্ড-আপ্-এর শাস্তি দেবে ।

কিন্তু, না, বার্লি গর্জে উঠল, সিট ডাউন মিস্টার চ্যাটার্জি।

কাউকে তো বসতে বলে না বার্লি, কিন্তু সহসা এ কী বিপরীত বিধান!

কোর্টের মান রাখতে খানিকক্ষণের জন্যে বসলেও ভুবন চ্যাটার্জি আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়েছে নর্টনের বেআইনী করণ-প্রকরণের প্রতিবাদ করতে। সাক্ষ্য-আইনে যা অসিদ্ধ তাই নর্টন নথিভুক্ত করবার চেষ্টা করবে এই ধূর্ততা সহ্য করা যায় কী করে? তাই নর্টন যখনই আইনকে জলাঞ্জলি দিয়ে প্রমাণ প্রস্তুত করতে চায় তখনই ভুবন চ্যাটার্জি ফোঁস করে ওঠে, বলে, এ অপ্রাসঙ্গিক সেই কারণে অগ্রহণীয়—নামঞ্জুর । হ্যাঁ কি না, বুদ্ধি খাটিয়ে নিজস্ব মত কিছু ব্যক্ত করতে পারে না বার্লি, সে শুধু নর্টনের নৌকোতেই সোয়ারি হতে চায়। যেমন নর্টন তেমনি নর্তন। কিন্তু ব্যারিস্টার ভুবন চাটুজ্জেও নেই-আঁকড়া। 'এ কাহিনী অবান্তর', 'এ সাক্ষ্য অচল'—প্রতিপদে এমনি তার আপত্তি। যুক্তির শরক্ষেপ।

বার্লির বিরক্তি ধরে গেল। কিন্তু যুক্তির সামনে মাথা তুলতে পারল না। তাই মুখখানা করুণ করে বললে, 'আপনাকে জোটাল কে? আপনি যখন আসেননি তখন আমরা দিব্যি আরামে মামলা চালাচ্ছিলাম।'

'তাহা বটে,' অরবিন্দ লিখছেন: 'নাটকের রচনার সময়ে কথায় কথায় আপত্তি তুলিলে 'নাটকও অগ্রসর হয় না, দর্শকবৃন্দেরও রসভঙ্গ হয়।'

তাই বলে যে কোনো উপায়ে হোক অরবিন্দকে দোষী সাব্যস্ত করতেই হবে এ সরকারী দুশ্চেষ্টাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।